মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

নিবন্ধন সংখ্যা: ১৫৪/২০০৬-২০০৭

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB

B
891.443
TAM
c.1

P.
449953
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

449953

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক মো. আবদুস সোবহান তালুকদার

নিবন্ধন সংখ্যা : ১৫৮/২০০৬-০৭

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর

Dhaka University Library
449953

449953

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, কক্ষ : ২০০৮, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা - ১০০০
ফোন : ৯৬৬১৯২০/৬০০৬ ; মোবাইল : ০১৭১৭১০৪৯৭২ ; ই-মেইল : bangla@du.bangla.net

তারিখ : ৭.৮.২০১১

প্রত্যয়ন-পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলা বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক মো. আবদুস সোবহান তালুকদার (নিবন্ধন সংখ্যা- ১৫৮/২০০৬-০৭) আমার তত্ত্বাবধানে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা সমাপ্ত করে পিএইচ. ডি. উপাধির জন্যে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত করছে। সে তার নিজস্ব মেধা ও শ্রমে এই গবেষণা-কর্ম সুসম্পন্ন করেছে। অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব রচনা এবং এর কোন অংশ কোথাও মুদ্রিত হয় নি অথবা কোন উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কোন উপাধির জন্যে উপস্থাপিত হয় নি। আমি তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

449953

মোহাম্মদ আবু জাফর

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্নাতক শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ সূচিত হয়েছিল। তাই, উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর গবেষণা করার সুযোগ যখন পেলাম, তখন সংগত কারণেই আমি আনন্দিত হয়েছি। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব' সম্পর্কিত গবেষণায় নিয়োজিত হয়ে মানিক-প্রতিভার বিস্তৃতি ও গভীরতা দেখে আমার, যথার্থ অর্থেই, বিস্ময় জেগেছে। একজন যুগন্ধর মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্ব ও দর্শন একজন কালজয়ী মহৎ কথাশিল্পীর সাহিত্যকে যে মহোত্তর করে তুলতে পারে, গবেষণা-পর্বে আমি মর্মে মর্মে তা অনুধাবন করেছি।

গবেষণা-কর্মে আমার প্রধান সহায় ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর। তাঁর সার্বক্ষণিক প্রাজ্ঞ নির্দেশনা, উপদেশ ও নিরন্তর সহযোগিতা ছাড়া কোনো ভাবেই এ গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ : অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক নূরুর রহমান খান, অধ্যাপক আহমদ কবির, অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান এবং অধ্যাপক মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমাকে সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ফাতেমা কাওসার, অধ্যাপক মো. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন এবং সহকারী অধ্যাপক নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা। আমার বন্ধুরা — সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, সহকারী অধ্যাপক হোসনে আরা এবং সহকারী

অধ্যাপক তারিক মনজুর — যথাসময়ের মধ্যে গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করার জন্যে আমাকে নিরন্তর তাগিদ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রাক্তন সিনিয়র আবাসিক শিক্ষক জনাব শাহেদা খানম চৌধুরী, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মন্ময় জাফর এবং একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গোলাম গাউস আল-কাদেরী, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক জনাব রিয়াজ মোর্শেদ, তেজগাঁও কলেজের প্রাক্তক শিক্ষক ড. গীতারানী কর্মকার বিভিন্ন সময়ে যে সহযোগিতা আমাকে করেছেন সে জন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা-কর্মে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুরা। এঁদের মধ্যে জনাব আবু জাফর দিলু, জনাব ইউনুস আলী, জনাব সালাম তালুকদার, জনাব তৈয়ব আলী, জনাব মাদাম তাহিয়া এলিস, জনাব শহীদুল্লাহ শরীফ, জনাব রীনা রানী দাস, জনাব সৈয়দ আকমল হোসেন পিলু, জনাব আফজাল হোসেন ব্যাপারী (হিমেল) ও ড. মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদের কথা না বললেই নয়।

গবেষণা-কালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের 'মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ' এবং কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের বইপত্র ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলা বিভাগের প্রধান সহকারী জনাব মো. আবদুল ওয়ারিশ মিয়া, উচ্চমান সহকারী জনাব রীনা পারভীন, ম্যাসেঞ্জার পিয়ন জনাব মো. সাইদুর রহমান ও অ্যাটেনডেন্ট পিয়ন জনাব মো. মিজানুর রহমান নানা ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমার স্ত্রী জনাব পুতুল তালুকদারের কাছে আমার যে ঋণ, তা পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। গবেষণ-কর্মে আমাকে মনস্ক ও নিবিষ্ট রাখার কঠিন দায়িত্বটি তিনি গ্রহণ

করেছিলেন এবং সার্থকভাবে তা পালনও করেছেন। তাঁর নিরন্তর সহযোগিতা, অপার উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ছাড়া এ গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁর বছরের পর বছরের কায়িক ও মানসিক শ্রমের কথা কোনো দিন ভোলা যাবে না। রাজকন্যা অপরাজিতা লিরিক — আমার মেয়ে — তার মধ্যবয়সী বাবাকে ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা করতে দেখে প্রতিনিয়ত উপহাস করেছে। তার সেই সব হাস্য-কৌতুকও আমি ভুলব না।

আমার মা জনাব মমতাজ বেগম এবং আমার বাবা মো. বদর উদ্দীন তালুকদার বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছেন। তাঁরা যদি জীবদ্দশায় তাঁদের অধম পুত্রের ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন দেখে যেতে পারেন, তাহলে তা হবে একটি সুখের ব্যাপার।

অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে আমার ছাত্র মো. আমিনুর রহমান তার নানা ব্যস্ততার মধ্যেও যে সময় ও শ্রম দিয়েছে, তা বিস্ময়কর। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আনুষঙ্গিক কাজে সহযোগিতার জন্যে অনুপম বিশ্বাস ও জাবেদ ইকবালকেও ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিত-রসজ্ঞ-বোদ্ধা গবেষক ও সাহিত্যপিপাসু পাঠকের কাছে আমার এই গবেষণা-কর্ম যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলেই আমার শ্রম অর্থবহ হবে।

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা		১০
২.	প্রথম অধ্যায়	ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও মানিক-পূর্ব বাংলা উপন্যাসে তার প্রভাব	১৫
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব : উন্মেষ পর্ব	৩৮
৪.	তৃতীয় অধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব : বিকাশ পর্ব	৬৪
৫.	চতুর্থ অধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব : শেষ পর্ব	১১৩
৬.	পঞ্চম অধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব : প্রথম পর্যায়	১৪০
৭.	ষষ্ঠ অধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব : শেষ পর্যায়	২৩০
৮.	সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	৩১৫

ভূমিকা

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও শিশুতোষ সাহিত্য — বলা যায় : আধুনিক সাহিত্যের প্রায় সকল আঙ্গিকেই সচ্ছন্দ বিহার করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে মূলত একজন কথাশিল্পী, তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর রচনাবলির দিকে তাকালে। আটচল্লিশ বছরের আয়ু-সীমায় বাইশ বছরের শিল্পিজীবনে তিনি রচনা করেছেন মাত্র একটি নাটক, একটি কবিতা সংকলন, একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও দুটি শিশুতোষ সংকলন ; অথচ উপন্যাস লিখেছেন উনচল্লিশটি, গল্প দুই শত তেইশটি। এছাড়া, কাব্য সংকলন, প্রবন্ধ গ্রন্থ, এবং শিশুতোষ সংকলন দুটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর জীবদ্দশায় গল্প ও উপন্যাস ছাড়া প্রকাশিত হয়েছে একটি নাটক।

কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন পথ নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বসুরী তিন প্রধান কথাসাহিত্যিক — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — এবং সমকালীন দুই প্রধান কথাসাহিত্যিকের — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের — সঙ্গে তুলনায় তিনি অনেক বেশি সমালোচনার দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। জীবনের ওপর তলার ঘটনাবহুল, বর্ণালি গল্প শোনানোর চাইতে শৈল্পিক নিরাসক্তি নিয়ে নিরঞ্জন বাস্তবজীবন তিনি অঙ্কন করেছেন এবং সে জীবনের মর্মমূলে যে অমোঘ সত্য নিহিত আছে, বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পীর সুস্থিরতা নিয়ে তিনি সে দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। জীবনের গভীর তলদেশে, জীবনের মর্মমূলে প্রোথিত সত্যের জটিল ও বিচিত্র রূপই ছিলো তাঁর অন্বিষ্ট।

মানিক-মনোভূমিতে সবসময় বিচরণ করেছেন বিশ শতকের চিন্তাজগতের শীর্ষ নায়কদের দুজন — সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং কার্ল মার্কস। শিল্পিজীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন ফ্রয়েড প্রভাবিত, পরবর্তীকালে মার্কবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর সাহিত্যকর্মে মার্কসের প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়। ফ্রয়েড থেকে মার্কসে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে তাঁর জীবনবোধের পালাবদল ঘটে,

যদিও মার্কসবাদে আস্থাশীল হওয়ার পর ফ্রয়েড থেকে তিনি পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

মানিক-উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব আছে তাই কখনও প্রবলভাবে, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে। তাঁর প্রথম লেখা দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) থেকেই মানিক-উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব লক্ষ করা যায়। *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) পর্বে ফ্রয়েডীয় প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক, প্রবল ও সামগ্রিক। এ দুটি উপন্যাস তাঁর ফ্রয়েড-দীক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত। *পুতুলনাচের ইতিকথার* পরে মানিক-উপন্যাসে জীবনবোধের পালাবদল ঘটে। তিনি মার্কসের তত্ত্বে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন ; ফলে এ পর্বে ফ্রয়েড হয়ে পড়েন গৌণ। এই শেষ পর্বে লেখা যে দুটি উপন্যাসে ফ্রয়েড কিছুটা প্রাধান্য পান সেগুলো হলো *অহিংসা* (১৯৪১) ও *চতুষ্কোণ* (১৯৪২)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেটগল্পেও ফ্রয়েডের প্রভাব বিদ্যমান। ১৯৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত লেখা মানিকের ছোটগল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব প্রবল ও তীব্র। এ কালসীমার মধ্যে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে *অতসীমামী* (১৯৩৮), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *মিহি ও মোটা কাহিনী* (১৯৩৮) এবং *সরীসৃপ* (১৯৩৯)। ১৯৪০ সাল থেকে মানিকের লেখায় মার্কসবাদী প্রভাব ব্যাপক হয়ে উঠতে থাকে — বিশেষ করে *সহরতলী* (প্রথম খণ্ড) (১৯৪০) উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। ১৯৪০ সালের পরে লেখা মানিকের গল্পে মার্কসবাদ প্রবল হয়ে ওঠায় এ পর্যায়ে ফ্রয়েডীয় প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। এ পর্বকে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তায়মান পর্ব বলা যায় ; তবে এ পর্বেও মানিকের গল্পে ফ্রয়েড দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এ পর্যায়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে : *বৌ* (১৯৪০), *সমুদ্রের স্বাদ*, (১৯৪৩), *ভেজাল* (১৯৪৪), *হলুদপোড়া* (১৯৪৫), *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬) এবং *পরিস্থিতি* (১৯৪৬)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ও শিল্প-প্রকরণের ওপর বেশ কিছু ভালো বই রচিত হয়েছে ; কিন্তু এগুলোর কোনটাতেই মানিক-প্রতিভার ব্যাপক ও সামগ্রিক পরিচয় পরিস্ফুট হয়

নি বলে মনে করার অবকাশ আছে। তার কারণ এই যে, মানিকমানস ফ্রয়েড ও মার্কস প্রভাবিত : এঁদের কার তত্ত্ব কী, এবং কীভাবে তাঁদের তত্ত্বসমূহ মানিক-কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে মানিকের জীবনদর্শনকে সমগ্রতা দিয়েছে এবং কীভাবে তাঁদের তত্ত্ব মানিক-কথাসাহিত্যে শিল্পরূপ লাভ করেছে, তা নিয়ে ব্যাপকতর গবেষণা সার্বিক অর্থে এখনও হয়নি। ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানিক-সাহিত্য বিশ্লেষণ ছাড়া মানিক-প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। এতে মানিকমানসের একটি প্রধান দিক পরিস্ফুট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষায় এখনও কোন পরিপূর্ণ আলোচনা হয় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলোতে ফ্রয়েডের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত — এমন কথা প্রায় সব সমালোচকই বলেছেন ; সম্ভবত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' পাঠ করেই সমালোচকদের এ ধারণার সূত্রপাত ঘটে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি। তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে তাঁর সংশয় ছিলো। তবু বিব্রত, সন্দিগ্ধ মানসিকতা থেকে তিনি যে সব চকিত মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর গভীর অনুধ্যান, ব্যাপক পঠন-পাঠন ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। অচ্যুত গোস্বামী তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ফ্রয়েডের তত্ত্বের কিছু দিক উন্মোচন করেছেন, কিন্তু সেই সব তত্ত্ব কীভাবে মানিক-উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি ব্যাপক আলোকপাত করেন নি ; তাঁর সে রকম পরিকল্পনাও ছিলো না। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থে — গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', অশ্রুকুমার শিকদারের 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'— একই রকম সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। বস্তুত, কেউ-ই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে মানিক-উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব কীভাবে বিদ্যমান এবং মানিক-উপন্যাসে কীভাবে তার রূপায়ণ ঘটেছে, সে ব্যাপারে সমালোচকেরা প্রায়ই মন্তব্যপ্রবণ ও মিতবাক। এ ধরনের সীমাবদ্ধতাই আমাদের বর্তমান গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের ছোটগল্পগুলোতে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে, অন্তত চরিত্রের অন্তর্জাগতিক মনোবিশ্লেষণ আধুনিক মনস্তত্ত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুস্পষ্টভাবে, কখনও অপরিস্ফুটভাবে — এমন কথা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর '*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*' গ্রন্থে বলেছেন। সৈয়দ আজিজুল হক তাঁর '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*' গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বেশ কিছু দিক উন্মোচন করেছেন, কিন্তু সে সব তত্ত্ব কীভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে রূপায়িত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেন নি। তাঁর পরিকল্পনা ছিলো মানিকের গল্পে সমাজচেতনার প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে এবং জীবনের রূপায়ণ কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে সে বিষয়ে আলেচনা করা, মানিকের গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব নিরূপণ নয়। গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*', নিতাই বসুর '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*', ও '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*', সরোজমোহন মিত্রের '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*', শিখা ঘোষের '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পর্কে কম বেশি একই কথা বলা যায়। অধুনা প্রকাশিত ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত '*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব কীভাবে আছে, সে বিষয়ে সীমিত আলোচনা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা ফ্রয়েডের তত্ত্বের মূল কথাগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর তত্ত্ব দেশি/বিদেশি সাহিত্যে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, সে প্রেক্ষাপটও কিছুটা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ফ্রয়েডের কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ফ্রয়েডের প্রভাব মানিক-পূর্ব বাংলা উপন্যাসে কার কার ওপর কীভাবে পড়েছে, সে বিষয়েও অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্মেষ পর্বের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' ফ্রয়েডীয় প্রভাব কীভাবে পড়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকাশ পর্বের উপন্যাস '*পদ্মানদীর মাঝি*' এবং '*পুতুলনাচের ইতিকথা*'-য় ফ্রয়েডীয় প্রভাব

কীভাবে বিদ্যমান, তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রয়েড প্রভাবিত শেষ পর্যায়ের উপন্যাসদ্বয় '*অহিংসা*' ও '*চতুষ্কোণে*' ফ্রয়েডীয় প্রভাব কতটুকু সক্রিয়। পঞ্চম অধ্যায়ে মানিকের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পসমূহে ফ্রয়েডীয় প্রভাব কীভাবে বিদ্যমান , তা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে চেষ্টা করেছি মানিকের শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পগুলোতে ফ্রয়েডীয় প্রভাব নির্ণয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে সমগ্র আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়

ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও মানিক-পূর্ব বাংলা উপন্যাসে তার প্রভাব

বৈশ্বিক পরিসরে বিশ শতকের চিন্তাজগতের জনক হিসাবে একার্থে তিন জনকে[১] স্বীকার করা হয়, এঁদের প্রথম জন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। স্তরবহুল মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নেপথ্য চালিকাশক্তি তার অবচেতন মন। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয় — মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তার অবচেতন মনের গভীরে সুপ্ত অন্ধকার গুহাবাসী এক প্রবল জৈবিক শক্তি দ্বারা।

ফ্রয়েডকে বলা হয়ে থাকে তাঁর কালের সবচেয়ে বড়, মৌলিক ও সৃজনশীল মনোবিজ্ঞানী।[২] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী যখন মূল্যবোধের অবক্ষয় ও ধস এবং সর্বত্রই সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তখনও তাঁর মতবাদের ওপর মানুষের আস্থা ছিলো অবিচল। তাঁর গ্রন্থবাহিত বিজ্ঞানসম্মত প্রজ্ঞা বিশ্বব্যাপী যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল।[৩] অবস্থা এমনই দাঁড়িয়ে যায় : প্রত্যেকটি সমস্যার অলোচনাতে সবারই প্রশ্ন জাগে, এ বিষয়ে ফ্রয়েড কী বলেন ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাই আইনস্টাইন ফ্রয়েডকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, যুদ্ধ কেন হয় ?[৪]

ফ্রয়েডের প্রথম গ্রন্থ *Aphasia* প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। এর পর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *The Interpretation of Dreams* (১৮৯৯), *Three Contributions of Sexual Theory* (১৯০৫), *Jokes and Their Relation to the Unconcious* (১৯০৫), *Character and Anal*

১. অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ২৫০। (বাকি দুজন হচ্ছেন আইনস্টাইন ও কার্ল মার্কস)

২. জি স্টানলি হল, অনু. আবদুল গনি হাজারী, *মনঃসমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০২, 'মার্কিন সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. বার

৩. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২২

৪. সুনীল কুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১২৮

Erotism (১৯০৮), *Contribution to the Psychology of Love* (১৯১০), *Formulations on the Two Principles of Mental Functioning* (১৯১১), *Totem and Taboo* (১৯১২), *Psychopathology of Everyday Life* (১৯০৩), *On the Universal Tendency to Debasement in the Sphare of Life* (১৯১২), *The Repression* (১৯১৫), *The Unconcious* (১৯১৫), *Metapsychology* (১৯১৫), *The Taboo of Virginity* (১৯১৭), *A General Introduction to Psychoanalysis* (১৯২০), *Beyond the Pleasure Principal* (১৯২০), *Group Psychology and the Analysis of the Ego* (১৯২১), *Introductory Lectures on Psycho-Analysis* (১৯২২), *The Ego and the Id* (১৯২৩)।

ফ্রয়েডের গ্রন্থের নাম ও প্রকাশকাল নিয়ে যে ভিন্নতা দেখা যায় তার কারণ ফ্রয়েড গ্রন্থগুলো জার্মান ভাষায় লিখেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থগুলো ইংরেজিসহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদের সময় অনুবাদকের স্বেচ্ছাচারিতায় অনেক ক্ষেত্রেই যেমন বদলে গেছে গ্রন্থের নাম, তেমনি গ্রন্থটির ইংরেজি প্রকাশকাল হিসেবে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন একটি সাল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্রয়েডের *The Interpretation of Dreams* নামের মূল গ্রন্থটি ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হলেও এ গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠায় প্রকাশক ছাপিয়ে দিয়েছেন ১৯০০ সাল।[৫] এই গ্রন্থটি একই নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৩ সালে।[৬] ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে দেশ ভেদে বদলে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থের নাম। যেমন, ১৯১৫-১৯১৭ কালসীমায় ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি শীতকালীন অধিবেশনে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্বে সাধারণ মানুষদের উদ্দেশে ফ্রয়েড মোট ২৮টি ভাষণ দেন।[৭] এই বক্তৃতাগুলো ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে[৮] আমেরিকা থেকে। ১৯২২ সালে একই গ্রন্থ ইংল্যান্ড থেকে

---

৫. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৭. জি স্টানলি হল, পূর্বোক্ত, পৃ. এগার

৮. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষা*, অনু. আবদুল গনি হাজারী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. সতের

প্রকাশিত হয়।[৯] উভয় গ্রন্থের অনুবাদক একই ব্যক্তি — জোয়ান রিভিয়ার,[১০] অথচ দেশ ও কালভেদে বদলে গেছে গ্রন্থের নাম। ১৯২০ সালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম *A General Introduction to Psychoanalysis*, ১৯২২ সালে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের নাম *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*। কেবল ইংরেজি ভাষায় নয়, বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও অনুবাদক/প্রকাশকের এ ধরনের দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষণীয়। যেমন, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রয়েড-প্রদত্ত ভাষণগুচ্ছ নিয়ে কলকাতার 'দীপায়ন' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, অরূপরতন বসু অনূদিত গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*[১১], বাংলাদেশের 'অবসর' প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত, আবদুল গনি হাজারী অনূদিত গ্রন্থের নাম *মনঃসমীক্ষা*[১২]। আবদুল গনি হাজারী অনূদিত গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে অনুবাদকের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিপন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েডের আবির্ভাব প্রাসঙ্গিক এবং সমান্তরাল। আবু সয়ীদ আইয়ুব লক্ষ করেছেন :

> বিশ শতকে আবার হাওয়া গেল পালটে। প্রেমের কবিতা লেখা এক রকম বন্ধ হয়ে এল, উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেমের জায়গা নিল নির্জলা সেক্স। এর জন্য প্রথমত দায়ী ভিয়েনীজ স্কুলের মনোবিকলন-তত্ত্ব। বিস্তর তথ্যাদি ঘেঁটে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে অত্যন্ত খাঁটি শেলীমার্কা সেই-যে the worship that the heart lifts above, and the heavens reject not — তার পেছনেও রয়েছে চাপা লিবিডোর প্রবল তাড়না। এর ফলে সেক্স সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন বাড়ল, স্নায়ুবিক চাঞ্চল্যজনিত যে-কৌতূহল একদিন ধামাচাপা ছিল

---

৯. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষা*, অনু. আবদুল গনি হাজারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১০. আবদুল গনি হাজারী, *মনঃসমীক্ষা*, 'প্রকাশকের কথা' থেকে উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. মুদ্রিত নেই – গণনা করলে দাঁড়ায় পৃ. সাত

১১. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, অনু. অরূপরতন বসু, কলকাতা, ১৯৯৯

১২. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষা*, অনু. আবদুল গনি হাজারী, ঢাকা, ২০০০,

> তাও তেমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। লেখাপড়ায় কথাবার্তায় চিন্তা-ভাবনায় সর্বত্রই প্রসঙ্গটির ছড়াছড়ি এবং বাড়াবাড়ি। সাহিত্য তার আক্রমণ ঠেকাতে পারবে কেন ? দ্বিতীয়ত, গত মহাযুদ্ধের সর্বনাশা আবর্তনে মানুষের চরম মূল্য গেল তলিয়ে, এক বিশ্বব্যাপী অনাস্থা ও অবিশ্বাস সারা ইউরোপের — ফলে সারা পৃথিবীর — চিত্ত ভাসিয়ে দিল। প্রেম ছিল অন্যতম প্রধান মূল্য, তার বেলায়ও ব্যতিক্রম ঘটল না। মানুষের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ সইতে না পেরে পঞ্চশর তাঁর তূর্ণটি বগলদাবা করে কেটে পড়লেন। বুর্জোয়া মূল্যের বিনাশকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ভাঙনের পূর্বাভাস মনে করা অসঙ্গত নয়। আর্থিক জগতে যার নাম দে'য়া হয় capitalist crisis, মূল্যবোধের উপপ্লবকে তারই আধ্যাত্মিক প্রতিফলন বলতে পারেন। এক সভ্যতার পতন এবং এক সভ্যতার উত্থানের মাঝখানকার সময়টা স্বভাবতই অরাজকতার সময়। এই সময়ে আদিম মানুষের প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিজ্ঞানে বলে প্রকৃতি না কি vacuum বরদাস্ত করতে পারে না। সভ্যতার ফাঁক ভরবার জন্য তাই ছুটে আসে মানুষের অবদমিত বর্বরতা। তাই ফ্যাসিস্ট দেশের মাথায় রক্ত চাপে, সংস্কৃতির নাম উঠলে হাত যায় পিস্তলের দিকে। তাই ক্যাপিটালিস্ট দেশে প্রচণ্ড বেগে সেক্সের চর্চা চলে, জন্মায় যৌনবিকার, মানসিক ব্যাধি এবং ব্যাধির প্রতি আসক্তি।[১৩]

গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর দৃষ্টিতে :

> প্রথম মহাযুদ্ধের কালপর্বে আর একটি যুগান্তকারী হ'ল ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব। ...যুদ্ধের পর রণক্লান্ত য়ুরোপে ফ্রয়েডের চিন্তাধারা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশেও যুদ্ধের পর ফ্রয়েডের এই সব গ্রন্থ ও গ্রন্থবাহিত ভাবধারা যুগ প্রভাবে ক্লান্ত, বিষণ্ণ যুবচিত্তকে নূতন উত্তেজনা ও কৌতূহলে উজ্জীবিত করে তুলল।[১৪]

---

[১৩]. সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ, শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১৫

[১৪]. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থসমূহে তাঁর তত্ত্ব ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হচ্ছে : মানুষের মনের জগৎ দুটি অংশে বিভক্ত — একটি চেতন, অপরটি অবচেতন। মানব মনের তিন চতুর্থাংশ বা তার বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে অবচেতন মন যার ওপর মনের বা মানুষের নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এই অবচেতন মনই মানুষের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষের অবচেতন মনে বা মগ্ন চৈতন্যে একচ্ছত্র রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপু। মানব মন যুক্তি দ্বারা চালিত নয়, কারণ মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয়। মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার মনের অবচেতন জগতের অন্ধকারে সুপ্ত থাকা জৈবিক শক্তি দ্বারা। 'বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সূতার সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি করে এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।'[১৫] মানুষের জীবনে মাত্র দুটি জিনিস আছে পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা — যা নিবৃত্তির জন্য মানুষ নিরন্তর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

মানুষের মনের ভেতর দুটো পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করছে - একটি জীবনমুখী, অপরটি মৃত্যুমুখী। জীবনমুখী শক্তিটির নাম তিনি দিয়েছেন এরস্ (Eros), মৃত্যুমুখী শক্তিটির নাম দিয়েছেন থ্যানাটস্ (Thanatos)। মানুষের এরস্ বা জীবনমুখী শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে - আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (Self preservation) এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি (reproduction)। 'আমরা যত রকম কাজ করি না কেন, তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়।'[১৬] এই এরস্‌কে ফ্রয়েড লিবিডো (libido) বলেছেন। লিবিডো হচ্ছে কাম তাড়না। নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে রয়েছে লিবিডো, লিবিডোর মূলে আছে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য, আর বংশবৃদ্ধির মূলে রয়েছে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। এভাবেই এরস্ জীবনকে সামনের দিকে নিয়ে যায়।

---

[১৫]. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯

[১৬]. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

ফ্রয়েডের মতে যৌনতার পরিধি অনেক বিস্তৃত। সাধারণ অর্থে যৌনতা যে অর্থ প্রকাশ করে, ফ্রয়েডে যৌনতার অর্থ অনেক বেশি সম্প্রসারিত। সাধারণ অর্থে যৌনতা যৌন অঙ্গ বা যৌন কামনা-বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফ্রয়েড যে-কোন রকম আকর্ষণকেই যৌনতা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যৌন আকর্ষণ থেকেই সমস্ত আকর্ষণের উৎপত্তি।[১৭]

ফ্রয়েডের মতে, মনের স্তর তিনটি — Id, Ego এবং Super ego। Id অন্ধ বন্য, পাশব, কামনা-বাসনা জাগায়। Id-এর কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই। সে কেবল তার দাবি পূরণের জন্য প্রবল ঊর্ধ্বচাপ দেয়। এটিই libido। এটি নিমজ্জমান রয়েছে মানুষের অবচেতন মনে। Id এর তাড়না অত্যন্ত প্রবল এবং সাধারণত অপ্রতিরোধ্য। Id কোন নৈতিকতা বা সামাজিক অনুশাসনের ধার ধারে না। Super ego কে আমরা নৈতিক মূল্যবোধ বা বিবেক বলতে পারি, যা মানুষের নৈতিক-ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপলব্ধি থেকে উদ্ভুত। Super ego এক ধরনের নিম্নচাপ দেয় Id কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। Ego 'বিচক্ষণ কূটনীতিবিদদের মত অসৎ',[১৮] সে Super ego কে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ঝুঁকি নিয়ে Id-এর ইচ্ছা পূরণ করে। Ego-র কাজ বেশ জটিল। তাকে তিন মনিবের কথা শুনতে হয় — বহির্জগৎ বা বাস্তবতা, Id ও Super ego। জীবনের নির্মম বাস্তবতা বা জটিলতা মূলত Ego-র উদ্বেগ বা অপরাগতা থেকে সৃষ্টি হয়। তিন মনিবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা — বিশেষ করে পরস্পর বিরোধী শক্তি Id ও Super ego-র মধ্যে কৌশলে ভারসাম্য স্থাপন করা কঠিন। Ego তাই ভয় পায় এবং উৎকণ্ঠা অনুভব করে। বহির্জগৎ তার মনে জাগায় বাস্তব উৎকণ্ঠা, Super ego জাগায় নৈতিক উৎকণ্ঠা এবং জাগায় স্নায়বিক উৎকণ্ঠা। 'বাস্তব জীবন বড়ো কঠিন, বড়ো জটিল' বলে বহুল প্রচলিত যে কথা, তা মূলত Ego-র অনুভব।[১৯] Ego যখন super ego-র কাছে পরাস্ত হয়, তখনকার

---

[১৭]. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
[১৮]. ঐ, পৃ. ২৯
[১৯]. ঐ, পৃ. ২০

মানসিক অবস্থার নাম 'অবদমন'। এই অবদমন থেকেই যাবতীয় মানসিক এবং পরবর্তীতে শারীরিক রোগের উৎপত্তি।

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের সব আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার অন্তরালে রয়েছে কামের অনুপ্রেরণা। 'ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, স্বর্গীয় প্রেম বলি তাহা কামের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়...।'[২০] উপাসনা, পূজা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর, মমতা, করুণা, প্রেম, ভালোবাসা, কাম মূলে সবই এক। পাত্রভেদে, প্রকাশ-ভঙ্গিভেদে তাদের নামান্তর হয়, রূপান্তর।[২১] মানুষের প্রাণশক্তি ও জীবনীশক্তির মূলে রয়েছে কামতাড়না। মনুষ্য কর্মকাণ্ডের মূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে লিবিডোর কারসাজি — মানব জীবন মূলত লিবিডোময়।

আমরা আগেই বলেছি, প্রেমের ভেতর ফ্রয়েড কোন রকম স্বর্গীয় মহিমা বা কোন ইন্দ্রিয়াতীত আবেগ খুঁজে পান নি — তিনি এর নেপথ্যে লক্ষ করেছেন কামতাড়না। ফ্রয়েড তাঁর *Group Psychology* গ্রন্থে ভালোবাসার সংজ্ঞার্থ প্রদান করেছেন এই ভাষায় :

> The nucleus of what we mean by love naturally consists (and this is what is commonly called love, and what the poets sing of) in sexual love with sexual union as its aim.[২২]

মানব-আবেগের উদ্দীপক, কামানুভূতির তাড়না, কামাবেগের বিচিত্র রূপ ও তার জটিল-কুটিল গতি প্রকৃতি এবং তার বিচিত্র প্রকাশ ; অবদমন ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ফ্রয়েডের কিছু উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

এক. The greatest intensity of sensual passion will bring with it the highest psychical valuation of the object — this being

[২০]. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, *ফ্রয়েডের ভালবাসা*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭৫
[২১]. ঐ, পৃ. ৭৮
[২২]. ঐ, পৃ. ৭৪

the normal overvaluation of the sexual object on the part of a man.[২৩]

দুই. Sexual excitation is derived not from the so-called sexual parts alone, but from all the bodily organs. We thus reach the idea of a quantity of libido, to the mental representation of which we give the name of 'ego-libido' and whose production, increase or diminution, distribution and displacement should afford us possibilities for explaining the psychosexual phenomena observed.[২৪]

তিন. It is possible, too, that the tendency so often observed in men of the highest classes of society to choose a woman of a lower class as a permanent mistress or even as a wife is nothing but a consequence of their need for a debased sexual object, to whom, psychologically, the possibility of complete satisfaction is linked.[২৫]

চার. At the age of puberty they are joined by the powerful 'sensual' current which no longer mistakes its aims. It never fails, apparently, to follow the earlier paths and to cathect the objects of the primary infantile choice with quotas of libido that are now far stronger. Here, however, it runs up aganist the obstacles that have been erected in the meantime by the barrier against incest; consequently it will make efforts to pass on from these objects which are unsuitable in reality, and find a way as soon as possible to

---

২৩. Sigmund Freud, Contribution to the Psychology of Love II, *On Sexuality*, Ed. by Angela Richard, England, 1991, p. 250

২৪. Sigmund Freud, The Libido Theory, ঐ, পৃ. ১৩৯

২৫. Sigmund Freud, Contribution to the Psychology of love II, ঐ, পৃ. ২৫৪

other, extraneous objects with which a real sexual life may be carried on.[২৬]

পাঁচ. To these phantasies which have succeeded in dominating the man's love in real life, the urge to *rescue* the loved one seems to bear merely a loose and superficial relation, and one that is fully accounted for by conscious reasons. By her propensity to be fickle and unfaithful the loved one brings herself into dangerous situations, and thus it is understandable that the lover should be at pains to protect her from these dangers by watching over her virtue and counteracting her bad inclinations.[২৭]

ছয়. As a result of this substitution the phantasies become admissible to consciousness, but no progress is made in the allocation of the libido in reality. In this way it can happen that the whole of a young man's sensuality becomes tied to incestuous objects in the un-conscious, or to put it another way, becomes fixed to unconscious incestuous phantasies. The result is then total impotence, which is perhaps further ensured by the simultaneous onset of an actual weakening of the organs that perform the sexual act.[২৮]

---

২৬. Sigmund Freud, On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love. *Freud Reader*, Ed. Peter Gay, London, 1995, p. 396

২৭. Sigmund Freud, Contributions to the Psychology of Love I, *On Sexuality*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২

২৮. Sigmund Freud, On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love, *Freud Reader*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

নিষ্কাম ভালোবাসা ফ্রয়েড স্বীকার করেন নি। তাঁর উপলব্ধিতে ভালোবাসা ও কাম অবিচ্ছেদ্য। তথাকথিত স্বর্গীয় প্রেম বা নিষ্কাম ভালোবাসার মধ্যে ফ্রয়েড খুঁজে পান যৌন অক্ষমতা :

এক. On the contrary, I shall put forward the view that psychical impotence is much more widespread than is supposed, and that a certain amount of this behaviour does in fact characterize the love of civilized man.[২৯]

দুই. We cannot escape the conclusion that the behaviour in love of men in the civilized world today bears the stamp altogether of psychical impotence.[৩০]

১৯৯৯ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত A Handbook of Critical Approaches to Literature গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির নবমূল্যায়ন তথা সমালোচনা একদিকে যেমন রয়েছে, তেমনি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সঙ্গে এ কালের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সহজ সারাৎসার এ গ্রন্থে উন্মোচিত হয়েছে। অবচেতন মন, লিবিডো, Id, Ego ও Super ego-র বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

ক. Freud provided convincing evidence, through his many carefully recorded case studies, that most of our actions are motivated by psychological forces over which we have very limited control. He demonstrated that, like the iceberg, the human mind is structured so that its great

---

২৯. Sigmund Freud, Contributions to the Psychology of Love II, *On Sexuality*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

weight and density lie beneath the surface (below the level of consciousness)[৩১]

খ. That most of the individual's mental processes are unconscious is thus Freud's first major premise. The second (which has been rejected by a great many professional psychologists, including some of Freud's own disciples—for example, Carl Gustav Jung and Alfred Adler) is that all human behavior is motivated ultimately by what we would call sexuality. Freud designates the prime psychic force as libido, or sexual energy. His third major premise is that because of the powerful social taboos attached to certain sexual impulses, many of our desires and memories are repressed (that is, actively excluded from conscious awareness).[৩২]

গ. The Id is the reservoir of libido, the primary source of all psychic energy. It functions to fulfill the primordial life principle, which Freud considers to be the pleasure principle. Without consciousness or semblance of rational order, the Id is characterized by a tremendous and amorphous vitality.[৩৩]

ঘ. ... The Id knows no values, no good and evil, no morality.

The Id is, in short, the source of all our aggressions and desires. It is lawless, asocial, and amoral. Its function is to

---

[৩১]. Wilfred L. Guerin, Earle Labor, Lee Morgan, Jeanne C. Reesman, John R. Willingham, *A Handbook of Critical Approaches to literature*, New York, 1999, P. 127

[৩২]. ঐ, পৃ. ১২৮

[৩৩]. ঐ, পৃ. ১২৯

gratify our instincts for pleasure without regard for social conventions, legal ethics, or moral restraint.[৩৪]

ঙ. In view of the Id's dangerous potentialities, it is necessary that other psychic agencies protect the individual and society. The first of these regulating agencies, that which protects the individual, is the ego. This is the rational governing agent of the psyche.[৩৫]

চ. As Freud points out, "In popular language, we may say that the ego stands for reason and circumspection, while the Id stands for the untamed passions." Whereas the id is governed solely by the pleasure principle, the ego is governed by the reality principle. Consequently, the ego serves as, intermediary between the world within and the world without.[৩৬]

ছ. The other regulating agent that, which primarily functions to protect society, is the superego. Largely unconscious, the superego is the moral censoring agency, the repository of conscience and pride.[৩৭]

জ. One of the most instructive applications of this Freudian tripartition to literary criticism is the well-known essay "In Nomine Diaboli" by Henry A. Murray a knowledgeable psychoanalyst and a sensitive literary critic as well. In analyzing Herman Melville's masterpiece Moby-Dick with the tools provided by Freud, Murray explains the White Whale as a symbolic embodiment of the strict conscience

---

৩৪. *A Handbook of Critical Approaches to literature*, Ibid. পৃ. ১৩০
৩৫. ঐ, পৃ. ১৩০
৩৬. ঐ, পৃ. ১৩০
৩৭. ঐ, পৃ. ১৩০

of New England Puritanism (that is, as a projection of Melville's own superego). Captain Ahab, the monomaniac who leads the crew of the Pequod to destruction through his insane compulsion to pursue and strike back at the creature who has injured him, is interpreted as the symbol of a rapacious and uncontrollable Id Starbuck, the sane Christian and first mate who struggles to mediate between the forces embodied in Moby-Dick and Ahab, symbolizes a balanced and sensible rationalism (that is, the ego).[৩৮]

A Handbook of Critical Approaches to Literature গ্রন্থে অবশ্য ফ্রয়েডীয় সাহিত্য সমালোচনার ধারা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। সতর্ক না থাকলে ফ্রয়েডীয় সাহিত্য সমালোচনা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে কী ভাবে বিভ্রান্তিকর মূল্যায়নে পৌঁছে যেতে পারে, সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা রয়েছে গ্রন্থটিতে :

ক. Of all the critical approaches to literature, this has been one of the most controversial, the most abused, and — for many readers — the least appreciated. Yet, for all the difficulties involved in its proper application to interpretive analysis, the psychological approach can be fascinating and rewarding.[৩৯]

খ. The danger is that the serious student may become theory-ridden, forgetting that Freud's is not the only approach to literary analysis. To see a great work of fiction or a great poem primarily as a psychological case study is often to miss its wider significance and perhaps even the essential aesthetic experience it should provide. A number of great works, despite the claims of the more zealous Freudians

---

[৩৮]. *A Handbook of Critical Approaches to literature*, Ibid, পৃ. ১৩১
[৩৯]. ঐ, পৃ. ১২৫

> and post-Freudians, do not lend themselves readily, if at all, to the psychoanalytic approach, and even those that do cannot be studied exclusively from the psychological perspective. Literary interpretation and psychoanalysis are two distinct fields, and though they may be closely associated, they can in no sense be regarded as parts of one discipline. The literary critic who views the masterpiece solely through the lens of Freud is liable to see art through a glass darkly. However, those readers who reject psychoanalysis as neurotic nonsense deprive themselves of a valuable tool in understanding not only literature but human nature and their individual selves as well.[৪৩]

১৯৮৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাড়া জাগানো Psychoanalytic Criticism Theory in practice গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের ধারণা ও পদ্ধতিসমূহকে সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সাহিত্য ব্যাখ্যায় মনঃসমীক্ষণকে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে এ গ্রন্থে :

> Strictly speaking, psychoanalysis is a medical technique, a method of therapy for the treatment of mentally ill or distressed patients that helps them understand the source of their symptoms. But there are a number of reasons the techniques and ideas of psychoanalysis are of special interest for the study of literature. For one thing, in its emphasis on discovery of the source of symptoms,

---

[৪৩]. *A Handbook of Critical Approaches to literature,* Ibid, পৃ. ১৫৬

psychoanalysis is first and foremost a method of interpretation.[৪১]

'ফ্রয়েডের ভালবাসা' গ্রন্থে নৃপেন্দ্রকুমার বসু ফ্রয়েডীয় ভালোবাসার বিচিত্র গতি-প্রকৃতির স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। তাঁর নিরীক্ষণ :

এক. মানুষের প্রেম পারদের মতো চির চঞ্চল। তাহাকে একটা নির্দিষ্ট শৈলীর মধ্যে ধরিয়া রাখিলেও, সে ব্যারোমিটারের মতো উত্তাপে বাড়ে — শৈত্যে কমে। বিভিন্ন স্তরের পরিমাণের ঘৃণা এবং ভালোবাসার পাত্র ও বিষয় আমরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া রাখিয়াছি। এবং অবস্থা-বৈগুণ্যে কেবলই উহাদের পরিমাণের তারতম্য করিতেছি।[৪২]

দুই. তাহার ভালবাসার মাত্রা দীর্ঘকাল বা চিরকাল স্থির রাখিতে পারে না। সময়-বিশেষে সামান্য কারণে, অসামান্য কারণে — এমনকি বিনা কারণেও তাহাদের ভালবাসার পারদরেখা দ্রুতবেগে নীচে নামে।[৪৩]

তিন. কাহারো প্রতি অতিশয় গভীর, অতি বেগবান প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হইবে বা চিরস্থায়ী হইবে এমন কোন কথা নাই ; অতি সামান্য কারণে তাহা বিপরীত মেরুতে সঞ্চরণ করিতে পারে।[৪৪]

চার. প্রেমের মধ্যে আযৌবন ঔপস্থিক কাম একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা মিলনের পর কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্জয় প্রতাপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করে। তারপর অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও মন তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

---

[৪১]. Elizabeth Wright, *Psychoanalytic Criticism Theory in Practice*, London, 1985, P. 27

[৪২]. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

[৪৩]. ঐ, পৃ. ২৮৮

[৪৪]. ঐ, পৃ. ২৯৫

শ্রান্তি ও কায়গত অপারগতা পুরুষের তরফ হইতে প্রথমে আসে। প্রথম প্রেমের ভরা কোটালেও কি প্রেমিক কি প্রেমিকা — জাগ্রতাবস্থায় দিবসের ষোল ঘণ্টার মধ্যে কেহ কাহারও সান্নিধ্যে আট ঘণ্টার বেশী থাকিতে পারে না, রতিরভসের পশ্চাতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বড় জোর এক ঘণ্টা ব্যয় করিতে পারে। বাকি সময়টুকু প্রত্যেককে নিরৌপস্থিক কাম দিয়া ভর্তি করিয়া রাখিতে হয়।[৪৫]

পাঁচ. কোনো বস্তুতে কোনো বিষয়েই অত্যাসক্তি, অন্ধমোহ ও ভাবাতিশয্য ভালো নয়, কারণ অপ্রত্যাশিতভাবে মন উহার প্রতি একদিন ঘোরতর বিমুখ হইতে পারে — বিতৃষ্ণার বিষে জর্জরিত হইতে পারে। ঘুঁটেকুড়ুনির রাজরানি হইবার বাসনা জাগা যেমন স্বাভাবিক, রাজরানির ঘুঁটেকুড়ুনির পোশাক পরিবার আকাঙ্ক্ষা তেমনি স্বাভাবিক। পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়া কেহ আর উচ্চে উঠিবার ঠাঁই পায় না, সেখানে গিয়া বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না ; নিম্নের সানুদেশে ত্বরায় অবতরণের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। দুর্নিবার তরণিবিলাসী ক্রমাগত কিছুদিন নির্বাধ উল্লাসে সমুদ্রভ্রমণ করিয়া, অবশেষে এক টুকরা কঠিন মৃত্তিকায় পদার্পণ করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠে।...[৪৬]

ছয়. বিবাহ করিলেই স্বামী-স্ত্রী একজন অপরকে নিক্তির ওজনে সমান ভালোবাসিবে, একে অপরের জন্য সমানভাবে স্বার্থত্যাগ করিবে, এই ভালবাসা আমরণ ও মরণোত্তরকালেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে ও পরস্পরের প্রতি চির বিশ্বস্ত থাকিবে — এইরূপ আশা সর্বদেশে ও সর্বকালে সমাজপতিরা করিতেন বটে, কিন্তু ফলবতী হয় নাই। অন্যদিকে

---

[৪৫]. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩
[৪৬]. ঐ, পৃ. ৩৩০

> অংশত নারীর দৈহিক দুর্বলতার সুযোগে, অংশত অর্থনৈতিক ও সৌজাত্যবিজ্ঞানগত কারণে সধবা-বিধবার সতীত্বের সুকঠিন ঐতিহ্য তাঁহারা গঠন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকল নারী হৃদয়ের নিকট তাহা হৃদ্য হয় নাই — সাধ্য হয় নাই। তাই সর্বস্তরে পদে পদে স্খলন হইয়াছে — গোপনে, প্রকাশ্যে ও অর্ধ প্রকাশ্যে।[৪৭]

সময়ের বিবর্তনে, সভ্যতার অভিঘাতে, Super Ego-র অনুশাসনে মানুষ আজকের অবস্থায় উন্নীত হলেও তাকে ভেতরে ভেতরে 'সুখকামী পশু'[৪৮] হিসেবেই লক্ষ করেছেন ফ্রয়েড।

ফ্রয়েডের লিবিডো মতবাদ যে সমকালীন পণ্ডিতদের সবাই মেনে নিয়েছিলেন, এমন নয়। তাঁর সর্ব-কামবাদের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন অস্তিত্ববাদী মনোবিজ্ঞানীদের একটি বড়ো অংশ। একদা ফ্রয়েড-শিষ্য এডলার ও ইয়ুং ছাড়াও এঁদের মধ্যে ছিলেন কারেন হোরনে, এরিক ফ্রোম্, সুলিভান, ওটো র‍্যাংক, বিনস্‌ওয়াঙ্গার।[৪৯] মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে ফ্রয়েডের তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করার অপচেষ্টায় কোমর বেঁধে গোটা বই পর্যন্ত লিখে ফেলেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।[৫০]

ফ্রয়েডের গ্রন্থবাহিত তত্ত্ব, বলাবাহুল্য, সমকালীন সাহিত্য-দর্শন-মনোবিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞান-নৃতত্ত্ব-চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, এবং পরবর্তীকালেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কেবল অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যান্ডে নয়, তাঁর তত্ত্ব সাদরে সমাদৃত হয় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া চিলি, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, রাশিয়া, ভারতবর্ষ-সহ নানা দেশে।[৫১] ফ্রয়েডের গ্রন্থ ইংরেজিতে প্রথম অনূদিত হয়

---

[৪৭]. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪
[৪৮]. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
[৪৯]. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
[৫০]. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ফ্রয়েড প্রসঙ্গে, কলকাতা, ১৯৯৪
[৫১]. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫

১৯১৩ সালে।[৫২] আমেরিকা থেকে ফ্রয়েডের বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ *A General Introduction to Psycholoanalysis* গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে।[৫৩] একুশ শতকের পৃথিবীতে, আমাদের অনুমান, সকল পরিচিত ভাষাতেই তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব শুরু থেকেই বিশ্বসাহিত্যে অমোচনীয় ছাপ ফেলতে থাকে। সুনীলকুমার সরকার ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের প্রভাব লক্ষ করেছেন বিশ্বসাহিত্যখ্যাত আটজন ঔপন্যাসিক এবং দুই জন নাট্যকারের সুনির্দিষ্ট উপন্যাস ও নাট্যকর্মে।[৫৪]

বাংলা সাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিরিশোত্তর কথা সাহিত্যের বিষয় এবং প্রকরণে এই প্রভাব লক্ষণীয়। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, উপন্যাসে কাহিনী আর প্রাধান্য পাচ্ছে না, মুখ্য হয়ে উঠেছে চরিত্রের অন্তর্জগৎ নির্মাণ — বিশেষ করে চরিত্রকেন্দ্রিক মনোবিশ্লেষণ প্রবণতা। স্ট্রিম অফ কনশাসনেস পদ্ধতি ক্রমশ ব্যবহৃত হচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে চরিত্রের ইন্টারনাল ডায়ালগ। উপন্যাসের আঙ্গিক হয়ে উঠেছে ক্রমশ তরল, তার কাঠামোগত বন্ধন ঢিলে হয়ে যাচ্ছে।[৫৫]

তিরিশোত্তর উপন্যাসের ধারায় এই নতুনতর উপন্যাসকে প্রবীণ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অতি আধুনিক উপন্যাস' বলে অভিহিত করে সংশয়সঙ্কুল বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন :

---

[৫২]. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, র্বোক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

[৫৩]. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. সতের

[৫৪]. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

[৫৫]. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-১২২ (লেখকেরা হচ্ছেন : এলিজাবেথ বৌয়েন, জেনিফার ডসন্, ফেদর দোস্তায়েভস্কি, উইলিয়াম ফকনার, এফ.স্কট ফিজর‍্যান্ড, উইলিয়ম গোল্ডিং, ফ্রান্জ কাফ্কা, ডি. এইস লরেন্স, আর্থার মিলার ও ইউজিন ও নীল)

১. ফ্রয়েডের তথাকথিত আবিষ্কার অনেকটা অনুমানসিদ্ধ ও এখনও পরীক্ষাধীন ; ইহা সর্বদেশের 'সর্বপ্রকৃতির লোকের জীবন-রহস্যের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।[৫৬]

২. 'মানব প্রকৃতির যে মূল অন্ধকারে আত্মগোপন করে' আছে, তা একজন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলেও তিনি মতামত দিয়েছেন।[৫৭]

বলা বাহুল্য, তাঁর এ মনোভাব রক্ষণশীল।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তিরিশোত্তর কথাসাহিত্যে একটি নতুন তরঙ্গাঘাত করেছে, এ কথা সত্য, তবে এ-কথাও পাশাপাশি স্মরণীয় যে, বাংলা উপন্যাসে সূচনা-লগ্ন থেকেই যৌন জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা এবং মনোবিশ্লেষণ লক্ষ করা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *বিষবৃক্ষ* (১৯৭৩) উপন্যাসের নগেন্দ্রলাল-কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী, *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮)-এর গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিনী ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *চোখের বালি* (১৯০২) উপন্যাসের মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারী, *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬)-র নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপ এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৭) *চরিত্রহীন* (১৯১৭) উপন্যাসের উপেন্দ্র-কিরণময়ী-সতীশ-সাবিত্রী-দিবাকর, *গৃহদাহ* (১৯২০) উপন্যাসের মহিম-অচলা-সুরেশ এবং *শেষপ্রশ্ন* (১৯৩১) উপন্যাসের শিবনাথ-কমল-অজিত-মনোরমা প্রমুখ চরিত্র সৃষ্টিতে এবং তাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও তাদের যৌন জীবনের সঙ্কট রূপায়ণে ফ্রয়েড-পড়া পাঠক সচকিত হবেন এবং ফ্রয়েড নির্দেশিত যৌন চেতনার প্রভাবও খুঁজে পাবেন। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, প্রথমত ১৯২০ সালে আমেরিকা থেকে ফ্রয়েডের গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদের অব্যবহিত পরেই বিশ্ববাসীর কাছে ফ্রয়েড এবং তাঁর তত্ত্ব পরিচিত হয়ে ওঠে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যে সাতটি গ্রন্থের নাম ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তার পাঁচটিই ১৯২০ সালের আগে প্রকাশিত হয়েছে — 'বিষবৃক্ষ' ১৮৭৩-এ,

[৫৬]. *আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৪
[৫৭]. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৪৭

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১৯৭৮-এ, 'চোখের বালি' ১৯০২-এ, 'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬-তে 'চরিত্রহীন' ১৯১৭ সালে। 'গৃহদাহ' ১৯২০ সালে প্রকাশিত হলেও শরৎচন্দ্র এ গ্রন্থটি রচনা শুরু করেছিলেন ১৯১৭ (বাংলা ১৩২৩) সাল থেকে।[৫৮] ১৩২৩ থেকে ১৩২৬ পর্যন্ত মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি কিস্তিতে গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ সনের আষাঢ়-মাঘ সংখ্যায় এবং বই আকারে বের হয় ১৩২৬ সনের ফাল্গুন মাসে। [৫৯] গ্রন্থ রচনায় লেখক ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত হন নি। অবশ্য 'শেষপ্রশ্ন' বের হয়েছে ১৯২০ সালের পরে – ১৯৩১ সালে।

দ্বিতীয়ত, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র তাঁদের অনুধাবন থেকেই চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন বলে মনে করাই স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, কোন উপন্যাস ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা এবং ওই উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব থাকা এক কথা নয়। ফ্রয়েড মানুষের যৌনচেতনার একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যাখ্যাদাতা। একজন সফল লেখকও জীবনরহস্যের রূপকার, এই অর্থে তিনিও যৌন জীবনের ব্যাখ্যা, তাঁর মতো করে দিতে সক্ষম। ফ্রয়েড না জেনেও কোনো লেখকের জীবনোপলব্ধির সঙ্গে ফ্রয়েডের তত্ত্বের সমপাতন ঘটা অসম্ভব কিছু নয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের রাধা চরিত্রটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এর চেয়ে বেশি কিছু বলা চলে না।

ফ্রয়েড-গ্রন্থবাহিত তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কল্লোল যুগের কথাশিল্পীরা। বাংলা কথা সাহিত্যের এই নতুন ধারার পথিকৃৎ[৬০] হিসেবে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) স্মরণীয়, যদিও কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব 'তেমন কিছু নয়'[৬১]

[৫৮]. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮

[৫৯]. *শরৎ রচনাসমগ্র-১*, গ্রন্থপঞ্জি অংশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৮৯৩

[৬০]. ঐ, পৃ. ৮৯৩

[৬১]. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

'তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যতটা চিন্তার উপাদান আছে, ততটা সার্থক শিল্পসৃষ্টি নেই'[৬২] প্রধানত দুটি কারণে : এক, ঘটনাবিন্যাসে আকস্মিকতা, দুই. পারম্পর্যের বিকৃতি। তাঁর *শুভা* (১৯২০) *অগ্নিসংস্কার* (১৯২০), *পাপের ছাপ* (১৯২২) প্রভৃতি উপন্যাসে 'ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মানুষের জৈব অস্তিত্বের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ ঘটেছে।' [৬৩]

নরেশচন্দ্রকে দিয়ে সূচীত হলেও এ ধারাটি বেগবান, পরিপুষ্ট ও শিল্পসফল হয়ে ওঠে দু জন প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকের পরিচর্যা ও অনলস সাধনায়। এঁরা হলেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

জগদীশ গুপ্ত ফ্রয়েড পড়েছিলেন।[৬৪] ফ্রয়েডের ভাষা তিনি অনেক সময় তাঁর লেখায় অনুবাদ করে দিয়েছেন।[৬৫] *দুলালের দোলা* (১৩৩৮) উপন্যাসে তিনি ফ্রয়েডের নামও উল্লেখ করেছেন।[৬৬] মানুষের প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের মর্মমূলে যে তমসা, জগদীশ গুপ্ত তার অসামান্য রূপকার। তাঁর *লঘুগুরু* (১৯২৯), *অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৯২৯), *দুলালের দোলা* (১৩৩৮), *রতি ও বিরতি* (১৩৪১), *নন্দ আর কৃষ্ণা* (১৯৪৭) প্রভৃতি উপন্যাসে জীবনসত্য নির্মাণে ফ্রয়েডই প্রধান অবলম্বন।

'বিংশ শতকীয় মোহভঙ্গের লেখক'[৬৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে।[৬৮] মৃত্যুর দুই বছর পূর্বেও হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তিনি লিখেছেন :

> ...আমি বৈজ্ঞানিক ... সংস্কার বা
>
> ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারি না। [৬৯]

---

[৬২]. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
[৬৩]. ঐ, পৃ. ৭৪
[৬৪]. রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯
[৬৫]. মৃণালকান্তি ভদ্র, জগদীশ গুপ্ত : অস্তিত্ববাদের আলোকে, *জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য*, সম্পা. সমরেশ মজুমদার, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৭৫
[৬৬]. ঐ, পৃ. ৬১
[৬৭]. ঐ, পৃ. ৯৯
[৬৮]. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

অনেকেই[৭০] লক্ষ করেছেন : মানিক তাঁর শিল্পিজীবনের প্রথম পর্বে ফ্রয়েড দ্বারা এবং শেষ পর্বে মার্কস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। একজন আলোচক [৭১] মনে করেন, ফ্রয়েড থেকে মার্কসে উত্তরণের এ ধারণা অতি সরলীকরণ। তাঁর মতে : মানিকের জীবনবোধ মার্কসীয় তত্ত্বে যতোটা আস্থাশীল ছিলো, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে ততোটা নয়।[৭২] অন্য একজন বলেছেন যে, অকমিউনিস্ট মানিক ছিলেন 'ফ্রয়েডেরএকনিষ্ঠ ভক্ত।'[৭৩]

বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রজীবনে থেকেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন যৌনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বই।[৭৪] মানিকের ডাইরি ও চিঠিপত্র ঘেটে মালিনী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : মানিকের ব্যক্তিগত জীবনেও বিকারগ্রস্ততা ছিলো।[৭৫] যৌন বিজ্ঞান, মানব মনস্তত্ত্ব ও বিকারগ্রস্ততার দীক্ষা ব্যক্তিজীবন থেকে গৃহীত হয়েছিল বলে তাঁর উপন্যাসে এ সবের রূপায়ণ এতো বাস্তবোচিত, সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনচল্লিশটি উপন্যাসের সবগুলোই কমবেশি ফ্রয়েড প্রভাবিত। তবে তাঁর পাঁচটি উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

---

[৬৯]. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পুতুলনাচ ও পদ্মানদী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৮২

[৭০]. সরোজমোহন মিত্র, জীবন ও সাহিত্যকৃতি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১৩৭

[৭১]. ক. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৪০
খ. বশীর আল হেলাল, উত্তরকালের গল্প, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
গ. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পকর্ম, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঐ, পৃ. ৩৪৩
ঘ. সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঐ, পৃ. ৩৬৫
ঙ. হায়ৎ মামুদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, ঢাকা, ১৯৯৫, ভূমিকা অংশ, পৃ. উল্লেখ নেই
চ. রফিকউল্লাহ খথান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

[৭২]. মালিনী ভট্টাচার্য, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১২৫

[৭৩]. ঐ, পৃ. ৩৫

[৭৪]. স্বরোচিষ সরকার, মানিকের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

[৭৫]. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

উপন্যাসগুলো হচ্ছে : *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৩৯৩৬), *অহিংসা* (১৩৪৮) ও *চতুষ্কোণ* (১৯৪৮)। তাঁর যে সব গল্পগ্রন্থে ফ্রয়েডের প্রভাব পড়েছে, সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে : *অতসীমামী* (১৯৩৫), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *মিহি ও মোটা কাহিনী* (১৯৩৮) এবং *সরীসৃপ* (১৯৩৯), *বৌ* (১৯৪০), *সমুদ্রের স্বাদ*, (১৯৪৩), *ভেজাল* (১৯৪৪), *হলুদপোড়া* (১৯৪৫), *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬) ও *পরিস্থিতি* (১৯৪৬)। এ-সব উপন্যাসে এবং গল্পগ্রন্থে ফ্রয়েডের প্রভাব কী ভাবে বিদ্যামান, তা-ই আমাদের অন্বিষ্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিরিশোত্তর কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে আরও অনেকেই যুক্ত হয়েছেন তবে তাঁদের কাজ মানিকের মতো অতো ব্যাপক নয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), সুবোধ ঘোষ (১৯১০-১৯৭০), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব : উন্মেষ পর্ব

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) এবং জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্যাটার্নের রূপাভাস দেখা দিলেও, প্রকৃতপক্ষে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই (১৯০৮-১৯৫৬) প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিক, যাঁর উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় জীবনরহস্য অনেকখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকে জানা যায়, ছাত্র বয়স থেকেই তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক পাঠক। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তিনি পড়তেন মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বই।[১] মনস্তত্ত্বের প্রতি এই আগ্রহের সূত্র ধরে ফ্রয়েডের রচনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। তাঁর ঔপন্যাসিক প্রজ্ঞা, বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও নিরাবেগ জীবনবোধ সৃষ্টিতে ফ্রয়েড-রচনা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। মার্কসবাদে দীক্ষা নেবার পূর্ব পর্যন্ত মানিক ছিলেন ফ্রয়েডের 'একনিষ্ঠ ভক্ত'।[২] মার্কসে দীক্ষিত হবার পরেও চরিত্রের অন্তর্দেশ উন্মোচনে অথবা জীবন-সত্য রূপায়ণে তিনি ফ্রয়েড থেকে বিচ্যুত হন নি। একজন সমালোচক বলেছেন :

> জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যখন তিনি আদ্যন্ত মার্কসবাদে নিমজ্জিত, তখনো সম্ভবত তিনি ফ্রয়েডকে একেবারে ভুলে যান নি। ফ্রয়েডকে জীবনের শেষ দশকে তিনি যেটুকু অবহেলা করেছেন, সেটুকু অবহেলা করেছেন শুধু মার্কসবাদে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য নয়, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্যুত করে কোন স্বতন্ত্র দর্পণে দেখা সম্ভব ছিল না বলেই।[৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। তিনি মনে করতেন নিপীড়িত মানুষের সত্যিকার মুক্তি সম্ভব 'বৈজ্ঞানিক শুভবোধ' ও শ্রমজীবীশ্রেণীর একতাবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য করার আগে, *লেখকের কথা*, *মানিক রচনাবলী*, (১২শ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৫৭

২. স্বরোচিষ সরকার, মানিকের কথাসাহিত্যে নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পা., *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩২৮

৩. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৩১-২৩২

মাধ্যমে।[৪] তাঁর 'লেখকের কথা' গ্রন্থের 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে তিনি তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার কথা এবং সেই সূত্রে ফ্রয়েডের রচনা পাঠ করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজের প্রথম বছর কি দু-বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।[৫]

'লেখকের কথা' গ্রন্থের 'গল্প লেখার গল্প' প্রবন্ধে তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতি-বিজ্ঞানচেতনা-বিজ্ঞানমনস্কতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন, 'এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব... বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।'[৬] এই বিজ্ঞানমনস্কতার জন্যই তিনি সারাক্ষণ ছিলেন নানা প্রশ্নের উত্তরসন্ধানী একজন মানুষ। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পূর্বে, অন্তত লেখকজীবনের সূচনাপর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ পর্বে তিনি ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে ছিলেন বিচলিত।[৭] কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেও ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। যখন ভাববাদের মোহ কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তখনই তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, অর্থনীতি মানুষের জীবনে সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ামক। ফলে ফ্রয়েডীয় ধারায় মানুষের অসংগতিকে তিনি বিচার করা ছেড়ে দিয়ে মার্কসীয় ধারায় বিশ্লেষণ শুরু করলেন। মার্কসবাদে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপনের পর মানিক ফ্রয়েডীয়

৪. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১৬৪
৫. মানিক রচনাবলী, (১২শ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৫৩
৬. ঐ, পৃ. ৫৪৬
৭. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

মনোবিকলন তত্ত্ব থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকেন।[৮] মার্কসীয় পর্বে তিনি ফ্রয়েডকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৯] এ পর্যায়ে ফ্রয়েড সম্পর্কে স্বয়ং মানিকের মন্তব্য স্মরণ করা যায় :

> ফ্রয়েডকে আমরা মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসাবে চিরদিন স্মরণ করব, কিন্তু কেপলারের মতো ফ্রয়েডেরও পৌরাণিক সংস্কারে আচ্ছন্ন চিন্তাধারা আজ ঢেলে সাজানো দরকার ... ভ্রান্তি সংশোধন করা দরকার। ...আঁতুড় থেকে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব অন্যান্য লোকজন বা ঘটনাচক্রেই কেবল মানুষের মন গঠিত হয় না — প্রতিটি মানুষের সামাজিক ছাঁচ আছে, ঐতিহাসিক গড়ন আছে, শ্রেণী আছে।[১০]

ফ্রয়েডকে কেন ত্যাগ করলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানিক মার্কসবাদী বিপ্লবী, সাহিত্য-সমালোচক ও তাত্ত্বিক কডওয়েলকে (যিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন) উদ্ধৃত করেছেন, "Just because Fraeudism is not a science, it falls as a therapy."[১১] মার্কসবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন।[১২] ফ্রয়েড সম্পর্কে একদা আগ্রহ এবং দ্বিতীয়পর্বে সেই ফ্রয়েডকেই প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা সমালোচকদের মনে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন সমালোচক বলেছেন, 'একসময় ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব পঠনে ও আলোচনাতে আগ্রহী ছিলেন বলেই মানিকের লেখা সেই আগ্রহের নিরিখে বিচার করা তাই ঠিক হবে না।'[১৩]

১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পরে মানিক তাঁর কথাবার্তায় অথবা ক্ষুদ্র রচনায় ফ্রয়েড সম্পর্কে যতই সমালোচনা ও নিন্দা করেন না কেন, ১৯৪৪ সালের পরবর্তী

---

৮. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯ ও ১৬২

৯. হায়দার আকবর খান রনো, উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক, সম্পা., *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩২৩

১০. হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

১১. ঐ, পৃ. ৩২৪

১২. মালিনী ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাসাহিত্যের বিবাদী চেতনা, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

১৩. ইমতিয়ার শামীম, মানিকের মন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

সময়ে রচিত তাঁর কথাসাহিত্যের অভ্যন্তর সাক্ষ্য ভিন্ন সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পরেও তাঁর সাহিত্যকর্মে ফ্রয়েডীয় প্রভাব ক্ষীণ ধারায় হলেও প্রবহমান থেকেছে। আমৃত্যু মানিকের অবচেতন মনে ফ্রয়েডের বসতি ছিল। মানিকমানসে এই দোলাচল বৃত্তি লক্ষ করেছেন সমালোচকগণ :

ক. মানিকের মার্কসবাদী পর্যায়ের লেখায় কখনো নির্দিষ্টতা কখনো অনির্দিষ্টতা দেখতে পাওয়া, অথবা মানিকের ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ফ্রয়েডীয় 'পজিটিভিস্ট' চিন্তাধারার বাইরেও মানুষের ব্যবহার বা আচরণ দেখতে পাওয়া বিচিত্র নয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের আগেই হোক বা পরেই হোক, বিজ্ঞানদর্শন পরিবর্তনের সন্ধিলগ্নের দোলাচলতা (যা এখনো সামঞ্জস্যে পৌঁছায়নি) মানিকবাবুর কথাসাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ।[১৪]

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে নিয়তিবাদ, মনস্তত্ত্ব এবং মার্কসবাদের পর্যায়ক্রমিক এবং সমান্তরাল অবস্থান রয়েছে। সেজন্য এই সব অবস্থান ও উদ্ভাসনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ জরুরি তাঁর হস্তক্ষেপের ভিত্তি, কেন্দ্র ও মূলে পৌঁছাবার জন্য। তত্ত্বগতভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাবিন্দু নিয়তিবাদ, সেখান থেকে যাত্রা করেছেন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ববাদে এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ববাদের সমান্তরালে তাঁর জাগরণ ঘটেছে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদে।[১৫]

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, অস্তিত্ববাদ অথবা মার্কসবাদ — যে মতবাদেই মানিক আস্থাশীল হোন না কেন, তাঁর সে আস্থা কখনো অন্ধ অনুসৃতিতে পর্যবসিত হয় নি। যেমন কল্লোল যুগের লেখক হয়েও তিনি আর সব কল্লোলীয় লেখকের মতো ছিলেন না ; তেমনি নির্দিষ্ট কোন মতবাদের কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণও করেন নি তিনি। এ সব কারণে মানিক

---

১৪. আনন্দ ঘোষ হাজরা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১৫. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সমাজগঠন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬১

বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। সমালোচকেরা তাঁকে 'নির্বান্ধব' লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এই বলে :

> ত্রিশের দশকে বাংলার সমাজ-জীবনের আলোড়ন-আন্দোলন-বিরোধ, অর্থনীতির পরিবর্তিত স্তরবিন্যাস, টানাপোড়েন, ব্যক্তিসর্বস্বতা, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, প্রচল মূল্যবোধের বদল তিনি শিল্পীর দায় ও তাগিদ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজের জট-বুনুনি-বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সাহসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ দেখতে পান জীবনের কৃত্রিমতা, সীমাবদ্ধতা ও আত্মবিরোধ। স্বাভাবিক কারণে 'চিরন্তন সুন্দর ভাবের দ্যোতনা'য় বা শ্রেণী সমন্বয়ের আদর্শে মানিকের আস্থা ছিল না। নর-নারীর মনস্তত্ত্ব, সম্পর্ক, তার ঘোর ও বিকার, তার প্রবৃত্তির-স্পৃহা-রুগ্ণতা প্রকাশে তিনি কুণ্ঠা বা অস্বস্তি প্রকাশ করেননি। বাস্তবের ক্ষয়-ঝাঁজ-অসুস্থতাকে গল্প উপন্যাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর কাছে দূষণীয় মনে হয়নি। দরিদ্র গর্বিত লড়াকু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ জীবনে ও বিষয়ে, উপস্থাপনায় বাংলা সাহিত্যে ছিলেন নির্বান্ধব।[১৬]

ফ্রয়েডীয় পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নই আমাদের অন্বিষ্ট। এ পর্বের সাহিত্যকর্মে ফ্রয়েডীয় প্রভাব কীভাবে পড়েছে, তা আমরা নির্ধারণ করতে চাই। একজন সমালোচক লক্ষ করেছেন, যে সব লেখায় ফ্রয়েডের প্রভাব পড়েছে, সে সব লেখা নান্দনিক দিক দিয়ে খুব উঁচু পর্যায়ের ছিল।[১৭] 'ফ্রয়েডের রচনা ইতোমধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনাকে শাণিত করে তুলেছিল'[১৮] বলেই তিনি তাঁর প্রথম লেখা 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেন। এ উপন্যাসের কাহিনী বয়নে, চরিত্র সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি জীবনোপলব্ধিতে ফ্রয়েডের প্রবল প্রভাব লক্ষণীয়। 'ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের উদাহরণ হিসেবে এই উপন্যাসে অধিকাংশ চরিত্রের আবির্ভাব — পরবর্তীকালে

১৬. সুশান্ত মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সৃষ্টির দূরত্ব, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

১৭. হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

১৮. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

লেখকের বহু রচনায় যে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক চরিত্রগুলি সৃষ্টি হয়েছে, এখান থেকে যেন তার সূচনা।'[১৯]

কোন কোন পাঠকের কাছে 'দিবারাত্রির কাব্য' কিছুটা খাপছাড়া, এর কাহিনী শিথিলগ্রথিত ও অসঙ্গতিপূর্ণ, এর চরিত্র অস্ফুট, খণ্ডাংশবিশেষ মনে হয়। তাঁদের ধারণা, এ উপন্যাসের দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত বেশ কিছুটা অস্পষ্ট। কাহিনী ও চরিত্র ধূসর হোক বা অস্পষ্ট হোক এ গ্রন্থে ফ্রয়েডের যে প্রবল প্রভাব রয়েছে তা সহজেই লক্ষযোগ্য। চেতন জগতের বর্ণচ্ছটা নয়, ব্যক্তি জীবনের তরঙ্গাঘাত নয়, মানিক রূপায়ণ করেছেন অবচেতন মনের রহস্যময়, সর্পিল অবয়ব। এ কারণে 'দিবারাত্রির কাব্যে' 'বাহ্যবাস্তবতা মূল্যহীন'[২০] হয়ে পড়েছে। একজন সমালোচক লক্ষ করেছেন:

> ... মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব বা যৌন বিকৃতির অবচেতন রহস্যই তাঁর অন্বিষ্ট — অখণ্ড ধারাবাহিক কাহিনী নয়। তাঁর সৃষ্ট নরনারীও খাঁটি রক্তমাংসের সজীব চরিত্র রূপে পাঠকের সামনে সর্বদা প্রতিভাত হয় নি। তারা যেন মানুষের এক একটি Complex বা মানসিক জটিলতার ছবি হয়েই রয়ে গেছে। পূর্ণাঙ্গ চরিত্র রূপে তাদের গড়ে তোলার প্রয়াস লেখক সব সময় পান নি। 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে — 'চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ' — এ কথা লেখকের অন্যান্য অনেক চরিত্র সম্পর্কে সত্য। আসলে অনেক ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সহজ আবেগকে বর্জন করে, জীবনের উপরিভাগে যেখানে সহজ হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ঢেউ ওঠে, তাকে উপেক্ষা করে, লেখক অনেক সময়ে মানুষের মগ্নচৈতন্যের গভীর সমুদ্রতলেই শুধু বিহার করেছেন বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। আর তার ফলেই হয়ত মানুষের জীবনের সামগ্রিক রসমূর্তি তার দৃষ্টিপথের কিছুটা অন্তরালে থেকে গেছে।[২১]

---

১৯. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
২০. আকিমুন রহমান, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৮৬
২১. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩২৯-৩৩০

বঙ্কিমচন্দ্র চমকপ্রদ রোমান্স, ঐতিহাসিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস নির্মাণ করে, মানব জীবনে বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকার জমিনে পাঠককে পরিবেষণ করেছেন রস ও সৌন্দর্য ; একই সঙ্গে তিনি সচেষ্ট থেকেছেন নীতিশিক্ষা দিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব রূপায়িত করেছেন, যার মূলে প্রোথিত পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঐতিহ্য। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন ও তাদের মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও ভাবপ্রবণতা রূপায়ণে শরৎচন্দ্র প্রায় অপরাজেয় কথাশিল্পী। সমসাময়িক দুই প্রধান কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্কর অস্তিবাচক আশ্বাসের সুর ধারণ করে বিচরণশীল ; অবশ্য বিভূতিভূষণের তুলনায় তারাশঙ্কর অনেক বিস্তৃত পটভূমিতে উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাহিনীগুলো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন প্রায় সকল জ্যেষ্ঠ কথাশিল্পীই যেন কিছুটা বহির্দেশের পরিব্রাজক। মাঝখানে মানিক অনেকখানি অন্তর্দেশ অনুসন্ধানী, প্রায় নিঃসঙ্গ পথিক।

মানব জীবনের উপরিভাগের সহজ-স্বাভাবিক হাসি-কান্না ভরা সুখ-দুঃখের কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেষণ করেন নি, তাঁর বিহার মানুষের মগ্নচৈতন্যে। যেহেতু তাঁর অন্বিষ্ট মানুষের গহীন মন, 'সেই হেতু ঘটনার প্রোজ্জ্বল রঙ-চড়ানো বর্ণনা অপেক্ষা মানুষের মনের ওপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য তিনি বেশি উৎসুক।'[২২] তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের এই অন্তর্জগৎ পরিভ্রমণ, তাদের মগ্নচৈতন্যের বিশ্লেষণ লেখকের ফ্রয়েডতত্ত্ব ব্যবহারের পরিচয় বহন করে। 'দিবারাত্রির কাব্যে'র কিছুটা শিথিলগ্রন্থনা ও খাপছাড়া প্রকৃতি দেখে একজন সমালোচক বলেছেন, এটি 'সুগঠিত উপন্যাস নয়', এতে 'পরিকল্পনার দিক থেকে সুগঠনের অভাব আছে।'[২৩] তবে তিনি লক্ষ করেছেন যে, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মনোবিশ্লেষণের প্রয়াস এ উপন্যাসে অনুপস্থিত নয়।[২৪] তিনি সম্ভবত অনুধাবন করতে সমর্থ হন নি যে, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মনোবিশ্লেষণ হেতুই উপন্যাসের গঠনগত এ বৈচিত্র্য। অবশ্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন :

---

২২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৩২ ০
২৩. মনসুর মুসা, দিবারাত্রির কাব্য, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পা., *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
২৪. ঐ, পৃ. ১০৩

> উপন্যাসের গঠন ও উপজীব্য বিষয় (Form and content) লইয়া আধুনিক যুগে যে বিচিত্র পরীক্ষা চলিতেছে, বর্তমান 'উপন্যাস ('দিবারাত্রির কাব্য') সেই পরীক্ষাকার্যেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।[২৫]

বস্তুত ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে টুকরো টুকরো করে দেখার এই অভীপ্সা এবং তার অনিবার্য ফল স্বরূপ উপন্যাসের Form-এর এই শিথিলগ্রন্থনা, চরিত্রের অস্পষ্ট রূপায়ণ মূলত যুগন্ধর মানিক-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের এই দুটো বছরকে অবিশ্বাস্য ফলবান সময় ভাবা হয়ে থাকে, যে সময় তিনি 'বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করে যান'।[২৬]

আগেই বলা হয়েছে, 'দিবারাত্রির কাব্যে' ফ্রয়েডের প্রভাব লক্ষযোগ্য কাহিনীবয়নে, চরিত্র সৃজনে এবং সর্বোপরি জীবনোপলব্ধির রূপ রূপায়ণে। অবদমিত যৌন কামনা-বাসনার দ্বারা তাড়িত-পীড়িত নরনারীর অসুখী জীবনকাহিনী এ উপন্যাসে তিনি রূপায়িত করেছেন। "লিবিডো-আক্রান্ত মানবমনের জটিল রূপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা হিসেবেই এ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য।"[২৭] 'দিবারাত্রির কাব্যে'র হেরম্ব-সুপ্রিয়া-অশোক-উমা-মালতী-অনাথ-আনন্দ তো বটেই, এমন কি ডাকাত বিরসা পর্যন্ত সবাই ফ্রয়েড তত্ত্বাধীন চরিত্র।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র হেরম্ব। পেশায় সে কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। তার অবদমিত রূপতৃষ্ণা-লালসায় আবর্তিত হয়েছে এ উপন্যাসের তিন নায়িকা — সুপ্রিয়া, মালতী ও আনন্দ। স্ত্রী উমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে সে তাকে খুন করেছে। লেখক জানিয়েছেন, 'কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে-ই উমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে খুনী।'[২৮] স্ত্রী উমাকে হেরম্ব সুখী করতে পারে নি, সুখী করতে পারে নি তার তিন প্রেমিকা সুপ্রিয়া-মালতী-আনন্দকে, সুখী হতে পারে নি সে নিজেও :

---

২৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫১৪
২৬. অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২০২, ২২৮
২৭. রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩২
২৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ, সম্পা., ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৮

> সে জটিল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়। জীবনে সে এত বেশি পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্বদাই ঘোরে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ।[২৯]

বাল্যপ্রেমিকা সুপ্রিয়ার স্বামিগৃহ রূপাইকুড়ায় হেরম্বের আগমন দিয়ে এ উপন্যাসের শুরু। কাঙ্ক্ষিত প্রাক্তন প্রেমিকপুরুষকে দেখে সুপ্রিয়া 'আগ্রহ ও উত্তেজনা' গোপন রাখলেও তার প্রস্তুতি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। দারোগা স্বামী অশোক বরকাপাশীতে গেছে খুনে আসামি ধরতে। ঘরে একান্তে দু জন। পাঁচ বছর পর দেখা হবার পর তৃতীয় সংলাপেই সুপ্রিয়া বলে, 'আপনার সঙ্গে আমার ঢের ঝগড়া আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভেতরে চলুন। জামা খুলে গা উদলা করে দিন, পাখা নেড়ে আমি একটু হাত ব্যথা করি।'[৩০] দায়িত্বশূন্য, বখাটে, লম্পট প্রেমিক হেরম্বের কাছে সুপ্রিয়া যখন দেহ-মন-প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিল, তখন তার বয়স মাত্র পনের। হেরম্বের স্পষ্ট মনে আছে, 'পনের বছর বয়সেই তুই একটু বেশি পেকে গিয়েছিলি সুপ্রিয়া।'[৩১] সুপ্রিয়াও স্পষ্ট জবাব দেয়, 'ছেলেমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার বিয়ে যখন দিয়েছিলেন, তখন জেনেছিলাম আপনার অসাধ্য কর্ম নেই।'[৩২] কিশোরী সুপ্রিয়ার দেহ-মনে অমোচনীয় ছাপ ফেলেছিল দায়হীন প্রেমিক হেরম্ব ; তারপর 'ভজিয়ে ভাজিয়ে' তাকে পাত্রস্থ করেছিল দারোগা অশোকের কাছে। স্বামিগৃহে সুপ্রিয়া সুখী হতে পারে নি। পাঁচ বছরের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে তার অকপট স্বীকারোক্তি, 'পাঁচ বছর বুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে, পেট ভরাবার জন্য পরের দাসীবৃত্তি করছি, গরুবাছুরের সেবা করে আর ঘর গুছিয়ে জীবন কাটাচ্ছি — ঝিমিয়ে পড়েছি একেবারে।'[৩৩] সুপ্রিয়া চরিত্রের উন্মোচনের দায়িত্ব এ পর্যায়ে ঔপন্যাসিক নিজেই গ্রহণ করেছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন :

> তার হতাশ বেদনা আজো তাই ফেনিল হয়ে আছে। চেনা মানুষ, জানা মানুষ, একান্ত আপনার মানুষ। যে নিয়মে অচেনা অজানা ছোট দারগা তার স্বামী হল,

---

২৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ, সম্পা., পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
৩০. ঐ, পৃ. ১০৩
৩১. ঐ, পৃ. ১০৬
৩২. ঐ, পৃ. ১০৬
৩৩. ঐ, পৃ. ১০৬

ওই মানুষটির বেলা সে নিয়ম খাটবে কেন ? ও খাটতে দেবে কেন ? একি বিস্ময়কর অকারণ অন্যায় মানুষের ! কেন, ভালবাসা বলে সংসারে কিছু নেই নাকি ? সংসারের নিয়মে এর হিসাবটা গুঁজবার ফাঁক নেই নাকি ? সুপ্রিয়া ভাবে। এত ভাবে যে বছরে তার দু-তিনবার ফিট হয়।[৩৪]

ফিট হওয়া বা হিস্টিরিয়া রোগ সম্পর্কে ফ্রয়েড জানিয়েছেন, অসুখী দাম্পত্য জীবনের এক পর্যায়ে নারীরা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এটি একটি মানসিক রোগ। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন : ইদিপাস কমপ্লেক্স থেকেই সব মানসিক রোগের সৃষ্টি। কামাসক্তিকে যারা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করতে পারে না, তারাই মানসিক রোগে ভোগে।[৩৫] বাস্তব অবাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যৌন ইচ্ছার যখন পরিতৃপ্তি ঘটে না, তখন সে স্নায়ুরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[৩৬] ফ্রয়েড আরও বলেছেন, মানুষের বিষাদগ্রস্ততার কারণ যৌন অতৃপ্তি, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরার কারণও তাই।[৩৭] সুপ্রিয়ার হিস্টিরিয়া, হেরম্বের মাথা ঘোরার কারণ যৌন জীবনে তাদের অচরিতার্থতা।

অবদমিত যৌন কামনা-বাসনার অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় হেরম্ব ছুটে এসেছে তার প্রাক্তন প্রেমিকার কাছে, সুপ্রিয়াও প্রাক্তন প্রেমিকের পদযুগলে তার সবকিছূ সমর্পণ করার জন্যে ব্যগ্র, ব্যাকুল ; অথচ এতোটা কাছে এসেও হেরম্ব এই মানসিক দূরত্বটুকু ঘোচাতে সমর্থ হয় না। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষ একান্তভাবেই অবচেতন মন দ্বারা চালিত। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয়। Id-এর পাশব তাগিদ যেমন সে অনুভব করে, তেমনি Super ego-র নৈতিক চাপও সে উপলব্ধি করে, যার অনিবার্য ফলাফল : স্নায়ুবিক উৎকণ্ঠা, নৈতিক উৎকণ্ঠা।[৩৮] এতোটা কাছে এসেও হেরম্ব সুপ্রিয়াকে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টানতে পারছে না, তার কারণে সে একই সঙ্গে স্নায়ুবিক ও নৈতিক উৎকণ্ঠার শিকার। কাছে এসেও হেরম্বের এই দূরত্ব কখনো সুপ্রিয়ার

---

৩৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
৩৫. সুনীল কুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৯৮
৩৬. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, অরূপরতন বসু (অনু.), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫
৩৭. ঐ, পৃ. ১৪৯
৩৮. সুনীলকুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-৩০

দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো হেরম্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত হয়েছে। সুপ্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে :

> গরমে, আগুনের তাতে, সুপ্রিয়া এতক্ষণে ঘেমে উঠেছে। উঠানে চনচনে রোদ। একটু বাতাস গায়ে লাগাবার জন্য দরজার কাছে সরে এসে দেখতে পেল, হেরম্ব শোবার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনের মাঝে উঠানের ব্যবধান ভরে ঝাঁঝাল কড়া রোদটা সুপ্রিয়ার কাছে রূপকের মতো ঠেকল।[৩৯]

সন্ধ্যাবেলায় সুপ্রিয়ার ঝাউ বাগানে বেড়াতে যাবার উপর্যুপরি তাড়ায় অনিচ্ছুক হেরম্ব শেষ পর্যন্ত বলে : 'যাব বললাম বটে কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম্, ঝাউগাছ দূর থেকেই ভাল দেখায়।'[৪০] ঝাউবাগানে বেড়াতে যাওয়া শেষ পর্যন্ত হলেও হেরম্বের তা ছিলো নিতান্তই দায়সারা পদচারণা। ঔপন্যাসিক বলেছেন, 'শেষ পর্যন্ত মাঠে হেরম্ব তাকে বেড়াতে নিয়ে গেল, কিন্তু বেড়ানো উপভোগ করার ক্ষমতা সুপ্রিয়ার আর ছিলো না।'[৪১] রসগোল্লা তৈরির সময় মগ্নচৈতন্যে সুপ্রিয়া হেরম্বের সাথে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু ঝাউবনে হেরম্বের দারসারা বেড়ানো, অন্যমনস্কতা ও নিরাসক্তি দেখে সে বুঝতে পারে, হেরম্ব বদলে গেছে। তার মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন :

> সন্ধ্যার অবছা অন্ধকারে হেরম্বের সঙ্গে শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে সুপ্রিয়া তার এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে মূক হয়ে গিয়েছিল। এই নিস্তেজ আত্মবিস্মৃত মানুষটার সঙ্গে গিয়ে তার লাভ কি হবে ? ও তো ভুলে গিয়েছে। ও আর চায় না সুপ্রিয়ার দেহ, না চায় তার মন। সংসারের টানে সুপ্রিয়া ওর কাছ থেকে ভেসে গিয়েছে। ওর আর ইচ্ছে নয় সাঁতরে সে ফিরে আসে।[৪২]

সেদিন মাঝরাতে সুপ্রিয়া হেরম্বের ঘরে ঢোকে। এটা সেটা নানা কথা, কিছু ভণিতার পর সুপ্রিয়া সরাসরিই বলে, 'আপনি আমাকে ডাকলেই পারেন। আপনি বললেই বিছানায় উঠে

---

৩৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৪০. ঐ, পৃ. ১১১
৪১. ঐ, পৃ. ১১১
৪২. ঐ, পৃ. ১১২

বসতে পারি।'[৪৩] হেরম্ব তবু চুপ করে থাকে। তার এই নৈঃশব্দ সুপ্রিয়াকে মুখরা করে তোলে। নির্দ্বিধায় তখন সে বলে :

> আজ টের পেলাম, বৌ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়ে মানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে। কাল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে বলে বিছানায় উঠে বসতে দিচ্ছেন না। আমি দাঁড়াতে পারছি না, তবু![৪৪]

সুপ্রিয়া চলে যায়। হেরম্বও শয্যাত্যাগ করে বাইরে বের হয়। রাতের প্রকৃতি বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের পরিচর্যা তখন প্রতীকী, তাৎপর্যমণ্ডিত :

> আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।[৪৫]

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে নিসর্গবর্ণনা বিরল, তবে এসব বর্ণনা কেবল বিবরণমাত্র নয়, 'সেইসব প্রকৃতি প্রতিমা পেয়ে যায় রূপকের তাৎপর্য বা প্রতীকের দ্যুতি'।[৪৬] একজন সমালোচক লক্ষ করেছেন, হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার মধ্যবর্তী ঝাঁঝালো কড়া রোদ, সুপ্রিয়ার কাছ থেকে চলে আসার আগের দিন হেরম্বের বিনিদ্র রাতে বৃষ্টির প্রত্যাশা, সমুদ্রতীরে পিঁপড়েদের প্রণয়চাঞ্চল্যে প্রথমে সুপ্রিয়ার মনে সবুজ ঘাসের স্বপ্ন, পরে শুষ্কশীতল বালির স্পর্শে মরুভূমির উপলব্ধি মূলত লেখকের প্রতীকী পরিচর্যার অসামান্য প্রকাশ।[৪৭]

সারা বছর কলেজে শেলি-কিটস পড়িয়ে হেরম্ব ক্লান্তি দূর করার জন্যে বেড়াতে বের হয়। সুপ্রিয়ার বাড়িতে একদিন কাটিয়ে অতঃপর সমুদ্রের ধারে তার দেখা হয়ে যায় অনাথ বাবুর সাথে। অনাথ হেরম্বের আরেক প্রাক্তন প্রেমিকা মালতীর বর। সত্য বাবুর মেয়ে মালতীর বয়স যখন ষোল, তখন হেরম্ব মাত্র বার বছরের বালক। তবু ওই বয়সেই সে মালতীকে বিয়ে করার

---

৪৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
৪৪. ঐ, পৃ. ১১৭
৪৫. ঐ, পৃ. ১১৮
৪৬. অশ্রুকুমার শিকদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪
৪৭. ঐ, পৃ. ২০৪

জন্যে 'ক্ষেপে উঠেছিল'। মালতী তার গৃহশিক্ষক অনাথের সঙ্গে পালিয়ে যায়। হেরম্বের জীবনে মালতী অধ্যায়ের এখানেই পরিসমাপ্তি।

একদা সুপুরুষ গৃহশিক্ষক অনাথের সঙ্গে পালিয়ে এলেও মালতীর দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি। মন্দির-পূজা-কারণসেবন, তন্ত্র সাধনা, দাম্পত্যকলহ নিয়ে অনাথ ও মালতীর অষ্টপ্রহর ব্যস্ততা থেকে বোঝা যায়, তারা সুখে নেই। এখন কেবল ক্লান্তি, অনীহা আর অবসাদ। একদা যে প্রেমের মোহে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, সে প্রেমের ঘোর তাদের কেটে গেছে। তাদের জীবনে আর সব থাকলেও প্রেম নেই সেখানে। মাঝখানে অষ্টাদশী কন্যা আনন্দই তাদের একমাত্র যোগসূত্র, অবলম্বন, সান্ত্বনা।

মালতী চরিত্রটির অন্তর্গঠন রূপায়ণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি ফ্রয়েডীয়। তার উগ্রতা-স্থূলতা-বিকারগ্রস্ততা ও মুখরা স্বভাব এমন কি তার ধর্ম সাধনার মূলেও রয়েছে তার যৌন অতৃপ্তি। অনাথ তাকে বছরে একটি দিন ভালোবাসে, শরীরী ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে, সেটা মালতীর জন্মদিনে। গত দেড় যুগ ধরেই এই অবস্থা চলে আসছে। দিনের পর দিন শরীরী উপবাসে মালতী শুষ্ক, দীর্ণ। তার বিকারগ্রস্ততা তাই স্বাভাবিক। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> যৌন অতৃপ্তি নিয়ে মালতী তাই ধর্ম-সাধনার অছিলায় মদ্যপান করে। মালতী বৈষ্ণবী, কিন্তু শুধু অনাথের উপেক্ষার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। অনাথের অবহেলার জবাবে মালতীর স্থূলতা স্বেচ্ছাচারিতা উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে ওঠে।[৪৮]

ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সংস্কারের ফলে যখন মানুষের সহজ-স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার অবদমিত কামনা বিকৃত পথ অনুসন্ধান করতে পারে।[৪৯] হতশ্রী প্রৌঢ় স্বামী অনাথের পাশে যুবক হেরম্বকে দেখে বিগত যৌবনা, স্থূলাঙ্গী মালতী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাই বলে :

---

৪৮. অশ্রুকুমার শিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯
৪৯. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, *বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৮

> তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে গো ! তখন হেসে না মরে যদি রাজি হয়ে যেতাম ! আমার তাহলে আজ দিব্যি একটি কচি সুপুরুষ বর থাকত।[৫০]

মানুষের অবচেতন স্তরে নিমজ্জমান প্রবৃত্তির যে তাড়না, তার সঙ্গে সভ্য সমাজ ও সংস্কৃতির যে অভিঘাত তথা চেতন স্তরের যে দ্বন্দ্ব, মানিকের কাছে তা-ই উদ্দিষ্ট। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের স্নায়ুবিক উৎকণ্ঠা এবং নৈতিক উৎকণ্ঠা কীভাবে মানবজীবনকে দীর্ণ করে। তিনি আরও দেখিয়েছেন, মানুষের মনের অসুখটাই আসলে প্রকৃত অসুখ। মানিক মানুষের এই অসুখের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর উপন্যাসে তাই অসুখী মানুষের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। একজন সমালোচক বলেছেন :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট অধিকাংশ বিবাহিতা নারীই দাম্পত্য জীবনে অসুখী। এই 'অসুখে'র কারণ নরনারীর জীবনের সচেতন স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, মগ্ন-চৈতন্যের অতল গভীরে এর আদি উৎসের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক অনেক স্থলেই। ... এক 'অকারণ' দ্বিধা ও সংশয় তাদের দাম্পত্যজীবনের প্রাণরসকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।[৫১]

দাম্পত্যজীবনে অসুখী হেরম্ব তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। সুপ্রিয়া-অশোকও দাম্পত্যজীবনে যেমন সুখী নয়, তেমনি নয় মালতী-অনাথও। হেরম্বের সঙ্গে পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারবে না, জীবন হয়ে উঠবে মায়ের মতো বিষময় – এই আশঙ্কায় আনন্দ আগুনে পুড়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। এমন কি এ উপন্যাসে ডাকাত বিরসাও দাম্পত্যজীবনে সুখী নয়। স্ত্রীর নষ্টামিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিরসা স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। স্বামীকের নিয়ে বিরসার স্ত্রী সুখী ছিলো না বলে সে গোপন প্রেমিকের সঙ্গে প্রণয়মগ্ন ছিলো – আমাদের এ অনুমান নিশ্চয়ই অবাস্তব নয়। কেউই সুখী নয়, কেউ সুখী হতে পারে না, কেন ফুরিয়ে যায় প্রেম, সে কথাই মানিক বলিয়েছেন হেরম্বকে দিয়ে। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে আনন্দের সঙ্গে হেরম্ব যখন রাত জেগে

---

৫০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

৫১. গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬

প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করে, আমাদের মনে হয়, হেরম্ব এ আলোচনা করছে না, স্বয়ং ফ্রয়েডই যেন ব্যাখ্যা করছেন প্রেমতত্ত্ব ।

আনন্দকে দেখে হেরম্ব খুব বিচলিত হয়ে ওঠে। আনন্দের মাঝে সে যেন তার একদাপ্রেমিকা মালতীকেই খুঁজে পায়। তার অবচেতন মনে মালতীর ছবিটি সুপ্ত ছিলো, আনন্দ যেন তার সজীব প্রতিমূর্তি। আনন্দকে দেখে হেরম্বের মনে যে শিহরণ জাগে, যে ছেলেমানুষি উল্লাস জাগে, তা তার অবচেতন মনের তীব্র কামানুভূতির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আলাপচারিতার সিঁড়ি বেয়ে, তত্ত্বকথার পণ্ডিতি বোলচালে মুগ্ধতা সৃষ্টি করে আনন্দের দিকে সে অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে গেছে মূলত তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য। আনন্দের নিবিড় সমর্পণের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ সুখকামী পশু[৫২] বলে সে সুখ খোঁজে। অনাঘ্রাতা কুমারী আনন্দ হেরম্বর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। ফলাফল : মাঝরাতে জ্যোৎস্নালোকিত মন্দিরের সিঁড়িতে হেরম্ব-আনন্দের ঘনমিলন।

আনন্দকে স্পর্শ করার জন্য হেরম্বর মনে এক ধরনের তীব্র আকুলতা দেখা দেয়। একটি নিরীহ ছোট, কালো পিঁপড়েকে 'বিষপিঁপড়া' আখ্যা দিয়ে সে আনন্দর পদতল স্পর্শ করে। হেরম্বর স্পর্শ করার আকুলতাই মুখ্য, পিঁপড়ে অছিলা মাত্র। আবিষ্ট, মোহগ্রস্ত হেরম্বের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> আনন্দকে চোখে দেখে হেরম্বের মনে যে আবেগ ও মোহ প্রথমেই সঞ্চারিত হয়েছিল এতক্ষণে তার মনের সর্বত্র তা সঞ্চারিত হয়ে তার সমস্ত মনোভাবকে আশ্রয় করেছিল। নিজেকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ও মুগ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করার বিস্ময় অপনোদিত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে সেই স্তরে উঠে এসেছিল যেখানে আনন্দের অনিবর্চনীয় আকর্ষণ চিরন্তর সত্য। আনন্দকে চোখে দেখা ও তার কথা শোনা হেরম্বের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নেশা জমে এলে যেমন মনে হয় এই নেশার অবস্থাটিই সহজ ও স্বাভাবিক, আনন্দের সান্নিধ্যে নিজের উত্তেজিত

---

৫২. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

অবস্থাটিও হেরম্বের কাছে তেমনি অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। আনন্দ এখন তাকে আবার নতুন করে মুগ্ধ ও বিচলিত করে দিয়েছে।[৫৩]

মন্দিরের সিঁড়িতে বসে জোছনা রাতে হেরম্ব ও অনন্দ প্রেমতত্ত্ব বিষয়ক যে কূটতর্কে মগ্ন হয়েছিল, সেই তত্ত্বকথার সারসংক্ষেপ মূলত ফ্রয়েড থেকে আহৃত। যুক্তিতে, যুক্তি খণ্ডনে এবং পাল্টা যুক্তিতে হেরম্ব হয়ে উঠেছে ফ্রয়েড-ভাষ্যকার। এমন একগুচ্ছ উদাহরণ :

এক. কিন্তু ভালবাসা কত দিনের ? কতকাল স্থায়ী হয় ভালবাসা ? প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিকলে মানুষকে আর টিকতে হত না। প্রেমের জন্ম আর মৃত্যুর ব্যবধান বেশি নয়। প্রেম যখন বেঁচে আছে তখন দুজনের মধ্যে একজন মরে গেলে শোক হয় – অক্ষয় শোক হয়। প্রেমের অকালমৃত্যু নেই বলে শোকের মধ্যে প্রেম চিরন্তন হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম যখন মরে গেছে, তখন আছে শুধু মায়া, অভ্যাস আর আত্মসান্ত্বনার খেলা, তখন যদি দুজনের একজন মরে যোয়, বেশিদিন শোক হওয়া অসুস্থ মনের লক্ষণ।[৫৪]

দুই. প্রেমের মৃত্যু হওয়ার আগেই ওরা মরে গিয়েছিল। একসঙ্গে দুজনে মরে না গিয়ে ওদের মধ্যে একজন যদি কিছুকাল বেঁচে থাকত তার শোক কখনো শেষ হত না। কিন্তু কিছুকাল বেঁচে থেকে ক্রমে ক্রমে ভালবাসা মরে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে একজন যদি স্বর্গে যেত, পৃথিবীতে যে থাকত, চিরকাল তার শোকাতুর হয়ে থাকার কোনো কারণ থাকত না।[৫৫]

তিন. আনন্দ বলল, 'প্রেম কতদিন বাঁচে ?'

---

৫৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০
৫৪. ঐ, পৃ. ১৩২
৫৫. ঐ, পৃ. ১৩২

হেরম্ব হেসে বলল, 'কি করে বলব আনন্দ! দিন গুণে বলা যায় না। তবে বেশিদিন নয়। একদিন, একসপ্তাহ, বড়জোর এক মাস।[৫৬]

চার. আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রেম মরে গেলে কি থাকে?'
'প্রেম ছাড়া আর সব থাকে। সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করবার জন্য যা যা দরকার। তাছাড়া খোকা অথবা খুকি থাকে – আরো একটা প্রেমের সম্ভাবনা।'[৫৭]

পাঁচ. কিন্তু প্রেম তো থাকে না। আসল জিনিসটাই তো মরে যায়! তারপর মানুষের সুখ সম্ভব কি করে ?
'সুখ হল শুঁটকি মাছ– মানুষের জিভ হল আসলে ছোটলোক। তাই কোনো রকমে সুখের স্বাদ মিটিয়ে জীবনটা ভরে রাখা যায়। জীবন বড় নীরস আনন্দ – বড় নিরুৎসব। জীবনের গতি শ্লথ, মন্থর। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মানুষকে জীবন কাটাত হয়। তার মধ্যে ওই প্রেমের উত্তেজনাটুকু তার উপরি লাভ।[৫৮]

মুগ্ধ শ্রোতা আনন্দের মনেও যে কোন প্রশ্ন জাগে না, তা নয়। তার জানতে ইচ্ছা করে : হেরম্ব কোথা থেকে, কীভাবে এত সব কথা জানে ? এক পর্যায়ে আনন্দ সরাসরি জিজ্ঞেস করে : 'রোমিও জুলিয়েট বেঁচে থাকলে তাদের প্রেম অল্প দিনের মধ্যে মরে যেত, আপনি কি করে জানলেন বলুন।'[৫৯] আনন্দের মনে জাগে তীব্র একটি প্রশ্ন, 'প্রেম যে একটা অস্থায়ী জোরালো নেশামাত্র হেরম্ব এ খবর পেল কোথায়!'[৬০]

হেরম্ব জানায় :

বুদ্ধি দিয়ে জানলাম।' হেরম্ব এই জবাব দিল।

'শুধু বুদ্ধি দিয়ে ?'

---

৫৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩
৫৭. ঐ, পৃ. ১৩৩
৫৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩
৫৯. ঐ, পৃ. ১৪৪
৬০. ঐ, পৃ. ১৪৩

শুধু বুদ্ধি দিয়ে আনন্দ ! বিশ্লেষণ করে।[৬১]

হেরম্বর মুখে যে 'বুদ্ধি' ও 'বিশ্লেষণ'- এর উল্লেখ রয়েছে, সেই বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ একান্তভাবেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ।

মাঝরাতে, চন্দ্রকলা নাচ শেষ করার পর শরীরী আকর্ষণে আরো একটু উষ্ণতার জন্য হেরম্ব ও আনন্দ পরস্পরের দেহসঙ্গ উপভোগ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্লীল, তীর্যক, অনুপম নির্মেদ-নিরাবেগ-নিরাসক্ত বর্ণনা :

এক. (আনন্দ) হেরম্বের দেহের আশ্রয়ে নিজের দেহকে আরো নিবিড়ভাবে সমর্পণ করে সে আকাশের নিস্প্রভ তারা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল।[৬২]

দুই. এতকাল হেরম্ব এক মুহূর্ত বিশ্লেষণ ছাড়া থাকতে পারে নি। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে এসে এবার তার বিশ্লেষণলব্ধ সত্য সূক্ষ্মতার সীমায় পৌঁছেছে। আর তার কিছুই বুঝবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু হেরম্বের আপসোস তা নয় ; এই অক্ষমতার পরিচয় তার জানা : এই তার চরম জ্ঞান। সে বিজ্ঞান মানে, আজ বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে কাব্যকে মানল। চোখ যখন আছে, চোখ দেখুক। দেহ যখন আছে, দেহে রোমাঞ্চ হোক। হেরম্ব গ্রাহ্য করে না। অনাবৃত আনন্দের দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আবরণ আজ কিসে ঘোচাতে পারবে? লক্ষ আলিঙ্গনও নয়, কোটি চুম্বনও নয়।[৬৩]

তিন. প্রেম আছে বলে প্রেম আছে। কাম-পঙ্কের পদ্ম এর উপমা নয়। মানুষের মধ্যে যতখানি মানুষের নাগালের বাইরে, প্রেম তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না – সে প্রেম করছে। এ তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম।

---

৬১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
৬২. ঐ, পৃ. ১৪৭-১৪৮
৬৩. ঐ, পৃ. ১৪৮

> আনন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, দুহাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুশি হয়ে উঠল।[৬৪]

প্রেমকে ইন্দ্রিয়জ ভাবার এই প্রেরণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েড থেকে পেয়েছেন।

মালতী-অনাথের চরিত্র পরিকল্পনা ও তাদের জীবন রূপায়ণেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব বিদ্যমান। একদা রূপবান গৃহশিক্ষক অনাথের সঙ্গে ষোড়শী সুন্দরী মালতী ঘর ছেড়েছিল। কালের বিবর্তনে অনাথের রূপ বিলুপ্ত হয়েছে, মালতীরও লুপ্ত প্রায়। অনাথ পৌঢ়, মালতী বিগতযৌবনা, স্থূলাঙ্গী। বাস্তবতা এই যে, রূপ এক সময় ফুরিয়ে যায় কিন্তু দেহের দাবি ফুরোয় না, হয়তো শ্লথ হয়ে আসে। যদিও দীর্ঘ দিনের দাম্পত্যজীবনে আবেগহীন অভ্যাসে পরিণত হয় শরীরী সম্ভোগ, ফলে প্রবল আকর্ষণ আর থাকে না। একুশ বছর দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করার পর মালতীর প্রতি অশোক আর কোনো শরীরী আবেগ অনুভব করে না। ফ্রয়েড জানিয়েছেন, দাম্পত্যজীবনে পুরুষের আগ্রহই আগে কমে আসে।[৬৫] অনাথের বীতরাগ ফ্রয়েডকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনাথ পূজা-অর্চনা, যোগ সাধনার অজুহাতে মালতীর সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। জন্ম দিনের আগের দিন স্পর্শপ্রত্যাশী মালতী তাকে স্পর্শ করলে তাতেই ভিরমি খেয়ে অনাথ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, এবং জন্মদিনে প্রতিশ্রুত অবশ্য কর্তব্যকর্মের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্যাপারটা খোলাসা করে বলে মালতী নিজেই :

> ক. কাল আমার জন্মদিন। জন্মদিনে শ্রীচরণে ঠাঁই পাই। বছরে ওর এই একটা দিন-রাত্রি আমার সঙ্গে সম্পর্ক, হেসে কথাও কয়, ভালোও বাসে। – গা ছুঁয়ে বলছি ভালবাসে, হেরম্ব !' মালতী মুচকে মুচকে হাসে, 'কেন, তা জান না বুঝি? শোন বলি। সেই গোড়াতে, মাথাটা যখন পর্যন্ত ওর খারাপ হয় নি, তখন পিতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছিলাম, আর যেদিন যা খুশি কর বাপু, কথাটি কইব না, আমার জন্মদিনে সব হুকুম মেনে চলবে। পাগল হলে কি হবে হেরম্ব, পিতিজ্ঞের কথাটি ভোলে নি। মুখ বুজে আজো মেনে চলে।[৬৬]

---

৬৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
৬৫. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, *ফ্রয়েডের ভালবাসা*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩২৩
৬৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

খ. অদেষ্ট দেখেছ, হেরম্ব ? আজ আমার জন্মদিন, জ্বালাতন করব, তাই পালিয়ে গেল।[৬৭]

আনন্দ-হেরম্বের বিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে ঘর বাঁধার পরামর্শে অনাথ বলে, 'এখনো তোমার ঘর বাঁধার শখ আছে, মালতী ? বনে যদি যাও তো চল।'[৬৮] ক্ষেপে গিয়ে মালতী তখন বলে :

> কেন, বনে যাবার এমন কি বয়সটা আমার হয়েছে শুনি? রাধাবিনোদ গোঁসাই কণ্ঠিবদলের জন্য সেদিনও আমায় সেধে গেল না ? মেয়ে টের পাবে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম, ডাকলেই আবার আসে। তোমার চোখ নেই তাই আমাকে বুড়ি দ্যাখ! না কি বল, হেরম্ব? আমি বুড়ি?[৬৯]

অনাথ পালিয়ে চলে যাবার পরেও মালতীর জীবনতৃষ্ণা নিবৃত হয় না। তাই সে তার অনুরাগী গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে যাচ্ছে বলে হেরম্বকে বলে যায়।

জনহীন সাগরকূলে পড়ন্ত বেলায় শেষ দেখা হয় সুপ্রিয়া-হেরম্বের। খালি পায়ে, সাধারণ আটপৌরে ময়লা শাড়ি পড়ে আক্ষরিক অর্থেই সুপ্রিয়া পালিয়ে হেরম্বের সঙ্গে সাগর তীর পর্যন্ত যায়। তারপর সমুদ্রের ধারে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে কলকাতা পালিয়ে যাবার প্রস্তাবে 'ভীরু হেরম্ব' অস্বস্তি কাটানোর জন্য পকেট হাতড়ে চুরুট বের করে, তারপর তার স্বভাবসুলভ বাকচাতুর্যে সুপ্রিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুপ্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নির্মাণে ঔপন্যাসিক প্রতীকী পরিচর্যার আশ্রয় নিয়েছেন :

> সুপ্রিয়ার হাত এতক্ষণে হয়তো অবশ হয়ে এসেছিল, হাত মুচড়ে তার শরীরের আশ্রয়চ্যুত ঊর্ধ্বভাগ হেরম্বের কোলে হুমড়ি দিয়ে পড়লে অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু সোজা হয়েই বসল। স্তব্ধ নিশ্চল, কাঠের মূর্তির মতো। রূপাইকুড়ায় হেরম্বের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে সে এমনিভাবে বসেছিল। হেরম্বের মনে আছে। তখন সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা হয়েছিল। আজ সূর্যাস্তের সূচনামাত্র হয়েছে। ছোট একটি মেঘ এত জোরে ছুটে আসছে যে, সূর্যাস্তের আগেই সূর্যকে ঢেকে

---

৬৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
৬৮. ঐ, পৃ. ১৫২
৬৯. ঐ, পৃ. ১৫২

ফেলবে। সুপ্রিয়ার মুখ থেকে আকাশে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হেরম্বের মুখও বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল। দুহাতে ভর দিয়ে সে বসেছে। দুই করতলে সূক্ষ্ম শীতল বালির স্পর্শ অনুভব করে তার মনে হল, যে পৃথিবীর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত হওয়ার কথা, তার আগাগোড়া হয়ে গেছে মরুভূমি।[৭০]

পর্বতের উচ্চতম শিখর অতিক্রম করার পর মুহূর্ত থেকেই যেমন অভিযাত্রীর অবতরণ পর্ব সূচিত হয়, চন্দ্রকলা নৃত্য শেষে নিবিড়তম শরীরী সান্নিধ্য সম্ভোগের পর আনন্দও তার অন্তর্গত পরিবর্তনকে অনুভব করতে পারে। প্রেমের তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে এমন কথাই বলেছেন ফ্রয়েড।[৭১] হেরম্বকে তাই সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের ভালবাসা কি মরে যাচ্ছে ? ...আচ্ছা, আমাদের ভালবাসাকে অনেকদিন, খুব অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না ?'[৭২] এক পর্যায়ে আনন্দ বুঝতে পারে, ভালোবাসা হচ্ছে মিছে কথা, ভালোবাসা হচ্ছে এক ধরনের অন্ধমোহ, ঘোর, বিকারগ্রস্ততা – শরীরের প্রতি শরীরের দুর্নিবার জৈবিক আকর্ষণের মোহন ছলাকলাই হচ্ছে ভালোবাসা। আনন্দের এ ধরনের আত্ম উপলব্ধিতে ফ্রয়েডের তত্ত্বের উপস্থিতি প্রবল। এ পর্যায়ে আনন্দ হেরম্বকে লোভী ভাবতে শুরু করে :

> আমার মনে হল আমাকে দেখে তোমার লোভ হয়েছিল তাই আমাকে ভুলিয়েছ, আমার ছেলেমানুষির সুযোগ নিয়ে।'
>
> হেরম্ব আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তোমায় দেখে কার লোভ হবে না, আনন্দ? আমারও হয়েছিল। সেজন্য আমি খারাপ লোক হব কেন ?'
>
> 'লোভ হয়েছিল বলে নয়, শুধু লোভ হয়েছিল বলে। আমায় দেখে তোমার শুধু লোভ হয়েছিল, আর কিছু হয় নি?'
>
> 'অর্থাৎ আমার ভালবাসা-টাসা সব মিছে?'
>
> আনন্দ মুখ তুলে তিরস্কার করে বলল, 'রাগ করবে না বলে রাগ করছ যে?'
>
> 'রাগ করব না, এমন কথা আমি কখনো বলি নি।[৭৩]

---

৭০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩
৭১. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮, ২৯৫
৭২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪
৭৩. ঐ, পৃ. ১৭৪

মায়ের জন্মদিনে বাবার পালিয়ে যাওয়া এবং তারই সূত্র ধরে মায়ের অন্তর্ধানের ঘটনা আনন্দের অন্তর্জগৎকে তছনছ করে দেয়। যে প্রেম দিয়ে শুরু হয়েছিল তার বাবা-মায়ের সমাজনিন্দিত দাম্পত্যজীবন, তাদের একুশ বছরের যৌথ জীবনে সে প্রেমের দিন দিন ক্ষীয়মাণ, করুণ রূপটির নিকটদর্শক সে নিজেই। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে প্রেমের বিনাশও তাকে দেখতে হয়। এই ভেবে সে ভয় পায়, হয়তো তার দশাও একদিন তার মায়ের মতো হবে। হেরম্বের সাথে কথোপকথনের মধ্যে বিধৃত হয়েছে তার অস্থিরতা :

> মানুষের ভাগ্যে আমার বিশ্বাস নেই। তোমার সঙ্গে আমার ক'দিনের পরিচয়, এর মধ্যে আমার শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। দুদিন পরে কি হবে কে জানে।
>
> 'শান্তি ফিরে আসবে, আনন্দ।'
>
> আনন্দ বিশ্বাস করল না, 'আসবে কিন্তু টিকবে কি ! হয়তো আমিও একদিন তোমার দুচোখের বিষ হয়ে দাঁড়াব। প্রথম দিন তুমি আর আমি কত উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম, স্বর্গের কিনারায়। আজ কোথায় নেমে এসেছি !'
>
> 'আমরা নামি নি, আনন্দ, সবাই মিলে আমাদের টেনে নামিয়েছে। আমরা আবার উঠব। লোকালয়ের বাইরে আমরা ঘর বাঁধব, কেউ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।'
>
> আনন্দ বলল, "বিরক্ত আমরা নিজেদের নিজেরাই করব। আমরা মানুষ যে!"[৭৪]

তারপর অস্থির, উত্তেজিত আনন্দ প্রবল ঘোরের মধ্যে পরিনৃত্য শুরু করে এবং হেরম্বর জ্বালানো বিপুল, ব্যাপক অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে আত্মাহুতি দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের উপন্যাসসমূহে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে ঔপন্যাসিকের আস্থা সুস্পষ্ট। একজন সমালোচক লক্ষ করেছেন যে, প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলোতে মানিক ব্যক্তির যৌনতাত্ত্বিক সংকটকেই মুখ্য সমস্যা হিসেবে রূপায়িত করেছেন। দিবারাত্রির কাব্যের আনন্দ, পুতুলনাচের ইতিকথার কুসুম এবং পদ্মানদীর মাঝির কপিলা চরিত্রের মনঃস্বভাব অভিন্ন। তিনজনের অবচেতন মন যথাক্রমে হেরম্ব, শশী ও

---

৭৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

কুবেরের প্রতি লুব্ধ, তৃষিত ও উন্মুখ ; কিন্তু সমাজ-প্রতিবেশ ও বিবেকের অনুশাসনের কারণে তাদের মিলন বাধাগ্রস্ত। তিনজনই তাদের রিপুর তাড়না অবদমন করেছে এবং সে কারণে তারা বিষণ্ণ, বিষাদগ্রস্ত। তাদের মনোজাগতিক যে অব্যবস্থা ও বিপর্যয়, তাকে লিবিডোতাড়নার সঙ্গে সচেতন বিবেকাংশের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।[৭৫] সমালোচকের ভাষায় :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসসমূহে বিশেষত দিবারাত্রির কাব্য ও পুতুলনাচের ইতিকথায় নরনারীর সমস্যা ও সংকট উপস্থাপনায় স্পষ্টত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বে আস্থাবান। কারণ এ-তত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত সুপ্রিয়া-মালতী-আনন্দ-হেরম্ব এবং মতি-শশী-কুসুমের জীবনযাপনের বিকার, অসঙ্গতি, সংকট ও সংঘাতের কার্যকারণ থেকে যাবে অস্পষ্ট ও অনির্ণীত।[৭৬]

মনোদৈহিক অতৃপ্তি নিবারণের জন্য দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের বেশির ভাগ প্রধান চরিত্রই সুরাসক্ত। জীবনের না পাওয়ার সব জ্বালা নিবারণের জন্য মদে তারা আশ্রয় খুঁজেছে। একজন সমালোচক লক্ষ করেছেন, এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো বোহেমিয়ান, গৃহসঙ্গ-বিমুখ, কেউ আজন্ম প্রেমিক, তবে সবাই মনোজগতে অতৃপ্ত এবং নিষ্ঠাবান সুরাসেবী। হেরম্ব-সুপ্রিয়া-অশোক-অনাথ-মালতী-আনন্দ — এরা প্রত্যেকেই ব্যক্তি জীবনে অসুখী এবং দ্বন্দ্বদীর্ণ। সুপ্রিয়াকে নিয়ে অশোক সুখী হওয়ার চেষ্টা করলেও সুখী হতে পারে নি। কারণ সুপ্রিয়া এখনও গোপনে বাল্যপ্রেমিক হেরম্বকে ভালোবাসে। সুপ্রিয়া যেন অশোকের স্ত্রী নয়, বরং তার স্ত্রীর একটি 'প্রোজেকশন'। দৃশ্যমান দাম্পত্য জীবনের গভীরে সুপ্রিয়ার মনোজগতে সৃষ্টি হয় এক বিরাট ফাটল। সেই ফাটল আরও বেশি দৃশ্যমান ও গভীর হয় হেরম্বের উপস্থিতিতে। স্ত্রীর গোপন প্রণয় অশোকের অজানা নয়। অশোকের মদে আসক্তি তাই কেবল ব্যাধি নিরাময়ের জন্যই নয়, আবেগহীন দাম্পত্য জীবনের শুষ্কতা থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তিও তার লক্ষ্য। অশোকের দেহসান্নিধ্যবঞ্চিত প্রেমহীন জীবনে বিকল্প আশ্রয়ের জন্য মালতী সুরাসক্ত হয়ে পড়ে। উদাসীন

---

৭৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২

৭৬. ঐ, পৃ. ৫১

স্বামীর নিষ্ঠুর বৈরাগ্য মালতীকে তন্ত্রসাধনার দিকে ঠেলে দেয়। এই তন্ত্রসাধনার অন্য নাম কেবল কারণপান।[৭৭] এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্যে' মদ্যাসক্তির মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক ও মনোদৈহিক। এ উপন্যাসে মানিক দিন-রাত্রির বিপ্রতীপ পটভূমিকায় ব্যক্তিমানুষের ব্যধিগ্রস্ত বিশৃঙ্খল মনোবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।[৭৮]

একজন সমালোচক 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প-প্রতীক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এসব উপমা, চিত্রকল্প ও প্রতীক চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গ বহন করেছে। এ গ্রন্থে ঔপন্যাসিক– কথিত 'খাপছাড়া' ও 'অস্বাভাবিক' রূপের সঙ্গে 'মানুষের এক টুকরো মানসিক অংশ' মূলত ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বেরই উৎকৃষ্ট রূপাবয়ব।[৭৯] প্রসঙ্গত সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ফ্রয়েডীয় লিবিডোর অন্তর্চাপ ও বিকৃতিতে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই নায়ক হেরম্ব বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতের বিপর্যস্ত বিশ্বাসহীন ও জটিল মনোসংগঠনের প্রতিনিধি – 'সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্পণ করে চলতে হয়।' আসলে অতৃপ্ত জীবন ও যৌন অবদমনের চাপে এ উপন্যাসের চরিত্র-পাত্ররা কেউ পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি। হেরম্ব, সুপ্রিয়া, আনন্দ, অনাথ, মালতী, অশোক প্রত্যেকেই মানসিক অবদমনে আবর্তিত। হেরম্বের দুর্জ্ঞেয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় সুপ্রিয়া ও আনন্দ ঘুরপাকই খেয়েছে, মুক্তি পায়নি। সুপ্রিয়া হেরম্বের অভ্যাসানুগ যৌনবিকারের শিকার, দিনের মতোই প্রাত্যহিক। কিন্তু আনন্দ রাত্রিময়, রহস্যাবৃতা, অভ্যাসহীন যৌনতৃষ্ণার মাদকতায় আচ্ছন্ন করে দেওয়া অনিবার্য নেশা।[৮০]

---

৭৭. চঞ্চল কুমার বোস, মানিক-সাহিত্যে মাতাল চরিত্র, ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫
৭৮. ঐ, পৃ. ৬৪
৭৯. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, মানিকের উপন্যাস উপমা চিত্রকল্প, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
৮০. ঐ, পৃ. ১১৬

পাঁচ বছরের দাম্পত্যজীবনে আবেগহীন অভ্যাস নিয়ে বসবাসরত সুপ্রিয়াকে ফ্রয়েডীয় নারীর মতো মূর্ত করে তুলেছেন একজন সমালোচক। তাঁর ভাষায় :

> পাঁচ বছরের দাম্পত্যজীবনে আবেগহীন অভ্যাস নিয়ে বাস করলেও সযত্নে লালন করে রেখেছে হেরম্বের প্রতি তার অচরিতার্থ প্রেমকে। যে কবিতাটি এই দিবাভাগের শিরে উৎকীর্ণ তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলি ও রূপকল্পগুলো হল - শুষ্ক জীর্ণতৃণ, পিঙ্গল সাহারা, মরীচিকা সদৃশ, বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণ ইত্যাদি। আমরা প্রতীক্ষাতুর এক মরুতৃণ-সদৃশ নারীকে দেখি যে নিজেকে তার প্রেমপাত্রের কাছে নিঃশর্ত সমর্পণে প্রস্তুত।[৮১]

সমালোচকের মতে সুপ্রিয়ার প্রেম/যৌনজ আবেদন-আকর্ষণকে হেরম্ব এড়িয়ে যায় স্রেফ সাহসের অভাবে।[৮২] তিনি আরও লক্ষ করেছেন, আনন্দ ও সুপ্রিয়ার প্রেম-এষণা ব্যর্থ হয় হেরম্বের যৌবনহীনতার কারণে।[৮৩] তিনি মত প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, পরিপূর্ণ প্রেমের দাবি মেটারার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের। তাঁর ভাষায় :

> পরিপূর্ণ প্রেমের দাবি মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত অনপচয়িত সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের। কাজেই প্রেম বাঁচে সম্পর্কের প্রগাঢ়তায় নয়, মনস্তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভের মধ্যেও নয়, পরিপূর্ণ যৌবনেই একবার মাত্র প্রেমের শতদল ফোটে। এরপর ঝরে যাবার পালা– যা সাধারণ মানুষ বা মহৎ ব্যক্তি – সকলের ক্ষেত্রেই অমোঘ সত্য। হেরম্ব তার যৌবন-অপরাহ্নের মৃত্যু-উৎসবে অতএব প্রেমপাত্রীকে বিসর্জনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। আমরা শেষ ভাগে এসে প্রত্যক্ষ করি দেহ ঝরে যায় বলেই প্রেম মরে যায়, প্রেম শুধু রঙিন কালিতে ছাপানো অনবদ্য কবিতা-রূপে বাঁচে, তাকে প্রাত্যহিকতায় পেতে গেলে মৃত্যুই ঘটে। হেরম্বের পক্ষে তাই অভিজাত মানসিক সারল্যের প্রতীক প্রেমময়ী সুপ্রিয়াকেও গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।[৮৪]

---

৮১. বেগম আকতার কামাল, দিবারাত্রির কাব্য : মানিক-মানসের আলোছায়া, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৯

৮২. ঐ, পৃ. ১৪০

৮৩. ঐ, পৃ. ১৪৩

৮৪. বেগম আকতার কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

সুতরাং, দিবারাত্রির কাব্য, স্পষ্টতই, ফ্রয়েড প্রভাবিত উপন্যাস। এ উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনায়, ঘটনাবয়নে, চরিত্রসৃজনে, সংলাপ নির্মিতিতে– সর্বোপরি জীবনোপলব্ধির তাত্ত্বিক সংস্থাপনায় সিগমুন্ড ফ্রয়েডই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল অনুপ্রেরণা।

তৃতীয় অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব : বিকাশ পর্ব

'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। এই জনপ্রিয়তার কারণ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বিষয়ের অভিনবত্ব', 'পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতাবর্জিত কথ্য ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ', ' ... উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।'[১] আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'পদ্মানদীর মাঝি'তে লক্ষ করেছেন মহাকাব্যের ব্যঞ্জনা।[২] একজন আলোচক অবশ্য মনে করেন যে, এ উপন্যাসে মানিক 'জেলে জীবনের বিশ্বস্ত ব্যাপক দলিল রচনা করেন নি, তাই চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকেই তিনি সরে গেছেন ওই বাস্তবতা থেকে।'[৩]

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসদ্বয়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের ২৮ মে।[৪] 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বের হয় ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে একই বছরে। হায়াৎ মামুদ জানিয়েছেন : প্রথম প্রকাশের সময় এ গ্রন্থটিতে প্রকাশকাল মুদ্রিত ছিলো না, তবে পরে ১৯৩৬ বলে নিশ্চিত জানা গেছে।[৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধের বিকাশ ও রূপান্তরের ক্রমধারা নির্ণয়ে

---

১. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫১৬।

২. পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৩

৩. আকিমুন রহমান, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৭৬

৪. মাহবুবুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৪৪

৬. মাহবুবুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬

একটি প্রতিবন্ধকতা শুরুতেই তাই দেখা দেয় : প্রশ্ন ওঠে, মানিকের তৃতীয় উপন্যাস কোনটি – 'পদ্মানদীর মাঝি' না 'পুতুলনাচের ইতিকথা'? 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র প্রকাশ সাল জানা গেলেও প্রকাশের তারিখ নিশ্চিত করে জানা যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের রচনাকালই আমাদের সহায়।

'পদ্মানদীর মাঝি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয় 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় বাংলা ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ১৩৪১ সনের পৌষ মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।[৬] দুটি উপন্যাসেরই রচনাকাল বাংলা ১৩৪১ এবং প্রকাশকাল ইংরেজি ১৯৩৬ সাল হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মানদীর মাঝি'র দাবি অগ্রগণ্য এই যুক্তিতে যে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চেয়ে ছয় মাস আগে ধারাবাহিকভাবে এ উপন্যাসটির প্রকাশ শুরু হয়েছিল।

'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয়, আলোচিত-সমালোচিত উপন্যাস। ভারতীয় ভাষায় লেখা বইগুলোর ভেতর এ বইটিই সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৭] ফ্রয়েডীয় পরিমণ্ডলে লেখা প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'তে কাহিনী এবং চরিত্রসমূহ যথার্থ দেশ-কাল ও পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয় নি। কার্তিক লাহিড়ীর অনুধাবন :

> এ উপন্যাসের (দিবারাত্রির কাব্য) জগৎ অনেকটা কৃত্রিম, এবং হেরম্বর প্রেম-সম্পর্কিত ধারণা অনেকটা বইপড়া জ্ঞানের মতো।... প্রেমকে বৃহৎ পটভূমিতে স্থাপন ক'রে তার উৎস, কারুকার্য আবিষ্কারে তৎপর হলেন পরবর্তী রচনাগুলিতে...।... অথচ এ সময়েও অর্থনীতির সূক্ষ্ম ও অমোঘ প্রভাবই যে মূল প্রভাব – সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব'লেই পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল ভিন্নরূপ ...[৮]

---

৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পুতুলনাচ ও পদ্মানদী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঐ, পৃ. ২৬০

এ পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনান্বেষা তত্ত্ব-আক্রান্ত নয়।[৯] জীবনকে পরম বলে জেনেছেন বলে মানিক এ পর্বে বহির্বাস্তবতার সমান্তরালে ব্যক্তি মানুষের সঙ্কটকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেন না মহৎ লেখক মাত্রেই 'এ-কথা বোঝেন যে, জীবন শিল্পের থেকে বড় বলেই শিল্প কখনো জীবনের কোলছাড়া হতে পারে না। শিল্পকে খুঁজে ফেরেন তিনি জীবনকে খুঁজতে খুঁজতেই।'[১০]

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের কেবল দুটি ক্ষুধা আছে – একটি পেটের ক্ষুধা, অপরটি যৌনক্ষুধা। এই দুটো ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। মানুষের জীবনমুখী সকল কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে এই বিশাল ক্ষুধা। মানুষের অন্তর্জীবনের নিয়ামক শক্তি তার অবচেতন মনের জৈব চেতনা। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর-চরডাঙা-আমিনবাড়ি-আকুরটাকুর গ্রামের প্রত্যন্ত জনজীবন বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন, বহির্জীবনের বাস্তবতাতেও ফ্রয়েড কতোটা প্রাসঙ্গিক। কেবল পদ্মাপারের জনপদেই নয়, সুদূর ময়না-দ্বীপের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং যৌনতাড়না এ উপন্যাসে পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ফ্রয়েড।

'পদ্মানদীর মাঝি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের ও কপিলাসহ পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র রাসু, বসিরের স্ত্রী ও এনায়েত প্রবলভাবে লিবিডোতাড়িত। মুখ্যত কুবের ও কপিলার এবং গৌণত রাসু, বসিরের তরুণী স্ত্রী ও এনায়েত চরিত্রের অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করলে এসব চরিত্রের মানসগঠনে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কুবের পদ্মানদীর মাঝি, যদিও উপন্যাসের শুরুতে তাকে জেলে হিসেবে কিছুকাল কর্মব্যস্ত দেখা যায়। তার স্ত্রী মালা বিকলাঙ্গ হলেও সুন্দরী। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় :

---

৯. রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩২।

১০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪২

মালার রং কালো নয়, তামাটে – মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না।[১১]

কুবের চার সন্তানের জনক – বড়ো মেয়ে গোপী এগার বছরের কিশোরী, এর পর দুই ছেলে চণ্ডী ও লখা, শেষে এক সদ্যোজাত পুত্রসন্তান। সে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, কিন্তু অভাব তার সংসারে ছায়ার মতো নিত্য সহচর। ধনঞ্জয়ের নৌকায় গণেশ সহযোগে সে ইলিশ মাছ ধরে, কিন্তু অসম বণ্টনব্যবস্থা, মালিকের চৌর্যবৃত্তি এবং মাছের পড়তি বাজারমূল্যের দরুন কুবেরের সংসারের অভাব আর ঘোচে না। হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেবার পর অবশ্য দুটো পয়সার মুখ সে দেখতে শুরু করে, যদিও তার সবগুলোই নীতিসম্মত উপায়ে অর্জিত – এমন বলা যাবে না।

কপিলা সুন্দরী, যৌবনবতী। তার বিয়ে হয়েছে আকুরটাকুর গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক শ্যামাদাসের সঙ্গে। টাকার অভাব না থাকলেও শ্যামাদাসের অভাব আছে সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের। উপরন্তু, সে গোঁয়ার। শীতের শুরুতে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কপিলা রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে এলে শ্যামাদাস কপিলাকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার মানসিকতায় আরেকটি বিয়ে করে। ফাল্গুন মাসে কপিলাকে স্বামিগৃহে পাঠানো হলে সেখানে তার ঠাঁই হয় না, তাকে তার 'পশু' স্বামী তাড়িয়ে দেয়। অগত্যা তার আশ্রয় হয় বাবার বাড়ি, যদিও মায়ের দিন-রাত গালমন্দে তার জীবন ওষ্ঠাগত। বন্যাউপদ্রুত চরডাঙ্গায় শ্বশুর বাড়ির খোঁজখবর নিতে এলে শ্যালিকা কপিলার সঙ্গে কুবেরের সাক্ষাৎ ঘটে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে কপিলার প্রথম অনুপ্রবেশ। ঔপন্যাসিক কুবেরের স্মৃতিসূত্রে অতীত চিত্রণরীতিতে রূপায়ণ করেছেন কপিলার শৈশব ও দাম্পত্যজীবনের কিছু টুকরো ছবি :

---

১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৮

> কুবেরের বিবাহের সময়ে বড় দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশি চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ। তাহার পর কপিলার বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আগে। কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী হইয়াছে তাহার মন? আর কি কোনোদিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটিকে ঘাটের উপর হইতে ছুড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা একা পলাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনো হয়তো সে কুবেরকে চ্যালাকাঠ ছুড়িয়া মারিবে না। না মারুক! একজন চ্যালাকাঠ ছুড়িয়া মারিবে না বলিয়া আফসোস করিবার কী আছে? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দুচোখ ঝাপসা হইয়া আসিল।[১২]

বন্যার পানি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য কুবের শ্বশুর বাড়ির সবাইকে নিমন্ত্রণ করে। জামাতার এই ঔদার্যে সবাই মুগ্ধ হলেও বাস্তবতার কারণে সবার যাওয়া সম্ভব হয় না। ঠিক হয়, ছেলেমেয়েগুলো যাবে, তাদের দেখাশোনা করার জন্য সঙ্গে যাবে কপিলা। বেড়াতে যাবার উপলক্ষে কপিলা বেশ সেজেছে। লেখকের বর্ণনা :

> কপিলা খুব সাজিয়াছে। চুলে চপচপে করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, গায়ে হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তার বেগুনি রঙের শাড়িখানি। স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো তার কাঁচা।[১৩]

ঝোঁকের মাথায় কুবের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে বটে, কিন্তু তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কী ভাবে করবে, তা নিয়ে সে স্বস্তি পায় না। তার মানসভাবনা প্রকাশ করেছেন লেখক সুনিপুণভাবে :

---

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১৩. ঐ, পৃ. ৩৫২

ক. এদিকে স্বস্তি নাই কুবেরের। তার মতো গরিব কে আছে জগতে? এই যে এতগুলি মানুষ আসিল বাড়িতে ইহাদের সে খাওয়াইবে কী। আউশের ফসল নষ্ট হওয়ায় এবার যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে এখন হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। জলমগ্না পৃথিবীতে আহার্যের মূল্য বাড়িয়াছে। ইলিশের মরসুম বলিয়া এখন যদি বা কোনো রকমে চলিয়া যায়, তারপর? দু-চার পয়সা জমাইবার আশা ঘুচিয়া গেল।[১৪]

খ. কুবের এইমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরো কয়েকটা প্রাণীকে সারি দিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতের অনিবার্য ক্ষুধায় তার ভরা পেটের অন্ন যেন মুহূর্তে হজম হইয়া যায়। মালা বসিয়া বসিয়া সকলের খাওয়ার তদ্বির করে, গোপীর পাতের ডালমাখা ভাতটুকু সে আদর করিয়া তাহার ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দেয় – এ দৃশ্য কুবের আর দেখিতে পারে না। নৌকায় গিয়া সে বসিয়া থাকে।[১৫]

অতিথিদের আগমনে যে কুবের ঘরের প্রতি একটু আগেই বিতৃষ্ণা বোধ করেছে, কপিলার লীলাপরায়ণতায় সে গৃহের প্রতিই সে সহসা আকর্ষণ বোধ করে। সন্ধ্যাবেলায় নির্জন নদীতীরে কুবেরের সাথে কপিলার ভিন্নতর পরিচয় ঘটে। মেজাজের আকস্মিক ঊর্ধ্বগতির জন্য কুবের তামাক না নিয়েই মাছ ধরার নৌকায় আগেই চলে এসেছে – ধনঞ্জয় ও গণেশ তখনো এসে পৌঁছে নি। তাকে তামাক পৌঁছে দেবার অছিলায় কপিলা এসে ছলাকলা শুরু করে দেয়। 'খাটাসের মতো' হাসতে হাসতে বলে, 'ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ!'[১৬] তারপর বলে, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'[১৭]

---

১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

১৫. ঐ, পৃ. ৩৫৩

১৬. ঐ, পৃ. ৩৫৩

১৭. ঐ, পৃ. ৩৫৩

তাচ্ছিল্য করে কপিলা কুবেরকে এ উপন্যাসে বারবার 'আরে পুরুষ' বলে বিদ্রূপ করেছে মূলত তার বন্যপৌরুষ জাগানোর জন্য, এবং 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' বলে নিজেকে যেমন সমর্পণ করেছে, তেমনি কুবেরের আদিম বাসনাকে উসকানি দিয়েছে। নিরীহ ও গোবেচারি কুবের প্রথম দিকে কপিলার এসব ছলাকলা বুঝতে পারে না :

> কপিলা আব্দার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা? হ। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা।'
>
> কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, 'আরে পুরুষ!'
>
> তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস – সব বড় রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড় ভয় হয়। সে সস্নেহে বলে, 'পাঁক মাইখা মরস কেরে কপিলা? মাইন্ষে কইব কী? যা বাড়িত্ যা।'
>
> কে জানে কী আছে কপিলার মনে?[১৮]

সন্ধ্যাবেলার এই ঘটনাটি কুবেরের জীবনধারায় বড়ো রকমের পরিবর্তন সূচিত করে। বেগুনি রঙের শাড়িটি পরে চুলে চপচপে তেল দিয়ে কপিলা শুধু লীলাখেলা করতেই পটু নয়, সেবাও করে সে – জীবনে কখনো যে সেবা কুবের পায় নি। সারারাত পদ্মার বুকে কাটিয়ে এসে এখন সে না চাইতেই পা ধোয়ার পানি পায়, ভাতের জন্য হাঁকডাক করতে হয় না, খাওয়া শেষ হলেই তামাক চলে আসে, প্রস্তুত থাকে তার দীনমলিন শয্যা। সুযোগ পেলেই কোনোদিন গোঁফ ধরে টান দিয়ে, কোনোদিন চিমটি কেটে, হাসি চেপে রেখে চোখের পলকে উধাও হয়ে 'ঘুম আসিবার আগেই

---

১৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩

কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।' তাই 'পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে।'[১৯]

পুরুষসঙ্গবঞ্চিত কপিলাও বাবার বাড়িতে থাকার চেয়ে ভগ্নিপতির বাড়িতে থাকতেই আগ্রহ বোধ করে। বড়ো ভাই অধর তাই তাকে পিতৃগৃহে নিয়ে যাবার জন্য তাড়া দিলেও সে তাই চলে যায় না, বরং 'ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়।' পূজার সময় আবার আবির্ভাব ঘটে অধরের। সে রাগারাগি পর্যন্ত করে কপিলাকে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু কপিলা যায় না, বরং না যাওয়ার ছুতো সন্ধান করে। কুবেরও তার পক্ষে সাফাই গায় :

> কপিলা গেল না। বলিল, 'কেন, ঘর পড়িয়া গিয়া ঢেঁকিঘরটাতে যখন তাহারা সকলে একসঙ্গে মাথা গুঁজিয়া ছিল, অসুবিধার অন্ত ছিল না, তখন অধর আসিতে পারে নাই? এখন নূতন ঘর উঠিয়াছে, থাকিবার কোনো অসুবিধা নাই, এখন সে যাইবে কেন এদের এই বিপদের মধ্যে ফেলিয়া?' কুবেরও ইহাতে সায় দিয়া বলিল, 'হ, কেন যাইবে কপিলা তাদের এই বিপদের সময়? [২০]

পুরুষসান্নিধ্যবঞ্চিত, স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা জীবনতৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য পুরুষসঙ্গ প্রত্যাশা করে। সে কেবল তলারটাই কুড়ায় না, গাছেরটাও পাড়ে। জমিদার বাড়ির কর্মচারী শীতল বাবুকে দৃশ্যপটে এনে পূজামণ্ডপে তার সঙ্গে কপিলার মাখামাখি-হাসাহাসি – 'নির্লজ্জ আচরণ' – দ্বারা সুকৌশলে লেখক কপিলা চরিত্রের এই দিকটি উন্মোচন করেছেন। শীতল বাবুর সঙ্গে কপিলার মাখামাখি ধরনের ঘনিষ্ঠতা কুবেরকে সঙ্গত কারণেই ঈর্ষাবিদ্ধ ও অভিমানী করে তোলে। ছেলে লখাকে নিয়ে সে পূজামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ির পথে জোরে জোরে পা ফেলে সে। তার মানসচিন্তাটি ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন এভাবে :

---

১৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩

২০. ঐ, পৃ. ৩৫৯

> একটু পথ গিয়াই গতি তাহার হইয়া আসিল মন্থর। না, কপিলার জন্য ফিরিয়া সে যাইবে না, তবে আস্তে আস্তে হাঁটিতে দোষ নাই। কপিলা আসিয়া সঙ্গ নেয় তো নিক। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কপিলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক কর্তব্য হইবে না। হয়তো শীতলকেই সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে বলিবে। এতখানি অন্ধকার রাস্তা শীতলের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে কপিলা? তার চেয়ে বিড়ি কিনিবার ছলে এখানে কুবেরের দাঁড়ানোই ভালো।[২১]

ইতোমধ্যে কপিলা এসে পড়ে। কৌশলে ভাগ্নে লখাকে সে প্রতিমাদর্শনার্থী শীতল বাবুর স্ত্রী যুগীর হাতে সমর্পণ করে নিরালায় কুবেরের মুখোমুখি হতে চায়। তার লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। ঈর্ষা, অভিমান আর ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা কুবের যখন 'তেঁতুল গাছের তলে পথের যেখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রচিত হইয়াছে সেখানে' হঠাৎ শক্ত করে কপিলার আঁচল চেপে ধরে বলে, 'শীতলের লগে অত কথা কিসের তর, আঁই?' তখন কপিলা 'রাস্তার মদ্যি, ইডা কেমনতর কাণ্ড জুড়লা?' বলে বটে, কিন্তু সে আঁচল টেনে যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করার কোনো চেষ্টা করে না, বরং 'কুবের তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে শান্ত হইয়া থাকে'। কুবের আরো অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে অবশ্য কপিলা পিছিয়ে আসে। সে বলে, 'মনডা ভালো না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়।' এতে কুবেরের রেশ কেটে যায়। কপিলাকে সে ছেড়ে দেয়। 'তর মন কাতর ক্যানরে কপিলা?' প্রশ্নে কপিলা বলে 'সোয়ামীরে মনে পড়ে মাঝি'।

কপিলার এই বিষণ্ন উক্তিতে নারীর চিরায়ত অস্তিত্বের সংকট ধরা পড়েছে। স্বামী পরিত্যাক্তা বলেই সে বৈধভাবে পুরুষসান্নিধ্যবঞ্চিত, আর সেই কারণেই কখনো শীতল, কখনো কুবেরের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়। নারী জীবনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ লাঞ্ছনার শিকার হয়ে তাই কপিলার মুখ থেকে স্বগত উক্তির মতো বেরিয়ে আসে, 'সোয়ামীরে মনে পড়ে মাঝি'।

---

[২১]. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০

কপিলা চরিত্রের কয়েকটি দিক লক্ষণীয়। সে তার জীবন তৃষ্ণার নিবৃত্তি চায়। তবে সমাজসম্মত পথ খোলা থাকতে সমাজনিন্দিত পথ সে বেছে নেয় নি। যখন সমাজসম্মত পথ তার সামনে খোলা নেই, কেবল তখনই সে সমাজনিন্দিত পথে পা বাড়ায়। বিবাহপূর্বকালে এবং আকুরটাকুরে স্বামিগৃহে থাকাকালীন সে অন্য কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করেছে, এমন কোনো প্রমাণ উপন্যাসে নেই। পরপুরুষের জন্য তৃষ্ণা তার প্রকাশ পেয়েছে যখন সে স্বামী পরিত্যাক্তা, নতুবা ওই সময়, যখন দৃশ্যপটে তার স্বামী অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, সে যখন পরপুরুষকে প্রলুব্ধ করে, তখন টান বজায় রাখার একটি কৌশল সে অবলম্বন করে। একটু লীলাপরায়ণ না হলে পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় না; আবার তাকে দেহ-মন-প্রাণ উজাড় করে সবকিছু সমর্পণ করার পরে যে পুরুষের আকর্ষণে ভাটা পড়ে – এও তার ভালো করেই জানা। তাই রাত বিরেতে কুবের তাকে জড়িয়ে ধরলে সে যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না, তেমনি তার চেয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে তাকে সায়ও দেয় না। পুরুষকে কী ভাবে টানতে হয়, কাতটা কাছে আর কতটা দূরে রাখলে আকর্ষণ বজায় থাকে, এ বিষয়ে কপিলার বিশেষ জ্ঞান ছিলো। গ্রাম্য, দরিদ্র, অশিক্ষিত একটি নারী মনস্তাত্ত্বিক এই প্রত্যয় কী ভাবে অর্জন করলো – এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। প্রেমের বিচিত্র গতি প্রকৃতি, তার আকর্ষণ-বিকর্ষণের রহস্যময় তত্ত্ব এই গ্রাম্য যুবতীর জানার কথা নয়। ফ্রয়েড প্রভাবিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে কপিলা চরিত্রের ওপর ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শন আরোপের প্রয়াস পেয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে।

মহকুমা শহর আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীকে ভর্তি করার পর সবাই কেতুপুর ফিরে গেলেও কপিলা জিদ করে কুবেরের সঙ্গে থেকে যায় :

> কেহ তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুবের কত বলিল, নিজে সে কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, মেয়ে মানুষ সঙ্গে থাকিলে কত হাঙ্গামা, কত অসুবিধা – তাছাড়া লোকে বলিবে কী? কপিলা কোনো কথাই কানে তুলিল না।

কুবেরের সঙ্গে একান্তভাবে রাত কাটানোর সুযোগ সে হাতছাড়া করতে নরাজ। এমন কি এ জন্য কলঙ্ক নিয়েও সে ভাবিত নয়। কুবেরের 'সোয়ামী শুইনা কী কইব তর ভাবছস নি' — এ প্রশ্নের

জবাবে সে অবলীলায় বলে 'কউক!' এ পর্যায়ে কুবেরের ভাবনাটি প্রকাশ করেছেন লেখক এভাবে, 'শুধু গোপীর জন্যই কি কপিলা রহিয়া গেল? গোপীকে সে এত ভালবাসে? কে জানে! কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।'[২২]

নির্জনে একান্ত নিশিযাপনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল কপিলা, কুবের নয়। সন্ধ্যাবেলা গোপীকে দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কুবের বাড়ি ফেরার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না। এরপর কপিলার প্ররোচনায় ছ আনা ব্যয়ে হোটেলে চাঁটের বেড়ায় আচ্ছাদিত ঘরের অংশবিশেষ ভাড়া করে। একত্রে নিশি যাপনের প্রশ্নে কপিলা পূর্বাপর অনড় থাকলেও কুবের দ্বিধাহীন হতে পারে না :

> কুবের উঠিয়া দাঁড়ায় বলে, 'শো কপিলা।'
>
> 'তুমি কই যাও?'
>
> 'উই পাটিতে শুই গিয়া আমি, যামু কই?'
>
> ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে কপিলা বলে, 'না, যাইও না মাঝি।'
>
> কুবের কি রাগিয়া যায়? কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করে, 'কী করুম তবে?'
>
> 'ডরামু মাঝি।'
>
> কী আর করিবে কুবের, আবার সে পাটিতে বসে। কপিলা তাহার চাদরখানা পুঁটুলি করিয়া তাহাকে বালিশ করিয়া দেয়।[২৩]

তবে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন সকালে কপিলার যে লজ্জাবোধ, তা মূলত তার অপরাধবোধ থেকে উদ্ভূত :

---

২২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

২৩. ঐ, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

> পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড় লজ্জা করিতেছে কপিলার, দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জানে যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে স্বামী সে তাহার নয়।[২৪]

দু দিন পর কুবের আবার যখন আমিনবাড়ি হাসপাতালে মেয়েকে দেখতে যায়, তখন কপিলা তার সাথে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু মালার অনিচ্ছা, সর্বোপরি কুবেরের ভীরুতার জন্য তার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

পরদিন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে কুবের দেখে কপিলার স্বামী শ্যামাদাস এসেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ায় কপিলাকে সে নিতে এসেছে। শ্যামাদাসকে দেখে কুবের ঈর্ষাবোধ করে, স্বামীর সঙ্গে কপিলার ছলাকলায় সে ক্ষুব্ধ হয়। অবহেলা পেয়ে সে অভিমানও করে। কপিলার কাছে তেল চেয়ে না পেয়ে সে :

> বাঁশের পাত্রটি তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুরবেলায় অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতর গিয়া দু পয়সার তেল কিনিয়া আনিল। কপিলাকে দেখাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সর্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেল মাখিল, নিজের দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতোই তেলে জবজবে করিয়া ছাড়িবে।[২৫]

অভিমান করে কপিলার সঙ্গে সারাদিন সে কথা বলে না। এবং মাছ ধরতে যাবার সময় তামাকের গোলা সঙ্গে করে নিয়ে যায় না এই আশায় যে, কপিলা তাকে নৌকায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। নৌকায় বসে বসে সে কপিলার প্রত্যাশা করে কিন্তু তার সে প্রত্যাশা পূরণ হয় না। পরদিন কপিলা স্বামীর সঙ্গে চলে যায়।

---

২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫

২৫. ঐ, পৃ. ৩৬৮

কপিলা চলে যাবার পর কুবের কাজে মন দিতে পারে না। সারাক্ষণ কপিলার ভাবনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জগা মাঝির স্ত্রী কপিলার মতো করে হাঁটে বলে অন্যমনস্ক হয়ে কুবের তার পেছন পেছন গিয়ে হয় বিব্রত ।

অশান্ত মনের তাগিদে কুবের একদিন ভোর-ভোর বেলা গোপীকে আনার নাম করে বার-তের মাইল পাঁয়ে হেঁটে আকুরটাকুরে কপিলার স্বামিগৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়। স্বামিগৃহে কপিলা যে বিশেষ সুখে আছে, তা বোঝা যায় তাকে দেখেই :

> ডুরে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার বর্ষার পদ্মার মতো। কী ভীষণ খুশি মনে হইতেছে কপিলাকে! নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায় কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে।[২৬]

একা বসে বসে কুবের ভাবে। ময়না দ্বীপের এনায়েতের ও বসিরের স্ত্রীর প্রণয়দৃশ্যের কথা তার মনে পড়ে যায়। এনায়েতকে সে ঈর্ষা করতে শুরু করে। বসে থাকতে থাকতে পথ চলার শ্রান্তিতে ঘুম আসে কুবেরের। 'আধজাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশকুসুম' :

> সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে, কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে – গণেশকেও বলিয়া সে রাজি করিবে যাইতে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম, কুবির বাই, তাই করুম – আইনা দিমু কপিলারে।[২৭]

---

২৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪

২৭. ঐ, পৃ. ৩৮৪

সুবচনীর হাটে যাবার ছল করে কুবের আকুরটাকুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কপিলার কাছে তার আসল উদ্দেশ্য চাপা থাকে না, উপরন্তু, হাটবার আজ নয়, আগামী কাল – এই তথ্য প্রকাশ করে কপিলা যখন তাকে পরিহাসছলে 'হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িত যাইও' বলে, তখন কুবের লজ্জিত হয়। তাই শ্যামাদাসের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কুবের আর থাকতে রাজি হয় না।

অভিমানী কুবের সুবচনী হাটে এক ময়রার দোকানের বেঞ্চে গিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, জ্বরগ্রস্ত হয়ে তাকে আবার ফিরে আসতে হয় কপিলার বাড়িতেই। 'পরের ঘরের বৌ' কপিলার পক্ষে স্বামিগৃহে কুবেরের প্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা সম্ভব হয় না। পাট ও পাঁঠার দুর্গন্ধে ছোট একটি ঘরে একা একা থাকতে হয়। পরদিন জ্বর ছাড়ার পর রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে কুবের যাবার সময় বলে, 'গুরু-ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে। তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে।'[২৮]

কুবেরের শান্ত, গতানুগতিক জীবন ধারায় কপিলা স্পষ্টতই একটি বড়ো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সে বুঝতে পারে, তার জীবনটা বদলে দিয়েছে কপিলা :

> অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ করিয়া দিয়াছে, নদী ও নদীতীরের একটানা জীবনে তাহার গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায় ছিল ময়নাদ্বীপ! সব একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে।[২৯]

প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির সমপাতন না ঘটলেও কপিলার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ এলে কুবের তা হেলায় হারাতে চায় না। তাই অধরের নিকট থেকে সে যখন জানতে পারে যে কপিলা চরডাঙ্গায় বেড়াতে এসেছে, দিন কয়েক থাকবে, তখনই সেখানে যাবার জন্য কুবের ব্যাকুল হয়ে ওঠে :

---

২৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৬

২৯. ঐ, পৃ. ৩৮৬

> মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা-চাপল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে-ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামাদাসের উঠানে ভোরবেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা? হ, ও জিজ্ঞাসার মানে কুবের বোঝে। আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনি যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরভাঙায়, কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে। – কুবেরকে দেখিয়া তাহার বোতলটি কাত করিয়া আরো খানিকটা তেল মাথায় ঢালিবে কপিলা : তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনাভরা হাসি, বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে।[৩০]

দুই ছেলেকে সঙ্গে করে সে চরডাঙ্গায় যায়। কুশল জিজ্ঞাসার এক পর্যায়ে তার 'ক্যানরে কপিলা, অসুখ নি করছে তর?' প্রশ্নের জবাবে কপিলা অকপটভাবে বলে, 'মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি'; কিন্তু বলতে বলতেই আঁচলের আড়াল থেকে এক ভাঁড় চুন হলুদ সে কুবেরের গায়ে ঢেলে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, সে আগের মতোই লীলাপরায়ণ।

পুকুর ঘাটের লীলাপর্ব এরই ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন, সাহসিকতায় উত্তীর্ণ :

> কাদা ধুইয়া স্নান করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে কুবের গেল পুকুরে। কপিলা বুঝি টের পাইয়াছিল। খানিক পরে সেও পুকুরঘাটে আসিয়া হজির।
>
> 'আমারে রং দিলা না মাঝি?'
>
> 'পাঁক দিমু কপিলা? রং ত নাই!'
>
> দূর অ! রং নাই, পাঁক দিবার চায়! দিও না মাঝি পাঁক, দিও না কইলাম!'

---

৩০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

> পাঁক দিতে বারণ করে কপিলা কিন্তু পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে সে গড়াইয়া পড়ে। হাতের ঠেলায় কলসী ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে। কপিলা বলে, 'ধর মাঝি, কলস ধর।'
>
> বলে, 'আমারে ধর ক্যান? কলস ধর।'
>
> হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসীর মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, 'কথা যে কও না মাঝি?'
>
> কুবের বলে, 'তর লাইগা দিবা-রাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা।[৩১]

গোপীর বিয়েতে কপিলা আবার কেতুপুর আসে। এবার কপিলা অনেক পরিণত, অনেক পরিবর্তিত :

> সরিয়া সরিয়া পলাইয়া বেড়ায় কপিলা, ঢেঁকিঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কুবের ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইয়া থাকে। এ তো ছলনা নয়, খেলা নয় কপিলার। কী যেন ভাবিয়া আসিয়াছে কপিলা এবার, বড় সে গম্ভীর। একটু হাসি, দুটি কথার কাঙাল কুবের, কপিলার হাসি কই? কথা কই কপিলার মুখে।[৩২]

শুধু লীলালাস্যে নয়, একান্তভাবেই সে কুবেরের সঙ্গী হতে চায়। কিন্তু কোন পথ সে খুঁজে পায় না।

যে পুরুষ মানুষটি তার দেহমন জুড়ে আছে, সে, যে তারই বোনের একমাত্র অবলম্বন – এ দায় যেমন সে এড়াতে পারে না, তেমনি তার দেহমনের সব দাবিও সে উপেক্ষা করতে পারে না। উভয় সঙ্কটের জন্যই তার এ অভূতপূর্ব গাম্ভীর্য। উপন্যাসের শেষে কুবেরের সঙ্গে তার ময়না দ্বীপে চলে যাওয়া তাই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বলা যায়, কুবের-কপিলার সমাজনিন্দিত প্রেমের

---

৩১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬

৩২. ঐ, পৃ. ৩৯৭

এ এক অনিবার্য পরিণতি। এ প্রসঙ্গে সেই রাত্রিটির কথা পুনর্বার স্মর্তব্য : মাইল দশেক উজানে গিয়ে নৌকায় পাট বোঝাই করে দেবীগঞ্জে যখন সে ফিরে এলো, তখন রাত অনেক হয়েছে। সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই অত রাতে কেউ কেতুপুর ফিরতে রাজি হলো না। বাড়িতে যেহেতু রয়েছে কপিলা, তাই কুবেরের মন পড়ে ছিলো বাড়িতে। তাই নদীর ধার ধারে সে গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করে। একাকী পদযাত্রায় কপিলাকে নিয়ে স্বপ্নবিলাস তাকে সুখ দিয়েছে। সে ভাবছিল :

> কারো ঘুম না ভাঙাইয়া কপিলাকে কি তোলা যাইবে না? আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু দুটা সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে। বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ।[৩৩]

সন্ধ্যার পর মাঝরাত অব্দি কপিলা নদীর ঘাটে একাকী দাঁড়িয়েছিল। কুবেরের অমঙ্গল আশঙ্কা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত হবার অবকাশ দেয় নি। কুবের ফিরলে তার 'বক্ষের আশ্রয়ে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া' বাড়িতে পুলিশের তল্লাসী ও পীতম মাঝির চুরি যাওয়া টাকার ঘটি উদ্ধারের বৃত্তান্ত জানায়। হোসেন মিয়ার ফায়সালায় যখন কুবেরের ময়না দ্বীপ যাওয়া সাব্যস্ত হয়, তখন 'না গেলা মাঝি, জেলখাট' বলে কপিলা নির্লোভ উদার মানসিকতার পরিচয় দেয়, যা কুবেরের প্রতি তার প্রগাঢ় প্রেমেরই বহির্প্রকাশ। হোসেন মিয়াকে চক্রান্তকারী বিবেচনা করে কুবের যখন মনে করলো, ময়নাদ্বীপে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর নেই এবং ওই রাতেই ময়নাদ্বীপে যাওয়ার জন্য সে হোসেন মিয়ার নৌকায় চড়ে বসে, তখন কপিলা তার সঙ্গী হয়। লেখকের বর্ণনা :

> ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।

---

৩৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

ছইয়ের মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারবে না।[৩৮]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের এবং কপিলার হৃদয়বৃত্তি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বপ্ন-প্রত্যাশার মূলে ক্রিয়াশীল থেকেছে তাদের অবদমিত মনের যৌন কামনা-বাসনার তাড়না – লিবিডোই তাদের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি। এ উপন্যাসে কপিলার আগমনের পর থেকে কাহিনীর গতিধারায় পরিবর্তন ঘটেছে। কুবেরের কর্মকাণ্ডে যে পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছে, তার নেপথ্যে কপিলার লীলা-লাস্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। তামাক নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে কুবেরের সঙ্গে সে রহস্যময়ী নারীর মতো ছলাকলা আরম্ভ করে। কপিলার রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসা, কাদায় বসে পড়া এবং 'আরে পুরুষ' বলে উসকানি দেয়া কুবেরকে ভাবিত করে তুলেছে। তামাক দিতে আসা কপিলা মূলত একটু রঙ ঢঙ করে কুবেরের সঙ্গে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াসী। বোকা কুবের তার শ্যালিকার মতিগতি সহসা বুঝে উঠতে পারে না বলেই তার 'আরে পুরুষ' বলে উসকানি দেওয়া। কুবেরের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে, তার সেবাযত্ন করে সে মূলত কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। গোঁফ ধরে টান দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যেও রয়েছে কুবেরকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস। কপিলার এ সব 'সেবা-যত্ন' এবং 'শ্যালিকাসুলভ রসিকতা' ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রথম সন্ধ্যায় নদীর তীরে কপিলার কাদার মধ্যে বসে পড়া, হাত ধরে টানাটানি এবং 'আরে পুরুষ' বলে উসকানির অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলেও পরে কুবের সবই বুঝতে শুরু করে। এরপর থেকেই সে কপিলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। অসুস্থ গোপীকে আমিনবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর গোপীকে দেখাশোনা করার অছিলায় কপিলার থেকে যাবার একটাই উদ্দেশ্য – কুবেরকে একান্তভাবে সে কাছে পেতে চায়। স্বামিসঙ্গবঞ্চিত কপিলার যৌনতৃষ্ণা নিবৃত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল।

---

৩৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯

কপিলা চরিত্রে স্পষ্টতই তিনটি পর্ব লক্ষণীয়। সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে তামাক নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে আমিনবাড়ি হোটেলে রাত কাটানো পর্যন্ত একটি পর্ব, আকুরটাকুরে স্বামিগৃহে ও চরডাঙ্গায় বাবার বাড়িতে অবস্থানকাল দ্বিতীয় পর্ব, এবং গোপীর বিয়েতে পুনরায় কেতুপুরে আসার পর তার চরিত্রের তৃতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে কপিলা তার যৌনতৃষ্ণা নিবারণের জন্য কুবেরকে প্রলুব্ধ করেছে। দ্বিতীয় পর্বে স্বামী-সংসারে মন দিতে চেয়েছে সে। তৃতীয় পর্বে সে কুবেরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছে। প্রথম এবং তৃতীয় পর্বে কুবেরের প্রতি তার সমর্পণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথম পর্বে সে মূলত শুধু দেহের দাবি মেটাবার জন্য ছলাকলা করেছে। এ পর্বে তার দেহ মুখ্য, মন গৌণ। তৃতীয় পর্বে দেহ গৌণ, মন মুখ্য। প্রথম পর্বে পুঞ্জীভূত যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য প্রবল আকর্ষণে সে কুবেরের দিকে ছুটে গেছে। এখানে সে Id চালিত। দ্বিতীয় পর্বে সে অবদমন করেছে। Id তাকে কুবেরমুখী করে, Super ego তাকে স্বামী-সংসার-সমাজমুখী করে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। স্বামী-সংসারে সে মন দেবার চেষ্টা করেছে। Id এবং Super ego র লড়াইয়ে তার মধ্যে জেগেছে নৈতিক উৎকণ্ঠা। আকুরটাকুরে তার কাছে কুবের উপস্থিত হয়েছিল সুবচনীর হাটে যাবার নাম করে। কুবের তার কাছ থেকে ঘনিষ্ঠতা আশা করলেও স্বামিগৃহে তার পক্ষে কুবেরের প্রত্যাশা পূরণ করা অসম্ভব ছিলো। পাট ও পাঁঠার দুর্গন্ধ কুবেরকে যতোটা পীড়া দিয়েছে, তার চেয়েও বেশি পীড়া দিয়েছে কপিলার দূরত্ব। আশাভঙ্গ হয়ে কুবের ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাবার প্রাক্কালে কপিলাকে যখন কটুকথা বলছিল, তখন পাছে কেউ শুনে ফেলে, এই ভয়ে কপিলা ছিলো বিব্রত। অনুরূপভাবে, চরডাঙ্গায় পুকুরের মধ্যে কুবের যখন কপিলাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখনও কপিলা সমাজের ভয়ে হয়েছিল শঙ্কিত। Id এবং Super ego র দ্বন্দ্বে কপিলার মন জুড়ে ছিলো তখন নৈতিক উৎকণ্ঠা, তাই তার পক্ষে কুবেরের প্রত্যাশা পূরণ করা অসম্ভব ছিলো। কিন্তু তৃতীয় পর্বে কপিলা নৈতিক উৎকণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে বলে অবলীলায় কুবেরের সঙ্গে ময়না দ্বীপে চলে যায়। সে দৃঢ়চিত্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। Super ego র নিম্নচাপ উপেক্ষা করার শক্তি এ পর্যায়ে সে সঞ্চয় করেছে।

রাসু চরিত্র নির্মিতিতেও ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। স্ত্রী-সন্তানদের ময়নাদ্বীপে বিসর্জন দিয়ে সে যখন কেতুপুরে ফেরে, তখন তার মধ্যে জীবনীশক্তি দৃশ্যত নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ কখনো থেমে থাকার নয়। ফ্রয়েড বলেছেন, আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নিরন্তর সংগ্রামী করে। কেতুপুরে ফেরার পর গোপীকে দেখে মুগ্ধ হবার পর রাসু নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। গোপীকে দেখবার জন্য সে নির্জন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো তার হাতে তুলে দেয় উপহারসামগ্রী। তার এ সকল কর্মকান্ডের নেপথ্যে তার অবদমিত জৈবিক কামনা-বাসনাই কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি। গোপীকে হাসপাতালে নেবার সময় তার সাহায্য-সহযোগিতা, হাসপাতালে গিয়ে দফায় দফায় ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর খোঁজখবর নেওয়া, সময়ে অসময়ে কুবেরের বাড়ি এসে কখনো গোপীর অগ্রগতি নিরীক্ষণ, কখনো কুবেরের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ প্রদান – সবকিছুর মূলে রয়েছে গোপীকে লাভ করার আগ্রহ। পা সেরে গেলে পাছে বিয়ে না দেয়, এই আশঙ্কায় অসুস্থ গোপীকেই সে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত। রোগগ্রস্ত পীতম মাঝিকে সেবার নাম করে রাসু মূলত চুরি করার সুযোগ সন্ধান করেছে। গোপীকে লাভ করার জন্য সে পীতমের সঞ্চিত টাকা-পয়সা চুরি করেছে। কুবের রাসুর কাছে মেয়ে বিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দান করেছিল। সে যে পরিমাণ টাকা যৌতুক হিসেবে দাবি করেছিল, তা বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশি হবার পরও সে পরিমাণ অর্থ প্রদানেও রাসু সম্মত হয়। অথচ তার কাছে না দিয়ে কুবের যখন বঙ্কুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তখন রাসু প্রকাশ্যেই হুমকি দেয় ; জানিয়ে যায় : সে প্রতিশোধ নেবে। কুবেরের ঢেঁকি ঘরে পাটকাঠির নিচে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া টাকার ঘটিটি সে লুকিয়ে রাখে। পুলিশের ভয়ে কুবের হোসেন মিয়ার পরামর্শে ময়না দ্বীপে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সুতরাং রাসুর যৌন জীবন এ উপন্যাসের কাহিনী-ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। কেবল কুবের-কপিলার নয়, এ উপন্যাসের পরিণতি নির্ধারণেও রাসুর যৌনতৃষ্ণা পালন করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ময়নাদ্বীপে এনায়েত ও বসিরের তরুণী স্ত্রীর সমাজনিন্দিত প্রেমের মূলেও রয়েছে তাদের অবদমিত কামবাসনা। বৃদ্ধ বসিরের বার্ধক্য, যৌন দুর্বলতা-শিথিলতা তার তরুণী স্ত্রীকে ভেতরে ভেতরে যে অসুখী করে তুলেছে, তার প্রকাশ ঘটে এনায়েতের সঙ্গে তার আচার-আচরণে। যৌনজীবনে অতৃপ্ত, অসুখী এই তরুণী বধূটি এনায়েতকে দেখে হেসেছিল। তার হাসি এনায়েতকে প্রলুব্ধ করেছিল বলেই একদিন ভর দুপুরে সবাই যখন কাজে গেছে, তখন সে চুপিচুপি বসিরের ঘরে ঢোকে। তবে বৌটি কেন তার নাগরকে দেখে চেঁচামেচি করে উঠেছিল, তা রহস্যজনক। এনায়েতের প্রাকৃত প্রেমের নেপথ্যে তার যে সায় ছিল, তা বলাই বাহুল্য। সায় না থাকলে সে রাতের বেলা চুপিচুপি এনায়েতকে ভাত খাওয়াতে যেত না। তার প্রলোভনে-আকর্ষণে দুপুর বেলা নির্জন ঘরে এনায়েত যখন গিয়ে ঢোকে, তখন সে হয়তো ঘটনার আকস্মিকতায় ও আতিশয্যে চিৎকার করে ওঠে। পাছে পাশের বাড়ির আকবরের স্ত্রী দেখে ফেলে, এই আশঙ্কাতেও সে চেঁচামেচি করতে পারে।

হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপে দরকার নবাগত শিশু সন্তান। বৃদ্ধ বসির দীর্ঘ দিনেও স্ত্রীর কোল জুড়ে শিশু উপহার দিতে পারে নি, তখন হোসেন মিয়া বসিরের স্ত্রীর সঙ্গে এনায়েতের বিয়ের ব্যবস্থা করে। এনায়েত এবং বসিরের স্ত্রী চরিত্রদুটিও লিবিডোতাড়িত, অবদমিত কামবাসনার দ্বারা পরিচালিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম জেলেদের নিয়ে উপন্যাস লেখেন।[৩৫] হায়দার আকবর খান রনো পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুলনাচের ইতিকথা গ্রন্থ দুটিকে বিদেশি সাহিত্যের অনেক নোবেল প্রাইজ পাওয়া বইয়ের সঙ্গে তুলনীয় বলে বিবেচনা করেন।[৩৬] পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করেছেন সৌমিত্র শেখর। তাঁর ভাষায় :

---

৩৫. সরোজমোহন মিত্র, পদ্মানদীর জেলেজীবন ও ময়নাদ্বীপ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৯১

৩৬. উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১

ক. পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রয়োগ বিভিন্ন চরিত্রে লক্ষ করা যাবে। শীতলবাবুর সঙ্গে কপিলার হাসি-তামাশায় কুবের ঈর্ষান্বিত হয়ে ভেবেছে : 'ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কী কথা কপিলার?'[৩৭]

খ. পুরাণে কুবের হলেন যক্ষরাজ ধনদেবতা; আর এ উপন্যাসে কুবের পেশায় মাঝি, অর্থনৈতিক দিক থেকে হতদরিদ্র। চরিত্রের এই নামকরণের মধ্যে সমাজের প্রতি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী চরম পরিহাস-সৃজন! তবে মনোরাজ্যে কিন্তু কুবের সম্রাট; কপিলার জন্যে তার 'পরাণডা পোড়ায়'। যে স্ত্রীকে নিয়ে জীবন ঠেলে কুবের, সেই মালা পঙ্গু, হাসতে জানে না। উচ্ছলতা কখনোই মালার মধ্যে ছিল না। সদাবিষণ্ণ এই নারীর ঠিক বিপরীত কিন্তু কপিলা। উপন্যাসে আছে : 'তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনা ভরা হাসি, বসিবার দুর্নিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে'। আসলে এ সব কুবেরকে পাগল করেই রেখেছে। তাই 'নিজের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে কুবের ভাল বুঝিতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা বেদনা টিপটিপ করিতেছে।' কুবের মাঝি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মতো নিজের মধ্যে আরোপিত রূপতৃষ্ণা অনুভব করেনি। বরং আদিম সহজাত একটা কামনা তার মধ্যে ছিল। এর জন্ম এক প্রকার অতৃপ্তি থেকে, মালার সাহায্যে যা নিবৃত্ত করতে পারেনি কুবের। এ ক্ষেত্রে কুবের আর কপিলা প্রতীপমেরুর। তারপরও কুবের সন্তানের জনক। কিন্তু কপিলা সন্তান থেকে বঞ্চিত, স্বামীর ভালোবাসা তো অনেক দূরে! তাই সে কখনো নির্জন সন্ধ্যায় কুবেরের হাত ধরে টেনে তাকে নৌকোয় নিয়ে যেতে আব্দার করে। কুবের তার শরীরে হাত দিয়ে 'অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মত তাহাকে পিছনে হেলাইয়া বলে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা।' কপিলা কাদার মধ্যে বসে পড়ে, বলে : 'আরে পুরুষ!' সন্ধ্যায় জল-কাদায় ভেজা

---

৩৭. সৌমিত্র শেখর, উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

কপিলার এ অবস্থা দেখে কুবেরের বড়ো ভয় হয়। এ ভয় কপিলাকে নয়, সমাজকে। তাই কুবের কপিলার কাছে এ ভয় অব্যক্ত রাখে না, বলে : 'মাইন্‌ষে কইব কী? যা বাড়িত যা।' কপিলাও কুবেরকে গভীরভাবে অনুভব করে, ভালোওবাসে। উপন্যাসে কুবেরের প্রতি কপিলার দুর্বলতা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী শ্যামাদাসের কাছে সে অর্থবিত্ত কম পায়নি, কম পেয়েছে 'অন্য কিছু'। এই 'কিছু'র জন্য কুবেরকে সে মনে মনে কাছে চায়। কিন্তু তার পরও তাকে বলতে হয় : 'যাওগা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি।' এ কথা আরো স্পষ্ট হয় যখন কুবের নিজের বাহুবন্ধনে কপিলাকে রেখে বলে : 'তর লাইগা দিবারাত্র পরাণডা পোড়ায় কপিলা।' তখন কপিলাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয় : 'নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আছে।' – এই 'মানুষ আছে' অর্থাৎ সমাজের ভয়ে কুবেরও কপিলাকে বলেছিল : 'মাইন্‌ষে কইব কী? যা বাড়িত যা।' আসলে কুবের ও কপিলা কেউ কাউকে দূরে ঠেলে দিতে চায় না, কিন্তু বড়ো ভয় সমাজকে। – এভাবেই উপন্যাসে কুবের ও কপিলার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাব দৃষ্ট হয় এবং দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট।[৩৮]

গ. মেজবাবুর নৌকায় মালার হাসপাতালে গমনকেও কুবের সহ্য করতে পারেনি। মালাও নিশ্চুপ নয়। সে-ও কপিলার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে : 'কেন চুপ যাইবে? কুবেরের দরদ আছে নাকি মালার জন্যে? সেতো কপিলার মত ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারে না।' ময়নাদ্বীপে এনায়েতের সঙ্গে তরুণী স্ত্রীর সম্পর্কও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা যায়। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব ও অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ এ উপন্যাসে ব্যক্তি থেকে সমাজ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।[৩৯]

---

৩৮. সৌমিত্র শেখর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৪

৩৯. ঐ. পৃ. ৩০৫

উত্তরকালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে কপিলা প্রবৃত্তির দুরন্ত বিলাস।[৪০] গিয়াস শামীম লক্ষ করেছেন : 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের-কপিলাকেন্দ্রিক ঘটনাংশ ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত।[৪১]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপমা-চিত্রকল্প বিশ্লেষণ করে বায়তুল্লাহ্ কাদেরী দেখিয়েছেন যে, এ উপন্যাসের উপমা ও চিত্রকল্পে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের রূপাভাস ঘটেছে :

> ক. সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনভঙ্গির আলোকপ্রক্ষেপণ নদীতীরের মানুষের সরল, নিরাবয়ব বর্ণনের বদলে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক লিবিডো-নির্ভর, জটিল দুর্বোধ্য অঞ্চলের বর্ণনার রেখাভাস কি 'দুর্বোধ্য সংকেত' 'অস্পষ্ট সংকেত' প্রভৃতির মাধ্যমে উপমায়িত হয়েছে? বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংকেতায়িত করছেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে মানুষের যে যৌনাবেগ ও তজ্জনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তারই দিকে। বস্তুত বাংলা উপন্যাসে ফ্রয়েডের মনোগুহার সংকেত এ-প্রথম মূর্ত হয়ে উঠল। মানিক-উপমার এই দিকটি নিঃসন্দেহে নতুনত্বের স্মারক। বলা প্রাসঙ্গিক, এই সংকেত উপমানটি যৌবনের উদ্দামতা, লিবিডোর গোপন ইঙ্গিত ও অপ্রতিহত প্রেরণারূপেও মানিক-উপন্যাসের একটি পুনরাবৃত্ত অনুসঙ্গ।[৪২]
>
> খ. আবার কপিলার পূর্ণায়ত দেহবল্লরী, যৌবনভারাক্রান্ত উদ্দাম লিবিডোচেতনাকে কলসির প্রতীকী চিত্রকল্পের সঙ্গে উপমিত করেন 'হাতের ঠেলায় কলসি ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে' বস্তুত কলসিরূপী কপিলার কুবেরমুখী আকর্ষণকে যেমন এখানে

---

৪০. মোহাম্মদ আজম, কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৪২. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, মানিকের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

প্রতীকায়িত করা হয়েছে তেমনি উপন্যাসের পরিণামী মীমাংসা কুবেরের সঙ্গে কপিলার নৌকায় ভেসে ময়নাদ্বীপে প্রস্থানের রহস্যসঙ্কেতও এই বাক্যে উন্মোচিত। লক্ষণীয় 'হাতের ঠেলায়' কলসি ভেসে যায়; এক অজ্ঞাত ও অনির্দেশ্য হাতটানের (চুরি) অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েই কিন্তু কলসরূপী কপিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কুবের ময়নাদ্বীপে। কুবের-কপিলার অবদমনের অবৈধ প্রণয়ের ভাসন্ত-ডুবন্ত রূপও মূলত কলসির মতোই – 'তেমনই ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে'।[৪৩]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের, কপিলা, রাসু, এনায়েত, বসিরের স্ত্রী – সবার হৃদয়বৃত্তি, স্বপ্ন-প্রত্যাশা ও বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূলে সক্রিয় থেকেছে তাদের কামবাসনা। এ উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মিতিতে এবং চরিত্রের মৌলিক প্যাটার্ন গঠনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবহমান থেকেছে লিবিডোর সর্পিল প্রবাহ। চরিত্রের একান্ত যৌন জীবন তাদের বৃহত্তর জীবনধারাকে নির্মাণ করেছে।

মানুষের যৌনজীবন তার অন্যান্য জীবনের ওপর কী রকম প্রভাব ফেলে এবং তার সমগ্র জীবনের গতিধারা নির্ধারণে কী রকম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা আমাদের দেখিয়েছেন। সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' পর্বে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুলভাবে ফ্রয়েড-প্রভাবিত।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ধারায় নানা স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার দাবিদার। অচ্যুত গোস্বামীর বিবেচনায় এ গ্রন্থটি 'মানিকবাবুর শিল্প হিসাবে সবচেয়ে সার্থক বই'।[৪৪] আবুল ফজলের মতে এটি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কীর্তি।'[৪৫]

---

৪৩. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, পূর্বোক্ত. পৃ. ১২২

৪৪. *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫৯

৪৫. পুতুলনাচের ইতিকথা, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫

তাঁর উপলব্ধি, 'বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস অনেকখানি এগিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু মনে হয় পুতুলনাচের ইতিকথা আজো রয়ে গেছে অনতিক্রম্য।'[৪৬]

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসেই মানিক প্রথম তাঁর ফ্রয়েডীয় তত্ত্বাশ্রিত জীবনকথাকে যথার্থ দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করেছেন। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ নির্মাণ করে দেখিয়েছেন, তাদের যাপিত জীবনব্যাখ্যায় ফ্রয়েড কতোটা প্রাসঙ্গিক ; 'পদ্মানদীর মাঝি'তে আঞ্চলিক জীবনচিত্র এঁকে দেখিয়েছেন, সেখানেও ফ্রয়েডীয় জীবনব্যাখ্যা কার্যকর ; তারপর যথার্থ দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' নির্মাণ করে ওই জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন, ফ্রয়েডীয় লিবিডোই অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে মানুষকে পুতুল নাচ নাচায়। 'দিবারাত্রির কাব্যে' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছেন, 'পদ্মানদীর মাঝি'তে ফ্রয়েড দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হলেও গৌণ ; পুতুলনাচের ইতিকথায় বহুধাবিভক্ত উপকাহিনীর ভীড়ে ফ্রয়েড কেন্দ্রীয় চরিত্রদুটির প্রধান নিয়ামক শক্তি। অচ্যুত গোস্বামীর মতে বাংলা উপন্যাসের ধারায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ই প্রথম গ্রন্থ যেখানে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের 'প্রথম সার্থক চিত্রায়ন' ঘটেছে। তাঁর ভাষায় :

> পুতুল নাচ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের প্রথম সার্থক চিত্রায়ন। সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যের ডি. এইচ. লরেন্সের ভূমিকা বাংলায় মানিকবাবু গ্রহণ করেছিলেন।[৪৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যে-সব গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শন সংস্থাপন করেছেন, সেগুলোর মধ্যে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ই সবচেয়ে বেশি বাস্তবসম্মত বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে যে দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতের যথার্থ রূপায়ণের জন্য, সেই বহির্বাস্তবতা কতখানি 'বাস্তব জীবনসম্মত' ও 'যথার্থ', তা সমালোচকের কাছে প্রশ্নাতীত নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপলব্ধি :

---

৪৬. আবুল ফজল, ঐ, পৃ. ১৭

৪৭. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০

ক. পুতুলনাচের ইতিকথায় বাস্তবতার প্রসার কিছু বেশি কিন্তু অসংলগ্নতা প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে ।[৪৮]

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে ।[৪৯]

আকিমুন রহমানের মতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মানুষের অন্তর্গত বিকার আবিষ্কার করেন সর্বত্রই' ।[৫০] তাই মানিক 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে "স্বাভাবিক পলীর পটভূমিতেই উপস্থাপিত করেছেন একরাশ অস্বাভাবিক চরিত্র" ।[৫১] আকিমুন রহমান আরও বলেছেন, 'বাস্তবপ্রতিবেশ পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু সারা উপন্যাসে বাস্তবতারূপে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিমানুষের অস্বাভাবিক জীবন ।'[৫২]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে 'অসংলগ্ন বাস্তবতা' লক্ষ করেছেন, এবং আকিমুন রহমান বাস্তব প্রতিবেশে উপস্থাপিত যে অস্বাভাবিক জীবনধারা খুঁজে পেয়েছেন, তার মূলে রয়েছে ফ্রয়েডীয় প্রভাব। গ্রামীণ জীবনকে শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ কিংবা তারাশঙ্কর যেভাবে দেখেছেন, মানিক সেভাবে দেখেন নি। মানিক গন্ডগ্রাম গাওদিয়ায় লিবিডোর টানাপোড়েন লক্ষ করেন বলে সে গ্রাম আর শরৎ-বিভূতি-তারাশঙ্করের সহজ-সরল গ্রাম থাকে নি।

জীবনের সমস্যা ও তার রূপায়ণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকার। তাই তাঁর কাছে "বাইরের ঘটনাগুলি রোগের লক্ষণ মাত্র ; রোগের অনুসন্ধানে তিনি মানব-মনের অনেক গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন এক অন্ধ ক্লিষ্ট জৈবিক শক্তির বিকৃত

---

৪৮. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪

৪৯. ঐ. পৃ. ৫১৩

৫০. *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

৫১. ঐ. পৃ. ২৮৭

৫২. ঐ. পৃ. ২৮৮

আত্মপ্রকাশের মধ্যেই রোগের উৎস বিদ্যমান।"[৫৩] ... "মানিকবাবু দেখালেন, সমস্যা অত সরল নয়। মানুষের ইচ্ছাকেও নিয়ন্ত্রিত করছে অন্ধকার গুহাবাসী এক বিরাট জৈবিকশক্তি। বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সূতোর সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।"[৫৪]

ইতঃপূর্বে লিখিত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্মিতিতে যতোখানি সচেতন ছিলেন, 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' তিনি ততোটা সচেতন ছিলেন, এমন বলা যাবে না। এর কারণ হিসেবে অচ্যুত গোস্বামী যে মত প্রকাশ করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

> ... লিখতে গিয়ে তিনি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ক্রমশ এই উপলব্ধিতে পৌঁছলেন, অর্থনীতিটা মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটা তার বহিরঙ্গের ব্যাপার, মানুষের অন্তর্জীবনের নিয়ামকশক্তি অর্থনৈতিক নয়, যৌন কামনা। সেই জন্য 'পদ্মানদীর মাঝি'তে অর্থনৈতিক জীবনের উপর যেটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' তা-ও নেই।[৫৫]

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী ডাক্তার ও কুসুম। এ চরিত্রদুটির অন্তর্জগৎ নির্মিতিতে, তাদের জীবনতৃষ্ণার রূপ রূপায়ণে, এবং তাদের স্বপ্নভঙ্গের দাহে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নানামাত্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক। এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, তিনি কেবল কয়েকটি ফ্রয়েডীয় চরিত্র নিয়েই উপন্যাস ফেঁদে বসেন নি, ফ্রয়েডনিরপেক্ষ বেশ কিছু চরিত্র এবং মূল কাহিনীর বলয়ের ভেতরেই বেশ কয়েকটি উপকাহিনী এখানে রূপায়িত হয়েছে। কুমুদ-মতি, জয়া-বনবিহারী, সেনদিদি-যামিনী কবিরাজ, যাদব-পাগলাদিদি, বিন্দু-নন্দলাল উপকাহিনী ছাড়াও রয়েছে গোপাল দাস ও পরান ঘোষের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু চরিত্র, যারা মূলত গাওদিয়া-বাজিতপুরের বহির্বাস্তবতা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

---

৫৩. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

৫৪. ঐ. পৃ. ৩৫৯

৫৫. ঐ. পৃ. ৩৬০

মতি ও কুমুদের পারস্পরিক ভালোবাসা, জয়া ও বনবিহারীর দাম্পত্যজটিলতা, শশী ডাক্তারের প্রতি মতির দুর্বলতা, মতির প্রতি শশী ডাক্তারের আগ্রহ, মতির প্রতি কুসুমের ঈর্ষাকাতরতা এবং গোপাল দাসের সঙ্গে সেনদিদির সমাজনিন্দিত সম্পর্কের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

গাওদিয়া গ্রামের কৃষক পরান ঘোষের বন্ধ্যা স্ত্রী কুসুমের বয়স তেইশ। গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন মহাজন গোপাল দাসের একমাত্র পুত্র শশী কলকাতার কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার। গ্রামেই সে প্র্যাকটিস করে। ডাক্তারির সুবাদে গ্রামের সব বাড়িতেই তার অবাধ যাতায়াত, এবং তার আচার-ব্যবহার মধুর বলে গ্রামে তার সুনামও আছে। ছোটবাবু নামে সবাই তাকে চেনে, জানে ও মানে।

কুসুমের আচার আচরণ অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ। দাম্পত্যজীবনে অসুখী নারীরা কিছুটা পাগলাটে ধাঁচের হয় এবং এদের অনেকই হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে বলে ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন।[৫৬]

কুসুম একান্তভাবেই ফ্রয়েডীয় নারী। পাড়ার লোকের 'বৌ তোমাদের যেন একটু পাগলাটে, না গো পরানের মা?' শেষাত্মক প্রশ্নের উত্তরে পরানের মা মোক্ষদা অকপটে বলে, 'একটু কেন মা, বেশ পাগল – পাগলের বংশ যে।' অথচ কুসুমের বংশের কেউ পাগল ছিলো, এমন কথা উপন্যাসে জানা যায় না। কুসুমের গায়ের জোর আছে, গলার জোরও কম নয়। তবে সে সাধারণত যেচে কারো সঙ্গে ঝগড়া বাধায় না, কেউ তার সঙ্গে লাগতে এলে সে ছেড়ে কথা কয় না। তার মধ্যে বেশ কিছু খাপছাড়া ব্যাপার লক্ষ করা গেলেও সাধারণত সে নিরীহই। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> বকাবকি করিলে সব সময় কানেও তোলে না, নিজের মনে ঘরের কাজ করিয়া যায়। কাজ করিতে ভালো না লাগিলে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া তালবনে তালপুকুরের ধারে ভূপতিত তালগাছটার গুঁড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে।[৫৭]

পরানের স্ত্রী কুসুম যে শশী ডাক্তারকে ভালোবাসে, তাকে একান্তভাবে পেতে চায়, অথবা শশীও যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কুসুমকে অবচেতন মনে ভালোবাসে – এ সংবাদ তাদের দুজনের

৫৬. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, অরূপরতন বসু (অনু.), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫, ১৪৯
৫৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

কারো কাছেই সুস্পষ্ট নয়, অজানাও নয়। কিছুটা হয়তো তারা আঁচ করে কিন্তু মুখ ফুটে স্পষ্টভাবে বলে না। শশীর সাথে একান্তে দুটো কথা বলার সুযোগ কুসুম ছাড়ে না – বরং সুযোগ না এলে তা তৈরি করে নিতেও সে পারদর্শী। জ্বরগ্রস্ত ননদ মতিকে দেখে বেরিয়ে আসা মাত্র শশীর পেছন পেছন সেও পিছু নেয়, এবং নির্জন বেগুন ক্ষেতের বেড়ার পাশ থেকে সে ডেকে বলে,

> ছোটবাবু, শুনুন!
>
> ... ...
>
> পরানের বৌ বলে যে ডাকলেন আজ? পরানের বৌ বললে আমার গোসা হয় ছোটবাবু।[৫৮]

449953

কুসুম শশীর কাছে কুসুম হিসেবেই পরিচিত হতে চায়, কারো স্ত্রীর পরিচয়ে নয় :

> সে গড়গড় করে মুখস্থ বুলির মতো একরাশ তোষামোদের কথা বলে যায় কুসুম, শশী শোনে, তার মন লাগে না। "কত বছর আজ সে কুসুমের এমন পাগলামি দেখিতেছে। এর এইসব খাপছাড়া কথার ব্যবহারে একটা যেন মিষ্টি ছন্দ আছে।[৫৯]

কুসুম কেন একান্তে ছুটে আসে, কেন এই তোষামুদে বাক্যালাপ করে, কেন তার এইসব 'পাগলামি', 'খাপছাড়া ব্যবহার' তা পুরোপুরি যেমন সে জানে না, তেমনি শশী ডাক্তারেরও অজানা কেন সে কুসুমের ব্যবহারের ভেতর 'মিষ্টি ছন্দ' খুঁজে পায়। লিবিডো এভাবেই মানুষকে তাড়িত করে। লিবিডোতাড়িত, পীড়িত মানুষের এ এক অপ্রতিরোধ্য পদচারণা, এ এক মধুর লজ্জা। এই দ্বিধা-লজ্জা-সংশয়, এই আধো জানা-আধো অজানা অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ যেন রূপ দিয়েছেন একটি গানে –

> তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই, কতই কী চাই

---

৫৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

৫৯. ঐ. পৃ. ১৯৩-১৯৪

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

দিনের শেষে ফিরে এসে লজ্জা যে পাই।[৬০]

একাদশীর দিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সারাদিন উপোস ছিল কুসুম, তারই ধারাবাহিকতায় তার শুরু হয় কথিত 'পেটব্যথা'। শীতের রাতে 'কলে' যাবার মতো পেশাদারিত্ব যদিও শশী অর্জন করতে পারে নি, তবু রোগী যেহেতু কুসুম, তাই তার অগত্যা যেতে হয়। রোগীর ভাবে-ভঙ্গিতে ডাক্তার বুঝতে পারে, রোগীর কী বৃত্তান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনাটি বেশ সরস :

> পেটের ব্যথাটা বড় রহস্যময় অসুখ।
>
> পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই, সত্য কি মিথ্যা বুঝিবার উপায় নাই, থার্মোমিটার স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে নাই। রোগী যা বলে তা-ই সই। ব্যথাটা ডান দিকে বলিলে ডান দিকে, ঝিলিক-দেওয়া ব্যথা বলিলে ঝিলিক-দেওয়া ব্যথা, চন্‌চনে একটানা ব্যথা বলিলে চন্‌চনে একটানা ব্যথা! সন্দেহ করিবার যো নাই।[৬১]

কুসুমের মুখে কথিত 'পেটব্যথার' বিবরণ শুনে শশী ডাক্তার বাড়ি গিয়ে অষুধ পাঠিয়ে দেয়। শশী অষুধ নিয়ে নিজে কেন এলো না – এই ক্ষোভে কুসুম 'আগুন হইয়া আছে'। 'মরি নি। এই আপনার টাকা।' বলে সত্য সত্যই আঁচলে বাঁধা দুটি টাকা শশীর সামনে রেখে দেয়। চারদিন পর কুসুম শশী ডাক্তারের বাড়ি আসে ক্ষমা চাইতে। 'চুপিচুপি চোরের মতো' শশীর সাধের গোলাপচারাটি দু পায়ে মাড়িয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে কুসুম ডাকে, 'ছোটবাবু শুনুন'। এ কথা সে কথার পরে সে শশী ডাক্তারের শোবার ঘর দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। ঘরে ঢোকার পর ওদিকের দাওয়ায় শশীর বাবা বসে আছেন জানার পর অবলীলায় সে বলে, 'তবে দরজা বন্ধ করে দিন। দেখতে পান যদি?'

---

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬১

৬১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

শশীর জন্যই কুসুম বাবার বাড়ি যেতে চায় না। আবার যখন শশীর প্রতি তার ক্ষোভ-অভিমান প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে বাবার বাড়ি যাবার জন্য পাগল হয়ে যায়। এক বর্ষায় কুসুমকে নিয়ে যাবার জন্য তার বাবা এসেছেন। অগত্যা কুসুমকে তাই ছলনার আশ্রয় নিতে হয় :

> সেইদিন তালপুকুরের ধারে কুসুম কেমন করিয়া পড়িয়া গেল সে-ই জানে। বলিল, 'কোমরে চোট লাগিয়াছে আর হাতটা গিয়াছে ভাঙিয়া। কি করে যাব তোমার সঙ্গে? আমি তো যেতে পারব না বাবা! পুজোর সময় এসে আমায় নিয়ে যেও।'
>
> কুসুমের বাবা অত্যন্ত আফসোস করিয়া বলিল, 'কতকাল যাওয়া হয় নি, তোর মা কাঁদাকাটা করেন কুসি। দুটো দিন বরং দেখে যাই, ব্যথাটা যদি কমে।'
>
> কুসুম বলিল, 'দুচার দিনে এ ব্যথা কি কমবে বাবা? কোমরের ব্যথায় নড়তে পারি না। হাড়-টাড় কিছু ভেঙেছে নাকি কে জানে!'
>
> হাতটা সত্য সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল। শশী আসিয়া পরীক্ষা করিবার সময় এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইচ্ছে করে পড় নি তো বৌ?'
>
> 'কি যে বলেন ছোটবাবু! ইচ্ছে করে পড়ে কেউ কোমর ভাঙে?'
>
> 'হাতে তবে তোমার কিছু হয় নি, শুধু কোমর ভেঙেছে, না?'
>
> 'হাতও ভেঙেছে' – কুসুম বলিল।
>
> শশী হাতটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল, 'কই, বেশি ফোলে নি তো?'
>
> কুসুম রাগিয়া বলিল, 'আবার কি ফুলবে ছোটবাবু, ফুলে কি ঢাক হবে?[৬২]

পরদিন বর্ষণমুখর দুপুরে কুসুম শশী ডাক্তারের বাড়িতে উপস্থিত হয় হাতের ব্যথার অষুধ নেবার নাম করে :

---

৬২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪

> শশী বলিল, 'হাতে এমন কি ব্যথা হল যে এ বৃষ্টি মাথায় করে ওষুধ নিতে এলে? এলেই বা কি করে? কোমর না তোমার ভেঙে গেছে?
>
> কুসুম অস্পষ্ট ভাবে বলিল, 'কষ্ট করে এলাম' । 'কেন তা এলে? বিকেলে আমিই তো যেতাম ।' 'সইতে পারি না ছোটবাবু ।৬৩

কুসুমের আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূল্য না দিয়ে শশী বরং যখন তাকে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে জ্ঞানদান করার জন্য বলে, 'আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝে-সুঝে কাজ করা দরকার ।' – তখন কথার মোড় ঘুরিয়ে কুসুম হঠাৎ বলে, 'হাতে ব্যথা বলে ওষুধ নিতে এলাম, এসব আমাকে কি শোনাচ্ছেন?' এবং তারপর সে দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে নেমে যায় ।

শশীর ওপর রাগ করে দু দিন পর সে বাবার বাড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু পিতৃগৃহে যাত্রাপথে আটঘাঁট বেঁধে তার সঙ্গে সফরসঙ্গী হওয়া শশীকে দেখে সে সব অভিমান ভুলে যায় :

> আড়চোখে একবার বাপের দিকে চাহিয়া কুসুম বলিল, 'আমার জন্য এলেন আজ, না?'
>
> শশী বলিল, 'হ্যাঁ ।'
>
> গভীর সুখে কুসুমের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । তবু নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের সঙ্গেই বলিল, 'ভেবেছিলাম বাপের বাড়ি গিয়ে ক'মাস থাকব, তা আর হবে না বুঝতে পারছি ।৬৪

শশী ডাক্তারও গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে না । কলকাতা থেকে লেখাপড়া করা শশীর আধুনিক, শহুরে জীবনের প্রতি সতৃষ্ণ থাকলেও তার গ্রাম ছাড়া হয় না । কারণটি স্পষ্ট করেই বলেছেন ঔপন্যাসিক :

---

৬৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
৬৪. ঐ. পৃ. ২৬৬

> এখানকার মশকদষ্ট মৃত্তিকালীন জীবন এই সান্ত্বনার জন্য শশীর সহ্য হইয়া আসিয়াছিল যে যখন খুশি গ্রাম ছাড়িয়া যেখানে খুশি গিয়া মনের মতো করিয়া জীবনটা সে আরম্ভ করিতে পারে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিপুলতা অবশ্য কমিয়া যায় নাই। শশীর স্বাধীনতাও হরণ করে নাই কেহ। তবু শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে মার্কা-মারা গ্রাম্য ডাক্তার হইয়া গিয়াছে – এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এ জন্য দায়ী কুসুম।[৬৫]

কুমুদ যখন মতিকে বিয়ে করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন শশী এবং কুসুমের প্রতিক্রিয়া পাঠক বেশ উপভোগ করে। যৌবনবতী, ছিপছিপে, সুন্দরী মতির প্রতি সহজাত আকর্ষণের কারণে সে বন্ধু কুমুদকে রীতিমতো ঈর্ষা শুরু করে। 'উপায় থাকিলে কুমুদকে সে তাড়াইয়া দিত।' প্রবল ঈর্ষায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন সে নিজেই মতিকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা কুসুমের কাছে প্রকাশ করে, তখন মেয়েলি ঈর্ষায় কুসুমের অন্ধ হবার পালা। তীব্র চাপা গলায় তখন কুসুম বলে, 'আপনি করবেন মতিকে বিয়ে! জীবনটা আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না ?'[৬৬]

দৃশ্যপটে প্রতিদ্বন্দ্বী আসার পরে, বিশেষ করে শশী মতিকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করার পর দুর্বোধ্য কুসুম তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে শুরু করে। জোছনা রাতে স্বামিগৃহের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে প্রথমবারের মতো স্পষ্ট করে বলে, 'এমনি চাঁদনী রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।'[৬৭] আরো বলে, 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু ?'[৬৮]

এই রোম্যান্টিক মুহূর্তের নিবিড় কামনা-বাসনা প্রকাশ করার পর কাঙ্ক্ষিত পুরুষটির কাছ থেকে কোনো অনুকূল সাড়া পায় নি কুসুম, বরং সে পায় চাপা ধিক্কার :

---

৬৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১
৬৬. ঐ. পৃ. ২৪৩
৬৭. ঐ. পৃ. ২৪৪
৬৮. ঐ. পৃ. ২৪৪

> শরীর! শরীর!
>
> তোমার মন নাই কুসুম?[৬৯]

কুসুমের আবেগ-উচ্ছ্বাস-স্বপ্নাচ্ছন্নতার রেশ যায় কেটে।

শশী চরিত্রটির একটি বিশেষ দিক এই যে, সে যখন তখন অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই তার আবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে ফেলে – স্থান-কাল-পাত্র ভেদ সে করে না। এটা তার সহজাত প্রকাশভঙ্গিও বলা যায়। সে যখন কথা বলে, তখন তার কথার অর্থ কতদূর বিস্তারিত হচ্ছে, সে তা ভেবে দেখে না। কুসুম যতোটা চাপা স্বভাবের, শশী ততোটাই মুখর। তার আবেগের ধারাবাহিকতা বা সঙ্গতি কোনটাই লক্ষ করা যায় না। কুসুম যখন গভীর আবেগে বলেছিল, "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" তার জবাবে রূঢ়তার সঙ্গে সে বলেছিল, 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' তারপর বাবার বাড়ি যাওয়া ঠেকানোর জন্য সে তালপুকুর পাড়ে ইচ্ছা করে আছাড় খেয়ে হাত মচকে ফেলে এবং সেই ব্যথার ওষুধ আনার ছল করে যখন কুসুম বৃষ্টিমুখর দুপুর বেলা তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন শশী তার আবেগের কোনো মূল্য না দিয়ে বরং তাকে সংযম শিক্ষা দেবার অপচেষ্টা করেছিল। অথচ তারপরে অসুস্থ পরানকে দেখতে গিয়ে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে শশী কুসুমের প্রতি আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে :

> তোমার হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় বৌ। লোকজনের ভিড়ে জ্বালাতন হই, তুমি ছাড়া এমন করে আমার কাছে আর কেউ হাসে না। আমার একটিও বন্ধু নেই বৌ।[৭০]

পরানের বাড়িতে গিয়ে চকিত কথায় আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কুসুমকে বিচলিত করে শশী কর্মব্যস্ততার দোহাই দিয়ে কেবল উঠি উঠি করে। কুসুম হয়তো তাকে আরো একটুখানি বসতে বলে। অনিচ্ছুক শশী বলে :

---

৬৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৭০. ঐ, পৃ. ২৯৮

সময়ে কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমি রইলে আমিও রইলাম–

সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক-আধ দিন নয়।[৭১]

— বলে কুসুম গাঢ় অভিমানে উঠে চলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শশীর অন্তর্চিত্ত উন্মোচন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবে :

> তালবনের উঁচু টিলাটার উপর দাঁড়াইয়া একদিন সূর্যাস্ত দেখিবার সময় শশীর অন্তর বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, অভূতপূর্ব ভাবাবেগে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল, আজ অপরাহ্ণ বেলায় গৃহচ্ছায়ায় একা দাঁড়াইয়া সে যেন তেমনি বিহ্বল হইয়া গেল অন্য এক ভাবাবেশে। এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম্য গৃহস্থের এই গোবর-লেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নাই, কেশে নাই সুগন্ধী তেল, তার জন্য বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই! ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ! জগতে সাগরতরঙ্গ আছে। [৭২]

পুতুলনাচের ইতিকথায় দেখা যায়, কুসুম যতোদিন শশীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, ততোদিন তার কোন গুরুত্ব শশী দেয় নি – গুরুত্ব তখনই সে দিতে শুরু করেছে, যখন থেকে তার প্রতি কুসুমের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। কুসুম যখন তার উষ্ণতা নিয়ে শশীর দিকে এগিয়ে গেছে, তখন শশীর শীতলতা তার সকল উষ্ণতাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে শশী যখন তার উষ্ণতা নিয়ে কুসুমের দিকে এগিয়ে গেছে, তখন কুসুমের ক্ষমাহীন কাঠিন্যের দেয়ালে বাধা পেয়ে তা পরিণামে ব্যর্থ হয়ে গেছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' মূলত কুসুম ও শশী ডাক্তারের সম্ভাবনাময় যৌন সম্পর্কের ব্যর্থতার ইতিকথা।

---

৭১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

৭২. ঐ, পৃ. ২৯৯

একদিন খুব ভোর বেলা শশী বাড়ির সামনের রাস্তায় নেমে দেখতে পায় কুসুমও তার বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কুসুম শশীকে দেখে কিন্তু এগিয়ে আসে না। উপন্যাসে এখান থেকেই শুরু হয়েছে একটি নতুন বাঁক। শশী নিজেই এগিয়ে যায়। এ কথা সে কথা বলার পর সে স্পষ্ট করেই বলে, 'আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল যেন কমে যাচ্ছে বৌ।'[৭৩] কুসুমও এখন আর কোনো ভণিতা করে না, সরাসরিই বলে, 'ওমা তাই নাকি? তা হবে হয়তো! একটা কমে একটা বাড়ে, এই তো নিয়ম জগতের। আকাশের মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে - নইলে কি জগৎ চলে ছোটবাবু ?'[৭৪]

অশান্ত মন সংযত করে, আবেগ অবদমিত করে কুসুম শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বাবার বাড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বুঝতে পারে, শশীর আশা আর করা চলে না। অথচ এই সংবাদে শশী এতোটাই বিচলিত হয়ে উঠলো যে, যে শশীর ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস কোনো দিনই ছিলো না, সেই শশীই সকাল বেলা কোনো বাছ বিচার না করে সোজা পরানের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কুসুমকে সে তালবনে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ তালবনে যে কুসুমকে সে দেখে, এ কুসুম তার চিরপরিচিত কুসুম নয় - ঘটনার প্রতিঘাতে বদলে যাওয়া এ এক নতুন কুসুম। শশী স্পষ্টতই ভড়কে যায়। সে বলে, 'তোমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না বৌ।'[৭৫] কুসুম জবাবে বলে, 'কি করে বুঝবেন ? মেয়েমানুষের কত কি হয়, সব বোঝা যায় না। হলেনই বা ডাক্তার ? এ তো জ্বর জ্বালা নয়।'[৭৬] শশীর 'মিথ্যে করে ভাঙা হাত দেখাতে বৃষ্টি মাথায় করে যেতে পার, এতবড় একটা খবর দেবার জন্য একবার যেতে পারলে না ?' কথার প্রত্যুত্তরে কুসুম ক্রোধের যে ভঙ্গিটি করেছিল, ঔপন্যাসিক তা বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে :

---

৭৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০
৭৪. ঐ, পৃ. ৩০০
৭৫. ঐ, পৃ. ৩০৫
৭৬. ঐ, পৃ. ৩০৫

> দুহাতে মুখের দুপাশের আলগা চুলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিয়া এমন তীব্র দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিল যে মনে হইল শশী যেন দুরন্ত অবাধ্য শিশু, এখুনি কুসুম তাকে একটা চড়চাপড় মারিয়া বসিবে। এমন তো ছিল না কুসুম! শশী কবে তাকে অপমান না করিয়াছে, কবে মান রাখিয়াছে তার অভিমানের, কবে এমন কথা বলিতে ছাড়িয়াছে যা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায় না? কোনোদিন রাগ সে করে নাই, ভর্ৎসনার চোখে চাহে নাই। আজ এই সামান্য অপমানে সে একেবারে ফুঁপিয়া উঠিল বাঘিনীর মতো![৭৭]

কুসুমের ভাষায় আজ কোন দুর্বোধ্যতা নেই, সে সরাসরিই বলে, 'দশ বছর খেলা করেও সাধ মেটে নি ? আমরা মুখ্য গেঁয়ো মেয়ে ওসব খেলার মর্ম তো বুঝি না, কষ্টে মরে যাই।'[৭৮] শশীর কাছে মনের আবেগকে এমন স্পষ্টভাবে কুসুম কোনো দিন প্রকাশ করে নি। বড়ো শক্ত মেয়ে সে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে আর আঁচলে চোখ মুছে সে আবেগকে সংহত করে। কিন্তু শশীর স্থৈর্য, স্বস্তি, সংযম তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> কুসুম আর কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলিলে যে শশী হঠাৎ ক্ষ্যাপার মতো বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিত তাতে সন্দেহ ছিল না, ... কুসুমের যে শরীরটা আজ অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল তার সমস্তটা শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না, হঠাৎ করিল কি, খপ করিয়া কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল।[৭৯]

কুসুম অবাক হয়। তার কথায় স্তব্ধ হয়ে যায় শশী। সে বলে ওঠে :

> কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে এনে হাত ধরা-টরা কি উচিত ছোটবাবু ? রেগে-টেগে উঠতে পারি তো আমি ? বড় বেয়াড়া রাগ আমার।[৮০]

---

৭৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

৭৮. ঐ, পৃ. ৩০৭

৭৯. ঐ, পৃ. ৩০৭

৮০. ঐ, পৃ. ৩০৭

কুসুমের রূঢ় উত্তর শুনে শশীর মুখ শুকিয়ে যায়। তবু সে হাত ছাড়ে না। শশীর মধ্যেও তখন জেগে উঠেছে অচেনা, নতুন একজন শশী। আকুল হয়ে সে কুসুমকে বলে :

আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ?'

'চলে যাব ? কোথায় ?'

'যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই, চল আজ রাত্রে।'

'কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল 'না'।

'শশী ব্যাকুলভাবে কহিল, 'কেন ? যাবে না কেন ?'

কুসুম শুধু বলিল, 'কেন যাব ?'

শশী বোকার মতো, শিশুর মতো বলিল, 'কেন যাবে ? কেন যাবে মানে কি কুসুম ?'

'আজ নাম ধরে কুসুম বললেন!'– বলিয়া ছোট বালিকার মতো মাথা দুলাইয়া জ্বলজ্বলে চোখে শশীর অভিভূত ভাব লক্ষ করিতে করিতে কুসুম বলিল, 'কি করে যে শুধোলেন কেন যাব! আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব ? কেউ তা যায় ?'

শশী অধীরভাবে বলিল, 'একদিন কিন্তু যেতে।'

কুসুম স্বীকার করিয়া বলিল, 'তা যেতাম ছোটবাবু! স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেই ছুটে যেতাম। চিরদিন কি একরকম যায় ? মানুষ কি লোহার গড়া, যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না ? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।[৮১]

প্রবল ঘোরের মধ্যে থাকলেও শশী ডাক্তারের চৈতন্য তখন স্বচ্ছ, পরিশ্রুত-পরিচ্ছন্ন তার আত্মোপলব্ধিও যথার্থ। যে কুসুমকে সে গত দশ বছর ধরে বুঝতে পারে নি, তার আদ্যোপান্ত

---

৮১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

হঠাৎ সে বুঝতে পারে। নিজেকেও সে মূল্যায়ন করতে পারে। অনুতপ্ত, অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত, কাতর শশী ডাক্তারের সরল স্বীকারোক্তি :

> অনেক বড় বড় কথা তো বললে, একটা ছোট কথা কেন তুমি বুঝতে পার না ? নিজের মন কি মানুষ সব সময় বুঝতে পারে বৌ ? অনেকদিন অবহেলা করে কষ্ট দিয়েছি বলে আজ রাগ করে তার শোধ নিতে চলেছ, এমন তো হতে পারে আমি না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তোমার' পরে কতটা মায়া পড়েছে জানতে পারি নি ? তুমি চলে যাবে শুনে এতদিনে আমার খেয়াল হয়েছে ? তাছাড়া তোমার কথাই ধরি, তুমি বললে মানুষ বদলায় – বেশ আমি অ্যাদ্দিন তোমার সঙ্গে খেলাই করেছি, আজ তো আমি বদলে যেতে পারি বৌ ?[৮২]

শশীর এই সরল, অকপট, করুণ নিবেদনও কুসুমের ক্ষমাহীন কাঠিন্যের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে। একদা কাঙ্ক্ষিত পুরুষের আবেদন-নিবেদন তাকে টলাতে পারে না। এক পর্যায়ে শশী কুসুমের এই বিরূপ হয়ে ওঠার কারণ জানতে চায়। কুসুম বলে :

> কুসুম ম্লান মুখে বলিল, 'আপনাকে কি বলব ছোটবাবু, আপনি এত বোঝেন। লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না ? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না – বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি – আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে ? কুসুম কি বেঁচে আছে ? সে মরে গেছে।[৮৩]

---

৮২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮
৮৩. ঐ, পৃ. ৩০৮

কুসুমের কথার তাৎপর্য শশী বুঝতে পারে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে কুসুম তার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলো, তারপর ধীরে ধীরে তার 'উন্মাদ ভালোবাসা' 'নির্জীব' হয়ে এসেছে। সে বুঝতে পারে, কুসুমের এ পরিণতিই স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> গাঁয়ের মেয়ে ঘরের বৌ কুসুম, মনোবাসনা কতদূর অদম্য হইয়া ওঠায় দিনের পর দিন নৈবেদ্যের মতো নিজেকে শশীর কাছে সে নিবেদন করিয়া চলিয়াছিল এখন শশী তা বুঝিতে পারে, কুসুমের অমন ভয়ানক উপবাসী ভালবাসা যে এতকাল সতেজে বাঁচিয়া ছিল তাই তো কল্পনাতীতরূপে বিস্ময়কর। আপনা হইতেই যে প্রেম জাগিয়াছিল, আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আবার তা লয় পাইয়াছে। শশীকে না দেখিয়া এখন কুসুমের দিন কাটিবে, শশীকে বাদ দিয়া কাটিবে জীবন।[৮৪]

কুসুম চলে যায়। নির্জীবের মতো সে তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার অপচেষ্টা করে। বজ্রাহত বটগাছের ব্যঞ্জনা ছায়াপাত করে শশী ডাক্তারের যাপিত জীবনে :

> মামলা করিতে শশী বাজিতপুরে যায়, ফিরিবার পথে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় খালের ধারে বজ্রাহত একটা বটগাছ শুকনো ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।[৮৫]

ফ্রয়েডীয় বিবেচনায় মানুষ সবাই কম-বেশি অসুস্থ। অবচেতন মনের অদম্য পাশব শক্তির তাড়নায় মানুষ প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মানুষ আপন অন্তরালে সবচেয়ে দুর্গম, তার মন জৈবিক কামনা বাসনার দুর্ভেদ্য অরণ্য। "মানব-মন যুক্তির বাধ্য নয়, অন্তরবাসী যৌন-দেবতার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে চালিত হয়।"[৮৬] একদিকে নিয়তির অমোঘ আকর্ষণে, অন্যদিকে অবচেতন মনের লিবিডোর টানাপোড়েনে শশী ডাক্তার নিজেই যেন অসুস্থ হয়ে পড়ে। 'নিয়তি-

---

৮৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯

৮৫. ঐ, পৃ. ৩২৪

৮৬. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

নিয়ন্ত্রিত পুতুল'[৮৭] শশী মানুষের রোগ খুঁজে বেড়ায় "অথচ সে নিজেই যে কখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে তা সে জানতে পারছে না।"[৮৮] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :

> পুতুলনাচের ইতিকথার শশীর সমস্যা নিশ্চয় যৌন সমস্যা নয়। সম্পূর্ণই শশীর মনের সমস্যা, শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এ উপন্যাসের বিষয় – গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনা এক হয়ে যাওয়ার সমস্যা।[৮৯]

বলাবাহুল্য, শশীর সমস্যা তার জৈবিক তৃষ্ণা এবং অবচেতন মনের অবদমন থেকে সৃষ্ট।

মতি ও কুমুদের মুগ্ধ ভালোবাসার মূলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের জৈবিক আকর্ষণই মুখ্য। ভবঘুরে কুমুদ গ্রাম্য কিশোরী মতির রূপে ও গুণে মুগ্ধ। উভয়ের মনেই প্রবল ঘোর। তাদের এই প্রেমের ব্যাপারটি কুসুম ও শশীর ওপরও প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। কুমুদের মতো চালচুলোহীন এক ছোকরার প্রেমে মজে আছে মতি – ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না শশী। কারণ মতির প্রতি শশীর এবং শশীর প্রতি মতির এক ধরনের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা ছিল। মতির বিয়ের সম্ভাবনায় শশী তাই ঈর্ষাবোধ না করে পারে না। লেখকের বর্ণনা :

> এ চিন্তায় শশী লজ্জা পায়। মতির জন্য তার মনে বাৎসল্য-মেশানো এক প্রকার আশ্চর্য মমতা আছে, মতিকে কুমুদের বৌ হওয়ার অনুপযুক্ত মনে করিতে তাহার কষ্ট হয়। সেদিন বিকালে মতির সঙ্গে শশীর দেখা হইল। মতি একডালা কুমড়া ফুল লইয়া তাহাদেরই বাড়ি আসিয়াছিল। শশীকে সে কথাটা জানানো হইয়াছে, কুমুদ হয়তো মতিকে এ সংবাদ দিয়াছিল। শশীকে দেখিয়া মুখখানা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর একটু হাসিল মতি – হঠাৎ লজ্জা পাইলে এ বয়সে ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক দিয়া যায়। মতির মুখখানা আজ শশীর অসাধারণ সুন্দর মনে হইল। সে ভাবিল,

---

৮৭. অশ্রুকুমার শিকদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৮৮. অচ্যুত গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

৮৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পকর্ম, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

হয়তো কুমুদ ভুল করে নাই। হয়তো সত্যই একদিন সে মতিকে রূপে-গুণে অতুলনীয়া করিয়া তুলিবে।

মতি চলিয়া গেলে কুমুদের এই শক্তিতে কিন্তু শশীর আর বিশ্বাস রহিল না। খনি গর্ভের হীরার মতোই বটে মতি – তাকে একদিন অনুপমা ও জ্যোতির্ময়ী করিয়া তোলাও সম্ভব, কিন্তু কুমুদ তাহা পারিবে না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার প্রতিভা আছে কুমুদের – স্বপ্নকে সফল করিবার তপস্যা নাই। মতির মুখের পেলব ত্বকে দুদিনে সে দুঃখের রেখা আনিয়া দিবে।

মনটা শশীর খারাপ হইয়া থাকে। কুমুদের প্রতি সে বিতৃষ্ণা বোধ করে সীমাহীন। এ কি বন্ধুর কাজ, বন্ধুর বাড়ি আসিয়া তাহার স্নেহের পাত্রীর সঙ্গে গোপনে ভালবাসার খেলা করা? উপায় থাকিলে কুমুদকে সে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কুমুদের কথা শুনিয়া আর তো মনে হয় না মতির কোনো দিকে আশা-ভরসা আছে। কুমুদের সম্বন্ধে মতির উৎসুক প্রশ্ন, কুমুদকে দেখিবার আশায় মতির কলিকাতা যাওয়ার আগ্রহ, সব এখন শশীর মনে পড়িতে থাকে। প্রেম? কুমুদের জন্য এতখানি প্রেম জাগিয়াছে মতির বুকে? তাছাড়া, হয়তো মতির বুকভরা প্রেমই শুধু নয় – কুমুদকে বিশ্বাস নাই, জীবনটা কুমুদের আগাগোড়া অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ।

কি করিবে শশী ভাবিয়া পায় না।[৯০]

শশী ডাক্তারের এই মানসিক অবস্থাটি, বলাবাহুল্য, কুসুমের জন্য প্রীতিদায়ক নয়। শশীকে জীবনে একান্তভাবে পেতে চায় যে কুসুম, সে মতির প্রতি শশীর এই আগ্রহ এবং কুমুদের প্রতি এই ঈর্ষায় স্বস্তি বোধ করতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে কুসুম তাই চায় কুমুদ-মতির বিয়ে হয়ে যাক। কুসুম ও শশী যখন কুমুদ ও মতির এই সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে একান্তে পরামর্শ করে, তখন তাদের বিয়ে ছাড়া অন্য কোন সমাধান কুসুম ভাবতেই পারে না। একান্ত প্রিয়জনের হৃদয়ে

৯০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৩

অন্য নারীর প্রতি ভালোবাসার সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুসুম তখন মরিয়া হয়ে ওঠে। কুসুমের এই ব্যাকুলতা শশী ডাক্তারের ভালো লাগে না। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> সন্ধ্যার পর কুসুমের সঙ্গে শশী এ বিষয়ে পরামর্শ করার সুযোগ পাইল। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল। ঘরের চালা যে জ্যোৎস্নার ছায়া ফেলিয়াছিল সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিবার পর শশী বলিল, 'একটা উপায় আছে বৌ।'
>
> 'কি উপায়?' – কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।
>
> আমি মতিকে বিয়ে করতে পারি।'
>
> 'এই উপায়!' – কুসুম হাসিয়া ফেলিল।
>
> শশী কিন্তু হাসিল না, বলিল, 'হাসির কথা নয় বৌ। কুমুদের হাতে ওকে সঁপে দিতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে।'
>
> কুসুম গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সে আপনি ওকে বোন্‌টির মতো ভালবাসেন বলে। মেয়ে, বোন – এদের বিয়ে দেবার সময় মানুষের এ রকম ভাবনা হয়।'
>
> শশী তবু বলিল, 'আমি যদি মতিকে বিয়ে করি – '
>
> 'যদি করেন! যদি!' তীব্র চাপা গলায় এই কথা বলিয়া কুসুম পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিল, 'সংসারে অত যদি চলে না ছোটবাবু। আপনি করবেন মতিকে বিয়ে! জীবনটা আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না?'
>
> তখন শশী বলিল, 'কুমুদ অবশ্য একেবারে অমানুষ নয়, রোজগার-পাতিও মন্দ করে না – '
>
> কুসুম বলিল, 'মতির ভাগ্যি ওকে কুমুদবাবুর পছন্দ হয়েছে। পড়ত গিয়ে কোনো চাষার ঘরে, দুবেলা চেলাকাঠের মার খেয়ে প্রাণটা ছুঁড়ির বেরিয়ে যেত। অনেক পুণ্যিতে এমন বর জুটেছে ওর।'
>
> 'হোক তবে, তাই হোক। মতি কি বলে বৌ?'
>
> 'কি বলবে? দিন গুনছে।'

দিন গুনিতেছে মতি! গুনুক!

কুসুমের উপর রাগে শশীর মন জ্বালা করিতে থাকে। সেদিন প্রত্যুষে তালবনে কুসুমের মধ্যে যে সরলা বালিকাকে আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইয়াছিল, আজ সে কোথায় গেল?[৯১]

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় শশী ডাক্তার ও কুসুমের প্রেম মুখ্য হলেও শশীর প্রতি মতির আগ্রহ, মতির প্রতি শশীর দুর্বলতা এবং এ নিয়ে মতি ও কুসুমের ঈর্ষাবোধ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। যেমন শশীর প্রতি মতির আগ্রহ :

ক. তালবনের তালপুকুরে পদ্ম তুলিতে গিয়া মতি আশা করিতে লাগিল, ছোটবাবু আজ নিশ্চয় আসবে, ছোটবাবুকে একডালা পদ্ম দেব।[৯২]

খ. মতির ভারি ইচ্ছা, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মতো বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নোংরামি নাই, বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, হাসে, তাস-পাশা খেলে, কলের গান বাজায়, আর – আর বাড়ির বৌকে খালি আদর করে। চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া বলে, লক্ষ্মী বৌ, সোনা বৌ, এমন না হলে বৌ?[৯৩]

মতির প্রতি শশীর আগ্রহ, লেখকের বর্ণনা থেকে :

শিশিরে এক পশলা বৃষ্টির মতো চারিদিক ভিজিয়া আছে। মতির বিবর্ণপাড় শাড়ি আধভেজা কাপড়ের মতো কোমল দেখাইতেছিল। শশীর মনে হয় শাড়ির নমনীয় স্পর্শে মতি ভারি আরাম পাইতেছে। সকালবেলা রাত-জাগা চোখে মতিকে যেন তার বয়সের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল। ওকে দেখিতে দেখিতে সকালবেলা বিড়ি টানার আলস্য আরো মিষ্টি লাগিল শশীর।[৯৪]

---

৯১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩

৯২. ঐ, পৃ. ২০২

৯৩. ঐ, পৃ. ২০৫

৯৪. ঐ, পৃ. ২০৪

মতির প্রতি শশীর আগ্রহ কুসুমের মনে জাগায় তীব্র ঈর্ষা। ঈর্ষা থেকে সৃষ্টি হয় ঝগড়া :

> কুসুমের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই ঝগড়া বাধে মতির। সকলের অগোচরে মতিকে কুসুম শশীর কথা তুলিয়া অন্যায় পরিহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
>
> বলে, 'শরীর খারাপ লাগছে মতি? তাই চুপ করে বসে রয়েছিস? আহা ষাট। ছোটবাবুকে ডাকব? পরীক্ষে করে ওষুধ দেবে?'
>
> মতি বলে, 'কেন লাগতে এলি বৌ? তোর আমি কি করেছি!'
>
> কুসুমবলে, 'চোখ ছল ছল করছে। দেখলে ছোটবাবুর বুক ফেটে যাবে।'
>
> মতি বলে, 'যমের অরুচি। মর্ তুই, মর্।'
>
> কুসুম তবু বলে, 'জানিস লো মতি – রাতে তোর কথা ভেবে ছোটবাবুর ঘুম হয় না। বসে বসে মালা জপ করে, মতি, মতি, মতি। সুদেবের সঙ্গে তোর নিকে হয়ে গেলে ছোটবাবু তালপুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবে।'
>
> 'তুই তালপুকুরে ডুবে মর্। মরে শাকচুন্নি হয়ে থাক।'
>
> মতি স্থান ত্যাগ করিতে যায়, কুসুমের সঙ্গে সে কথায় পারিবে কেন? কুসুম তাহাকে রেহাই দেয় না। খপ করিয়া মতির হাতটা সে ধরিয়া ফেলে। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অপলক চোখের তারা স্থির রাখিয়া কথাগুলিকে দাঁতে কাটিয়া কাটিয়া বলে, "লজ্জা নেই তোর? এত বড় ধেড়ে মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর? পেটে ভাত জোটে না, গয়লার মুখ্যু মেয়ে তুই – ছোটবাবুর তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কি! অত তোর পাকামি কিসের।[৯৫]

---

৯৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে গিয়াস শামীম ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন : এ তত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত মতি-শশী-কুসুমের জীবনযাপনের বিকার, অসঙ্গতি, সংকট ও সংঘাতের কার্যকারণ থেকে যাবে অস্পষ্ট ও অনির্ণীত।[৯৬]

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী পুতুলনাচের ইতিকথার উপমা ও চিত্রকল্প বিশ্লেষণসূত্রে দেখিয়েছেন যে, এ উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনার মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

> 'জাদুঘর মিউজিয়াম' উপমানচিত্রের মাধ্যমে শশীর শোবার ঘরটিকে কুসুমের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষণীয়, অতৃপ্তকাম, অচরিতার্থ কুসুমের কাছে শশীর শোবার ঘরের মতো শশীর হৃদয়টিও (বাসরশয্যা?) কি এক প্রাচীন, জড়, স্মৃতিজাগানো, গচ্ছিত, দর্শনশোভন 'জাদুঘর মিউজিয়ামের মতো' নয়?
>
> লোকায়ত ও প্রাকৃত উপমাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে, কখনো চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিল স্বভাবের চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনায়:
>
> ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
> লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।
>
> বস্তুত কুসুমের জীবনাকাঙ্ক্ষায় শশীর আবির্ভাব এবং অপ্রাপ্তি যেন চন্দ্রবৎ দূরবর্তী ও অস্পষ্ট। আর 'ভিনদেশী পুরুষ' মূলত কুসুমের শশীমুখী পরকীয়া প্রেমেরই অবলম্বন, প্রথম যৌবনের মতো যার উচ্ছ্বাস, চাঁদের (শশী?) আকর্ষণে জোয়ার এসেছে।[৯৭]

---

৯৬. গিয়াস শামীম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৯৭. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, মানিকের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

সৌমিত্র শেখর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করেছেন। তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শশী-কুসুমের সম্পর্কে সংকট উপস্থিত। সংকট হবেই। কেননা, শহরে থাকা অবস্থায় শশী যে পুষ্টদানা খাওয়া মেয়েদের দেখেছে, তাদের কথা শুনেছে, হাবভাব পর্যবেক্ষণ করেছে, কুসুমের শরীর অনেকটা সেই নবশিক্ষিতাদের মতো হলেও আর কিছু তার সঙ্গে মেলে না। শশীর কল্পিত নারীমূর্তি আর কুসুম এক নয়। তাই সে প্রতি মুহূর্তে কুসুমের কাছ থেকে দূরে থেকেছে। 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' – কুসুমের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে শশী খুঁজেছে কুসুমের মন : 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' অথচ, শশী বুঝতে পারেনি, এটাই কুসুমের প্রণয় নিবেদনের লোকায়ত ভাষা। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রণয় মানেই শরীর কেমন কেমন করা। দেহ বিকোতে আসেনি কুসুম। শশী বরং লোকায়ত অনুরাগ প্রকাশের এই ভাষা বুঝতে পারে না। কুসুমের গোলাপের চারা মাড়ানোর অর্থ শশী বুঝতে পারেনি; বৃষ্টিতে ভিজে শশীর কাছে যাওয়ার পরও শশী কুসুমকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেহের প্রতি দৃষ্টি কি শশীর পড়েনি? নবীন যুবক। না-পড়াটাই বরং অস্বাভাবিক। বৃষ্টিভেজা কুসুমের শরীরের প্রতি শশীর যে চোখ পড়েনি তেমন তো নয়। মতির দেহও শশীর দৃষ্টির বাইরে যায়নি : 'শশীর মনে হয়, শাড়ীর নমনীয় স্পর্শে মতি ভারি আরাম পাইতেছে।' পাশাপাশি সুন্দরী সেনদিদির চিকিৎসার সময় শশী যে উৎসাহ পেয়েছে পরবর্তীকালে হতশ্রী সেনদিদির প্রতি সে-উৎসাহ না পেয়ে শশী নিজেই লজ্জিত হয়েছে। এ সবই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা; তার চিত্তসংকট, তার অস্তিত্বসংকট। মানিক-অধীত যৌনবিজ্ঞান, বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় দর্শনের প্রভাব এখানে প্রবল। শুধু তাই নয়, সেনদিদিকে যুবক ডাক্তার শশীকে দিয়ে চিকিৎসা করানোতে তার বৃদ্ধ স্বামী যামিনী কবিরাজের অনাগ্রহ, গোপালের নিষেধ

এবং সেনদিদির গর্ভজাত সন্তানকে গোপালের প্রতিপালনও (কোন দায়িত্ববোধ থেকে?) ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বে বিশেষিত হতে পারে।[৯৮]

এ ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে : কুসুম-শশী-মতি-কুমুদই শুধু নয়, গোপাল-সেনদিদি, জয়া-বনবিহারী চরিত্রগুলোর আন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েন ও দোলাচলবৃত্তির মূলে সক্রিয় তাদের অবদমিত যৌন কামনা-বাসনার স্তরবহুল তাড়না ও পীড়ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে জীবনের রূপায়ণ করেছেন, এবং যে অখণ্ড জীবনসত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত।

৯৮. সৌমিত্র শেখর, উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফ্রয়েডের প্রভাব : শেষ পর্ব

মানিক উপন্যাসের ধারায় 'অহিংসা' (১৯৪১) একটি অভিনব সংযোজন। এ উপন্যাসটির আন্তর-প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে কম-বেশি সব সমালোচকই অস্বস্তি বোধ করেছেন। এবং এ কারণেই তাঁরা কোনো দ্ব্যর্থহীন, সরল মন্তব্য প্রদান থেকে সতর্কভাবে বিরত থেকেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে লক্ষ করেছেন ঔপন্যাসিকের 'উদ্ভট কল্পনা-প্রবণতা' যা দ্বারা তিনি 'এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা' করেছেন।[১] এ উপন্যাসে অচ্যুত গোস্বামীও লক্ষ করেছেন 'অতি বিশ্লেষণ প্রবণতা'।[২] এর সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্যও করেছেন কেউ কেউ।[৩] তাঁর মতে : অহিংসার মতো 'অব্যাখ্যেয় কাহিনী' মানিকের আর একটিও নেই। তবে এ উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে তিনি যে ফ্রয়েডীয় ভাবাদর্শ দ্বারা পরিচালিত, এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেন নি। মাধবীলতা, সদানন্দ, বিপিন, বিভূতি তো বটেই, সন্ন্যাসিনী রত্নাবলী এবং জমিদারপুত্র নারায়ণও যথার্থ অর্থে ফ্রয়েডীয় চরিত্র।

অহিংসার বহুধাবিভক্ত কাহিনীকেন্দ্রে রয়েছে একটি সাধুর আশ্রম। সদানন্দ এই আশ্রমের সাধু। শুধু দেহের আকৃতিতেই নয়, মানসিক প্রকৃতিতেও সে স্থূল। কি বিষয় বুদ্ধি, কি কাণ্ডজ্ঞান, কি রুচিবোধ – সর্বত্রই তার সূক্ষ্মতার অভাব স্পষ্ট। সাধু হিসেবে সদানন্দকে চিড়িয়া সাজিয়ে রমা রমা ব্যবসা যে ফেঁদে বসেছে, বিপিন, সদানন্দের সমবয়সী ও বন্ধু বলে পরিচিত হলেও সে মূলত ঘড়েল, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র মাধবীলতা কী এবং কেমন, সে

---

১. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫১৯

২. *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৩৫৪

৩. হায়াৎ মামুদ, (সম্পাদকীয় ভূমিকায়), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, ঢাকা, ১৯৯৫

কথা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সদানন্দের উপলব্ধিতে "বড় পাকা মেয়ে মাধবীলতা, বড় ঝানু, প্রায় বাজারের বেশ্যার মতো।"[৪] ব্রাকেটবদ্ধ 'লেখকের মন্তব্যে' ঔপন্যাসিক মাধবীলতাকে পুরোপুরি না হলেও শরৎচন্দ্রীয় নারী মহিমার অনেকখানিই দান করেছেন, যা তার চরিত্রের সঙ্গে পূর্বাপর সঙ্গতিসম্পন্ন মনে হয় না।[৫] তার দেহসান্নিধ্য ভোগ করেছে অথবা করতে চেয়েছে এমন পুরুষের সংখ্যা এ উপন্যাসে চারটি – মহীগড়ের রাজপুত্র নারায়ণ, সদানন্দ, বিপিন এবং বিভূতি। তার পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে লেখক শুধু বিপিনের জবানিতে জানিয়েছেন যে : সে মামার বাড়িতে আশ্রিতা ছিলো। ভ্রষ্ট-দুশ্চরিত্র নারায়ণ তাকে ফুসলে বার করে এনেছে, আমোদ করার জন্য তাৎক্ষণিক কোনো প্রমোদ কেন্দ্র না জোটাতে পেরে সে আশ্রমকে বেছে নিয়েছে। ধনীর বখে যাওয়া লম্পট ছেলের সাথে পালিয়ে এসে এই 'অল্পবয়সী মেয়ে'টি পাড় মাতাল হয়ে আশ্রমের ভেতর প্রথম দর্শনেই 'তুমি সাধুজী, না?' বলে 'খপ করিয়া' খোদ সাধুজির হাত ধরে ফেলে, জবাব না পেয়ে আহ্লাদে গলে গিয়ে সাধুজির 'গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া' পরিহাসপ্রবণ শ্যালিকাসুলভ ভঙ্গিতে

---

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৩৪

৫. [লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভালো। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভালো নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিল, মাধবীলতা কুমারী

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভালো কি মন্দ, এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড়জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারানো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা অজানা জায়গায় আনাচে-কানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে কোনো যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না, এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।] ঐ, পৃ. ৪০৭

কথা বলতে থাকে। রাতের বেলা সাধুর পিঠের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে সে শুয়ে থাকে। সাধুটি যখন 'দু হাত বাড়াইয়া পুতুলের মতো মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে' তখনো তার কোনো ভাবান্তর নেই – 'সে কিছুই বলিল না'। এতোটা লীলার পরেও ঔপন্যাসিক যখন স্বয়ং নায়িকার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন : সে 'কুমারী', 'পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না' তখন তা খাপছাড়া ঠেকে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত মন্তব্যটি সঙ্গতকারণেই এখানে মনে পড়ে :

> এই দুর্বোধ্য আখ্যানে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টি গোচর হয় না। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণচেষ্টা ও গ্রন্থকারের নিজের জবানীতে উক্তি গ্রন্থের ঘোরালো আবহাওয়াকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠিক বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছায় নাই – ইহারা যেন অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে পরস্পরের সহিত ঠেলাঠেলি – সংঘর্ষ বাধাইয়া ও ক্ষণস্থায়ী, মূলহীন সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে।[৬]

মাধবী চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রয়েড – চর্চার ফলশ্রুতি।[৭] সে বিকারগ্রস্ত নারী। তার মনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ সে সুস্থ-স্বাভাবিক কোনো চরিত্র নয়। ফ্রয়েড জানিয়েছেন যে : মানুষের যে কোনো খাপছাড়া ব্যবহার মূলত তার যৌন প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। মানুষের যৌনসত্তা অত্যন্ত প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য। পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা তাকে নিরন্তর তাড়িয়ে ফেরে। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূলে রয়েছে তার যৌন তাড়না, যার তাড়া আসে তার অবচেতন মন থেকে। মাধবীলতার মনের সংবাদ না পাওয়া গেলেও তার শরীরী তাড়নার খবর কারো অজানা থাকে না। লীলাসঙ্গিনী হয়ে নারায়ণের সঙ্গে তার বেরিয়ে আসা, আশ্রমে পৌঢ় সাধু সদানন্দ যখন তাকে বুকে তুলে নেয়, তখন যেমন সে চুপ করে থাকে, তেমনি চুপ করে থাকে পৌঢ় বিপিন রাতের আলো আঁধারিতে তাকে বুকে চেপে ধরে আদর সোহাগের কথা বললেও। মহেশ বাবু যখন তার একমাত্র পুত্র বিভূতির সঙ্গে তার বিয়ে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন সে

৬. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯

৭. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৬

বিয়ে করে সংসারী হয়, কিন্তু সন্ন্যাসী সদানন্দের প্রতি তার অন্তরতলে বহমান থেকে যায় ঘৃণা ও আসক্তির যুগপৎ বিপরীত দুটি ধারা। স্বামী বিভূতি দাঙ্গায় মারা গেলে সে সদানন্দের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

আশ্রমে নারীসঙ্গবঞ্চিত পৌঢ় সদানন্দের জীবনে মাধবীলতা নিয়ে আসে নতুন এক আস্বাদ। বিপিনের ব্যবস্থাপনায় আশ্রমে মাঝে মাঝে রমণীদের আবির্ভাব ঘটতো বটে, তবে তাদের প্রতি সদানন্দের যতোটা না আগ্রহ, তারচেয়ে বিরক্তিই ছিলো বেশি। মাধবী প্রথম রাতেই তার পিঠের সঙ্গে মিশে শুয়েছিল, এই অকপট দাক্ষিণ্য সে ভুলতে পারে নি। পরদিন রাতে শয়নকক্ষে একাকী মাধবীকে পেয়ে তার ইচ্ছা হয়, 'অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় আর কিছুক্ষণের জন্য তার আঙুলখানি যেন হইয়া যায় পাখির পালকের চেয়ে কোমল।'[৮] সদানন্দের সঙ্গে মাধবীর এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় বিপিন ভেতরে ভেতরে ঈর্ষাবিদ্ধ হয়। তাই সে মাধবীকে তার মামার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চায়। তখন সদানন্দ মাথা নেড়ে 'জোরের সঙ্গে' বলে, 'না এইখানে থাকবে মাধবী কোথাও যাবে না'[৯] আশ্রমে মাঝে মাঝে মাধবী আসে। 'উপদেশ' শুনে যায়। পা টিপে দিতে চায়। সদানন্দ লক্ষ করে : 'মাধবীলতার মুখখানা টসটস করিতেছে জীবনীশক্তির রসে'[১০] প্রত্যাশা করে : 'অন্য কোথা যাইতে চায় মাধবী! না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততোদিন।'[১১] মাঝে মাঝে দিন দুপুরেই মাধবীকে তার ঘরে ডেকে পাঠায়। মাধবী ঘরে ঢোকামাত্র 'তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল ; এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দও তা জানে।'[১২]

---

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯

৯. ঐ, পৃ. ৪১৩

১০. ঐ, পৃ. ৪১৭

১১. ঐ, পৃ. ৪১৭

১২. ঐ, পৃ. ৪২০

সাধু সদানন্দের মধ্যে এ পর্যায়ে Ego এবং Super Ego-র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মাধবীর আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা সে করে। কিন্তু তার সে অবদমন ফলপ্রসূ হয় না। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে : মানুষের অবদমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজে আসে না। কারণ নিজের ওপর মানুষের সার্বিক অর্থে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অদ্‌স্ (id) থেকে উদ্ভূত লিবিডোর উর্ধ্বচাপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রতিরোধ্য। সদানন্দ তাই নিজের সঙ্গে লড়াই করে পরাস্ত হয়, ব্যর্থ হয় তার অবদমন :

> অনেক ভাবিয়া, অনেক দ্বিধা করিয়া, মনকে শান্ত করিবার জন্য সাতদিন ঘরের কোণে নিজেকে বন্দি করিয়া রাখিয়া মনকে আরো বেশি অশান্ত করিয়া, অতিরিক্ত জ্বালাবোধের জন্যই মাধবীলতা সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য আত্মসংযমের মধ্যে নিজেকে সত্য সত্যই মহাপুরুষ করিয়া ফেলিবার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সকালে হঠাৎ মাধবীলতাকে আজই রাত্রে ঘরে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। কে জানিত মাধবীলতাকে এমনভাবে সে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে? এ পর্যায়ে সদানন্দ বিপিনের ঈর্ষাপ্রসূত দ্বন্দ্ব এবং তার সূত্র ধরে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। একটি কৈশোর উত্তীর্ণ নারীকে নিয়ে দুই জন পৌঢ় পুরুষের দ্বন্দ্ব - সংঘাতের উৎস তাদের যৌন কামনা।[১৩]

বিপিন মাধবীকে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে রেখে আসতে চায়। রত্নাবলীকে কৌশলে সে ম্যানেজ করে। সদানন্দ ডেকে পাঠিয়েছে – এই অজুহাতে বিপিন মাধবীকে নিয়ে বের হয়ে আসে। আশ্রমের জোৎস্নালোকিত পথে বিপিনের মনোবিশ্লেষণ, এবং মাধবীর কাছে প্রণয় নিবেদন রূপায়ণ করেছেন ঔপন্যাসিক এ-ভাবে :

> জ্যোৎস্নালোকে কুটির ও আবেষ্টনীর মধ্যে ফাঁকা মাঠে মাধবীলতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বিপিনের মনে হয়, আঙুলগুলি যদি তার পাখির পালকের মতো কোমল হইয়া না যায়, আর সে যদি মেয়েটার সর্বাঙ্গে সস্নেহে আঙুল বুলাইয়া না

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

দেয়, পৃথিবীটাই রসাতলে চলিয়া যাইবে! অকারণে নিজেকে এই মেয়েটার জন্য মহাশূন্যে বিলীন করিয়া দিবার কোনো একটা কারণ কি আবিষ্কার করা যায় না? অসহ্য কোনো যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না এই মেয়েটার জন্য? অসম্ভব কোনো কার্য সম্ভব করা চলে না? ভাবিতে ভাবিতে মাধবীলতার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপিন মৃদুস্বরে বলে, 'মাধু, কে তোমার ওপর অত্যচার করছে বল, কাল তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব। এ আশ্রম আমার, দলিলপত্রে আমার নাম আছে, আমার কথার ওপর কারো কথা কইবার অধিকার নেই। কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, একবার তার নামটি শুধু তুমি বল।'

কি উগ্র উদারতা বিপিনের! এদিকে চাপিয়া ধরিয়াছে মাধবীর মাথাটা নিজের বুকে, মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কে অত্যাচার করিয়াছে তার উপর, কে কষ্ট দিয়াছে তার মনে? একটু কাঁদে মাধবীলতা, একটু ফোঁসফোঁস করে। বিপিন ব্যাকুল হইয়া বলে, 'কেন কাঁদছ মাধু? কেঁদ না। বল না তুমি কি চাও? অন্য কোথাও চলে যাবে?'

'কোথায় যাব? কার কাছে যাব?'

'যেখানে যেতে চাও, পাঠিয়ে দেব। নিজে আমি তোমার নামে বাড়ি কিনে দেব, ব্যাংকে তোমার নামে টাকা জমা রেখে দেব।[১৪]

'অহিংসা'র কাহিনী পরম্পরার এই পর্যায়ে বিভূতির আগমন। বিভূতি বাগবাদা গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ মহেশ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। শহরে থেকে থেকে ইংরেজি শেখার সূত্রে সে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল যুবক – সাধুত্ব তার কাছে ভুয়া ব্যাপার বলে বদ্ধমূল বিশ্বাস। তার মেজাজটা বেশ চড়া। এই সুবাদে জেলও খেটেছে সে। পিতার ঘরে আশ্রিত মাধবীর প্রতি এক ধরনের সহজাত ভালো লাগা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ববান, তেজস্বী যুবক বিভূতির প্রতিও একই রকম ভালো লাগা জন্ম নেয় মাধবীর মনে। এ পর্যায়ে সদানন্দ-বিপিনের ঈর্ষাবোধ লক্ষণীয়,

১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০

'বিপিন আর সদানন্দ দুজনের মনেই প্রায় এক ধরনের অদম্য ইচ্ছা জাগে – ছুটিয়া গিয়া মাধবীলতাকে বগলদাবা করিয়া বিভূতিকে আথালিপাথালি প্রহার করা।'[১৫]

মাধবী যখন স্থায়ীভাবে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে, তখন বিপিন সদানন্দের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে ছিল এক নারীকে নিয়ে দুই পুরুষের স্নায়ুবিক লড়াই। নারী হাতছাড়া হয়ে যাবার পর তাদের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় বিপিন সদানন্দকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেয় সদানন্দ মাধবীর টানে আশ্রয় নেয় মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে।

মহেশ চৌধুরী যখন তার একমাত্র ছেলের সাথে মাধবীর বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন দেখা যায় : এই সিদ্ধান্তে বর নিমরাজি, কনে রাজি কিন্তু সাধু বাবাজির অমত। 'রাগে সদানন্দের গা যেন জ্বলিয়া যায়'। এ পর্যায়ে ঔপন্যাসিকের কাহিনীবয়ন ও সংলাপ সৃষ্টি তীর্যক, দ্যুতিময় :

> জান মহেশ, তোমার ব্যাপার ভালো বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ওর ভালো লাগে নি বলে, সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।'
>
> 'প্রভু?'
>
> 'তুমি বুঝতে পার না মহেশ, ও মেয়েটির মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি! একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে একদিন ও সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায়!'

---

১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫১

'প্রভু?'

'বল না, কি বলতে চাও? আলোচনা করবার জন্যই তো ডেকেছি তোমায়!'

'বিয়ে না হলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না, প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।'

সদানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, বিয়ের জন্য আমি ছটফট করছি মহেশবাবু?'

মহেশ হাত জোড় করিয়া বলে, 'আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার? কোনো মেয়ে অমন করে বলেও না, পারেও না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজাসায়েবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে বার করে এনেছিল!'

'ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কি করেছিল – '

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা মেয়েটির মনে প্রবল।'

'কিন্তু মহেশ – '

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়েটা হয়ে যাক্, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলে আশ্রয় দেবেন। যেমন চান তেমনি করে গড়ে তুলবেন দুজনকে। আপনার কাজে দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু?'

সদানন্দের মনে হয়, মহেশ যেন তাকে ভক্তিমাখা চাবুক মারিয়াছে।[১৬]

বিভূতি-মাধবীলতার বিয়ের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হওয়ার পর সদানন্দ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মাধবীকে আড়ালে আবডালে একাকী পেলে সে প্রাক্তন প্রেমিকসুলভ অভিমান প্রকাশ করে বলে, 'আমাকে একেবারে ত্যাগ করে দিলে মাধু?' একদিন নিরিবিলিতে পেয়ে মাধবীকে ধর্ষণ করার

১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

অভিপ্রায় নিয়ে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় মাধবী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে সে যাত্রা সে রক্ষা পায়। লাঞ্ছিতা মাধবী এ খবর হবু বরকে বলে দিলে বিভূতি সদানন্দের নাকের ওপর সজোরে ঘুসি বসিয়ে দেয়, ফলে তার 'নাকটা ছেচিয়া' যায়। গুরুজির প্রতি পুত্রের এ হেন পাপকর্মের 'প্রায়শ্চিত্ত' করার মানসে মহেশ চৌধুরী নিজেই নিজের নাকের ওপর হাতুড়ির এক ঘা বসিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন। সময় মতো বিভূতি-মাধবীর বিয়ে হয়ে যায়।

মহেশ চৌধুরীর বাড়ি ছেড়ে সদানন্দ আবার তার পুরানো আশ্রমে গিয়ে ওঠে। বিপিনও সব মিটমাট করে ফেলে। দুই বন্ধুর পুনর্মিলনে মান-অভিমান- অভিযোগ-অনুযোগের সঙ্গে প্রকাশিত হয় সদানন্দের একটি চরম আকাঙ্ক্ষা :

> সদানন্দের চোখ জ্বলিয়া উঠিল – এ জ্যোতি বিপিন চেনে। মানুষকে খুন করবার আগে মানুষের চোখে এ জ্যোতি দেখা দেয় ‍– 'কি জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম, তখন কি জানি এমন পাজি শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! একটা রাত্রির জন্য ওকে শুধু আমি চাই, ব্যস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুশি করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙতে হবে।'
>
> এবার বিপিন যেন ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝিতে পারে। মাধবীলতা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই সদানন্দের এত জ্বালা।[১৭]

ঈর্ষাবিদ্ধ বিপিন বাইরে নিমরাজি হলেও ভেতরে ভেতরে চিন্তিত হয়ে ওঠে। সদানন্দের সাধ যাতে পূরণ না হয়, সে ব্যবস্থা করার জন্য গোপনে গিয়ে মাধবীকে সে সতর্ক করে দেয়। অথচ তার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে মাধবীলতা যখন সদানন্দের সঙ্গে একান্তে দেখা করার জন্য আশ্রমে উপস্থিত হলো, তখন বিপিনের ঈর্ষা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

---

১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২

এ ভাবে 'অহিংসা' উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সদানন্দ-বিপিন-মাধবী বিভূতি তাদের ইচ্ছাশক্তির কর্তা নয়, তাদের কর্মকাণ্ডের চালক নয় – তাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে অন্ধকার গুহাবাসী এক বিরাট জৈবিক শক্তি। ফ্রয়েড যেমন দেখিয়েছেন : মানব মন যুক্তির বাধ্য নয়, অন্তরবাসী যৌন দেবতার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে চালিত হয়। মাধবী-সদানন্দ-বিপিন-বিভূতি একান্তভাবেই লিবিডোতাড়িত, যার উদ্ভব তাদের অন্ত রশায়িত Id থেকে। মাধবীলতাকে নিয়ে রাজপুত্র নারায়ণের আশ্রমে আগমন, সাধু সদানন্দের সঙ্গে তার রাত্রি যাপন, বিপিনের ঈর্ষা, মাধবীর ওপর আধিপত্য নিয়ে সদানন্দ-বিপিনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মাধবীকে বিপিনের আলিঙ্গন এবং তাকে প্রণয় নিবেদন, মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে মাধবীর আশ্রয়, আশ্রম থেকে সদানন্দকে তাড়িয়ে দেওয়া, মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে সদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ, মাধবী-বিভূতির বিবাহে তার প্রবল বিরোধিতা, মাধবীকে সদানন্দের ধর্ষণের চেষ্টা, বিভূতির সদানন্দকে প্রহার, মহেশ চৌধুরীর অভিনব 'প্রায়শ্চিত্ত', মাধবী-বিভূতির বিবাহ, আশ্রমে সদানন্দের প্রত্যাবর্তন, মাধবীকে ভোগ করার জন্য সদানন্দের মরিয়া হয়ে ওঠা, বিপিনের দ্বিমুখী আচরণ, মাধবীর স্বামিগৃহে গিয়ে তাকে সতর্কীকরণ, অতঃপর মাধবীকে দেখে বিপিনের যুগপৎ আশঙ্কা ও ঈর্ষাবোধ পর্যন্তই শুধু নয়, এর পর উসকানি দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী-পুরুষ বিভূতিকে হত্যা, এবং পরিশেষে মাঝরাতে নৌকাযোগে মাধবী এবং সদানন্দের চলে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই মূলত মাধবীকে ভোগদখলের জন্য তিনটি চরিত্রের – সদানন্দ, বিপিন এবং বিভূতির – স্তরবহুল, বহুমাত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং অতঃপর তা থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রূপায়ণ। সুতরাং 'অহিংসা' উপন্যাসের কাহিনী বয়নে এবং চরিত্রচিত্রণে ফ্রয়েডীয় প্রভাব অবিসংবাদিত। অহিংসা' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতনভাবে মনঃসমীক্ষাকে তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে উত্তরপ্রজন্মের একজন সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন।[১৮]

---

১৮. তারিক মনজুর, 'অহিংসা'র ভাষা, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৯

'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) উপন্যাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের প্রথম লেখা উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র মিল রয়েছে। এই মিল কাহিনীর দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনে, এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের আন্তর প্রকৃতি রূপায়ণে। আবু সয়ীদ আইয়ুব লক্ষ করেছেন : বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন সমকালীন সাহিত্যে প্রবল প্রভাব ফেলে। এর জন্য প্রথমত দায়ী ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব। এক সভ্যতার পতন এবং আর এক সভ্যতার উত্থানের মাঝখানকার সময়টা স্বভাবতই অরাজকতার সময়। এই সময়ে মানুষের প্রবৃত্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই ক্যাপিটালিস্ট দেশে প্রচণ্ড বেগে সেক্সের চর্চা চলে, জন্মায় যৌন বিকার মানসিক ব্যাধি এবং ব্যাধির প্রতি আসক্তি। এই সামাজিক পটভূমিকার ওপরই চতুষ্কোণ উপন্যাসের চরিত্রগুলো অঙ্কিত।[১৯] তাঁর ভাষায় :

> বইয়ের চতুষ্কোণ নামটিতে বোঝায় সেই শেল্‌ফে আলমারিতে টেবিলে চেয়ারে এবং রাজকুমারের ভাবনায় দুর্ভাবনায় স্বপ্নের বিকারে দিবাস্বপ্নের জঞ্জালে ঠাসা ছোট ঘরটিকে। কিন্তু 'চতুষ্কোণ' বলতে আরও কিছু বোঝায়। নামকরণে ইঙ্গিত রয়েছে সমাজের সেই সংকীর্ণ কক্ষটির দিকে যা উত্তেজনার উপকরণ-বাহুল্যে ঠাসা, যেখানে বিরাট পৃথিবী ও বৃহৎ সমাজে আলো-বাতাস পৌঁছয় না, যার বাসিন্দাদের প্রচুর অবসর শুধু নিরানন্দ আমোদের পেছনে ধাবমান এবং বিক্ষুব্ধ। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার যখন এক চতুষ্কোণে বসে বসে বই পড়ে, আর শুয়ে শুয়ে হাজারো এলোমেলো ভাবনা ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে বেরিয়ে যায় অন্য চতুষ্কোণটিতে। সেখানে যাদের সঙ্গে তার সংস্পর্শ তারা তাকে আঘাত করে কিন্তু জাগিয়ে তুলতে পারে না, উত্তেজিত করে উৎপ্রাণিত করতে পারে না ; তাদের ঘোরানো-প্যাঁচানো বাঁকানো-চোরানো জীবন তার জীবনকে জটিলতর করে দেয়, সিদ্ধি বা শান্তির কোনো রাস্তাই বাৎলে দিতে পারে না। বিভ্রান্ত রাজকুমার ফিরে আসে তার পূর্ব চতুষ্কোণটিতে। আবার ভাবে, বই পড়ে আর স্বপ্ন দেখে – এমন সব স্বপ্ন যা ফ্রয়েড, আদলার, জোনসের বইয়ের সেরা দৃষ্টান্ত হতে

১৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব, সাহিত্যে যৌনপ্রসথ ও বর্তমান সমাজ, *শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা*, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৫

পারত। এমন মানুষের মনে বিকার না এসে পারে না। নারী সম্বন্ধে রাজকুমারের চৈতন্য অস্বাভাবিক প্রখরতা লাভ করে। নারীকে কিন্তু সে ভালবাসে না, তার আসঙ্গও সে চায় না, সে কেবল তার সুপরিচিতা কোনো মেয়ের নগ্নদেহ একবার চোখ ভরে দেখবে। এই বাসনার এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া করে নিজের মনকে সে চোখ ঠারে। কিন্তু তাতে শান্তি কৈ। তার জীবন এগিয়ে চলে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে, বিকারের দিকে।

প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই দেখা যায় রাজকুমারের মাথা ধরেছে। সে নিজে স্বীকার না করলেও তার ডাক্তার বন্ধু অজিত জানে যে স্বাস্থ্য তার খারাপ। মানসিক ব্যাধিরও একটু ইঙ্গিত করল বন্ধু, সেটা কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলে। তখনও সে বিকারগ্রস্ত নয়, তবে মন তার অনিবার্যভাবে এগুচ্ছে বিকারের দিকে। আমাদের চোখের সামনে বিকারের চিহ্নগুলো একে একে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; উপন্যাসের আকার ক্ষুদ্র এবং লয় দ্রুত বলে ৭০/৮০ পৃষ্ঠার মধ্যেই আমরা একটি পুরোপুরি নিউরোটিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এই নিউরোসিসের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। জানি না আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্ব সম্পর্কে মানিক বাবু কতদূর অভিজ্ঞ। তিনি যদি অভিজ্ঞ না হন তাহলে তাঁর সহজাত গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। যদি হন তবে তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের সংযম ও নিরাড়ম্বর পশ্চাদপসরণ প্রকৃত শিল্পীরই যোগ্য। বহু দেশী ও বিদেশী ঔপন্যাসিক এ স্থলে libido, repression, regression, sublimation, voyeurism, censorship প্রভৃতি তত্ত্বকথা ও পারিভাষিক শব্দের পসরা বের করে পাঠকের মনে চমক জাগাতে গিয়ে উপন্যাসটাই মাটি করতেন। আর এক দিক থেকে উপন্যাসের আরও ঘোরতর সর্বনাশ ঘটতে পারত কাঁচা লেখকের হাতে।[২০]

২০. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

বস্তুত, 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজকুমার একটি আদর্শ ফ্রয়েডীয় চরিত্র। এই চরিত্রটির প্যাটার্ন তৈরিতে এবং তার বিকারগ্রস্ততার বহুমাত্রিক স্তর উন্মোচনে ঔপন্যাসিকের ফ্রয়েড-চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। তিরিশোত্তর কথাসাহিত্যে যৌন বিকারগ্রস্ত একটি আদর্শ ফ্রয়েডীয় চরিত্র রাজকুমার।

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের নামকরণ এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচকেরা মোটের ওপর একমত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'চতুষ্কোণে' মূলত যৌনতাসম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।[২১] তাঁর ভাষায় :

> গোটা মানুষ ও তাহার মানস সমগ্রতাকে বাদ দিয়া তাহার সাধারণতঃ অবদমিত অংশ বিশেষকে, তাহার যৌন আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য অণু-পরমাণুকে, অগণিত বুদবুদরাশির ন্যায় দ্রুত উত্থান-বিলয়শীল, যৌন কল্পনার ছায়াছবিগুলিকে একটা অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, একটা অখণ্ড জীবনের প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। রোমান্স লেখক জীবনের জটিল বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া অবিমিশ্র সৌন্দর্য-রোমাঞ্চের জন্য যে কল্পনামূলক স্বৈরাচারের দাবী করেন, এখানে অবরুদ্ধ যৌন কামনার বেপরোয়া পক্ষ বিস্তারের জন্য, মনোবিকারের উদ্ভট আতিশয্যের খাতিরে, সেই চরম দাবীই উত্থাপন করা হইয়াছে।[২২]

অচ্যুত গোস্বামী 'চতুষ্কোণে' লক্ষ করেছেন চারটি মেয়ে এবং একটি ছেলের বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েন।[২৩] হায়াৎ মামুদের দৃষ্টিতে দেহ-মন-যৌনতা এর উপজীব্য বিষয়।[২৪] নিতাই বসুর মন্তব্য আরো সূক্ষ্ম, ব্যাপক এবং লক্ষ্যভেদী :

---

২১. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২

২২. ঐ, পৃ. ৫২২

২৩. *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশে

> উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নরনারীর দেহজ কামনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনকে কেন্দ্র করে লেখক এই উপন্যাসের একটি জটিল কাহিনীর বিন্যাস ঘটিয়েছেন, যেখানে সমাজনীতি-অর্থনীতি প্রসঙ্গ রীতিমতো গৌণ ব্যাপার।[২৫]

নিতাই বসুর দৃষ্টিতে 'চতুষ্কোণ' মূলত চার নারীর সঙ্গে এক পুরুষের 'চতুষ্কোণিক বক্র কুটিল' প্রেমকাহিনী।[২৬]

'চতুষ্কোণে' চারটি নারীচরিত্র – গিরি, রিণি, মাধবী ও সরসী; এবং তাদের প্রেমিক পুরুষ একজন – রাজকুমার – এমন কথাই সবাই বলেছেন। এবং এ কারণেই এ উপন্যাসে সবাই লক্ষ করেন চতুষ্কোণিক প্রেমের জটিলতা। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণ ভিন্নতর। আমাদের প্রথম বক্তব্য : 'চতুষ্কোণে' নায়িকা চার জন নয় – তিন জন – সরসী, রিণি এবং মাধবী। গিরিকে নায়িকা বলা কতোটা যুক্তিসঙ্গত, তা ভেবে দেখার সময় বিবেচনায় আনা দরকার যে, এ উপন্যাসে নায়কের সাথে তার দেখা একবারই ঘটে। তার আগমন উপন্যাসের তৃতীয় পৃষ্ঠার একদম শেষে এবং প্রস্থান ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শুরুতে। সর্বসাকুল্যে চারটি পৃষ্ঠায় তার উপাখ্যান সীমিত। গিরি ও রাজকুমারের মধ্যে কোনো প্রকার প্রণয় সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা মতে গিরি "রোগা, লম্বা পনের ষোল বছরের মেয়ে, তের বছর বয়সের বেশি বয়স বলে মনে হয় না।" রাজকুমার নাড়ি দেখার নাম করে তার ডান হাত চেপে ধরে এবং 'তোমার হার্ট নিশ্চয় খুব দুর্বল। দেখি-' বলে সে "ডুরে শাড়ির নিচে যেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখান হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল।" গিরি সেদিন ডুরে শাড়ির নিচে সেমিজ পরে নি, রাজকুমার অনুভব করে : তার বুক 'বালকের বুকের মতো সমতল'।

---

২৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

২৬. ঐ, পৃ. ১৬৯

সর্বসাকুল্যে চারটি পৃষ্ঠায় যে গিরির উপকাহিনী, তাকে যদি রাজকুমারের প্রণয়িনী বলে অন্যতম নায়িকার মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ নারীচরিত্র কালীকেও অন্যতম নায়িকার মর্যাদা দেওয়া জরুরি। নাড়ি দেখার অজুহাতে রাজকুমার তারও হাত ধরেছে, পাল্‌স্‌ দেখার নাম করে তার বুকেও হাত দিয়েছে। পুরো উপন্যাস জুড়েই কালীর পদচারণা। রাজকুমারের কিছু কিছু খাপছাড়া আচরণে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেও সে তাকে ভালোবাসে এবং স্বামী হিসেবে জীবনে পেতে চায়। রাজকুমারের সঙ্গে অন্য নারীদের সংশ্লিষ্টতাকে রীতিমতো ঈর্ষার চোখে দেখে সে। রাজকুমারকে ভালোবাসা এবং তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ইতিবাচক মনোভাব এ উপন্যাসে শুধু সে-ই প্রকাশ করেছে, আর কেউ নয় – না গিরি, না রিণি, বা মাধবী, না সরসী। গিরি ও রাজকুমারের মধ্যে কোনো প্রণয়সম্পর্ক নেই। রিণিও রাজকুমারকে ভালোবাসে না। একবার সে আবেগের বসে রাজকুমারের নিকট চুম্বন প্রত্যাশা করেছিল, রাজকুমার তার দাবি মেটায় নি। অনুরূপভাবে রাজকুমারও একবার রিণির নগ্নদেহ দেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে রিণি অপমান বোধ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। উপন্যাসের শেষে সে পাগল হয়ে যায়। যদিও তার পাগল হয়ে যাবার পর রাজকুমার অনুশোচনাবশত তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে – ভালোবাসাবশত নয়। রাজকুমার কাউকে ভালোবাসে না। মাধবী রাজকুমারের একান্ত সান্নিধ্য কামনা করে হোটেলে গেছে, পরে ভেবে দেখেছে : কমপক্ষে দু মাস একত্রে না থাকলে তার তৃষ্ণা নিবারণ হবার কথা নয়। কিন্তু সে রাজকুমারকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার মনোবাসনা কোথাও ব্যক্ত করে নি। শুধু সরসী রাজকুমারকে ভালোবাসে কিন্তু বিয়ে নামক প্রথার মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার আগ্রহ তার মধ্যেও লক্ষ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু কালী। অথচ তাকে পার্শ্ব নায়িকার মর্যাদা কেউ দেন নি। আমাদের মতে 'চতুষ্কোণে'র নায়িকা হয় তিন জন – রিণি, মাধবী, সরসী, নতুবা পাঁচ জন – রিণি, মাধবী, সরসী, কালী ও গিরি। দ্বিতীয় বক্তব্য : কথিত এই চার নারীর জীবনে প্রেমিক পুরুষ রাজকুমার কেবল একা নয়, আরেকজন আছে – শ্যামল। সে মাধবীকে ভালোবাসে, মাধবী আসক্ত রাজকুমারের প্রতি – রাজকুমার কাউকেই ভালোবাসে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই : 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে একটি পুরুষের সঙ্গে চারটি নারীর নয়, দুটি পুরুষের প্রতি পাঁচটি নারীর জটিল প্রেম দেখানো হয়েছে।

রাজকুমার যে বিকারগ্রস্ত, তা সে নিজেই জানে। আর জানে বলেই তার অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। সরসীর কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণ জীবন, তারও কয়েক জনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণাবিদ্বেষের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে, আমি সেখান নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ি দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারি করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরির সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল।[২৭]

এই বিকারগ্রস্ততা রাজকুমারের যাবতীয় উদ্ভট কর্মকাণ্ডের মূলে সক্রিয়। ফ্রয়েড জানিয়েছেন, মানুষের জীবনের যে কোনো খাপছাড়া ব্যবহার তার যৌন অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, 'উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক আচরণের সূত্র ধরিয়া টান দিলে দেখা যায় যে, ইহা শেষ পর্যন্ত কামানুভূতির মূল-সংলগ্ন।'[২৮]

রাজকুমারের অপ্রকৃতিস্থ মনে নানা উদ্ভট খেয়াল জাগে, যার পুরোটাই তার তথাকথিত 'থিউরি বিলাস'। সে ভাবে : নারীর নগ্নদেহ তার ভবিষ্যৎ জীবনধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করতে সক্ষম। সে তার এই উদ্ভট তত্ত্ব যাচাই করে দেখার জন্য পরিচিত সব নারীর অঙ্গের ওপর তীক্ষ্ণ, অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ষোল জন নারীর ছবি তুলেও তার মন ভরে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অনুভব

---

২৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৬-৬৪৭

২৮. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৫

করে : একবার রিণিদের বাড়িতে গিয়ে খেলার ছলে তার হাত ধরে টানতে এবং তার ব্লাউজের একটা বোতাম পরীক্ষা করে না দেখতে পারলে তার মাথাটা বোমার মতো ফেটে যাবে। অথচ নির্জন বাসায় রিণি যখন একান্ত মুহূর্তে চুম্বন প্রত্যাশা করে রাজকুমারের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেয়, তখন সে 'না, ছি' বলে পিছিয়ে আসে। অথচ এই রিণিরই নগ্ন স্নানের দৃশ্য দেখার জন্য তার কাছে খাপছাড়া আবদার করে বসে।

সমিতির সভায় রাজকুমার এক দৃষ্টিতে সরসীর দিকে তাকিয়ে থাকে তার বসবার ভঙ্গিটি দেখবার জন্য। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> সরসীর ওঠাবসা চলাফেরার মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ আছে, কেবলই তার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সরসীর আকর্ষণ তার কাছে খুব বেশি জোরালো নয়, কিন্তু সরসীর প্রত্যেকটি সর্বাঙ্গীণ অঙ্গ সঞ্চালন মৃদু একটা উত্তেজনা জাগাইয়া তাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।[২৯]

বৃষ্টির সন্ধ্যায় ছাত্রী মাধবী যখন রাজকুমারের একান্ত সান্নিধ্য কামনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে, সেই মুহূর্তে শ্যামল এসে পড়ায় তাদের কর্মকাণ্ড সেদিনকার মতো স্থগিত হয়ে গেলেও হোটেলের নির্জন কক্ষে মাধবীকে একান্তভাবে কাছে পেয়েও সে কোনো ভাবেই কোনো যৌন আবেগ প্রকাশ করে না। যদিও ব্যাকুল ভাবে মাধবী বলেছিল, 'এক রাত্রির জন্য রুম নিয়ে নয়, চল আমরা কোথাও চলে যাই দুজনে, মাস তিনেকের জন্যে। অন্তত দুমাস। কিছুদিন একসঙ্গে এক বাড়িতেই যদি না রইলাম–'[৩০]

---

২৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৫

৩০. ঐ, পৃ. ৬৪১

বলাবাহুল্য, রাজকুমারের কাছে যে কোনো নারীর এই আবেদন পরিণামশূন্য, অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাতে শুয়ে শুয়েও রাজকুমারের অবচেতন মন জুড়ে নারীর নিরাবরণ দেহ ভাসতে থাকে। তার মনোবিশ্লেষণ করেছেন লেখক এইভাবে :

> আধ ঘুম আধ জাগরণের সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিষ্পাপ জগতের অবাস্তব অবলম্বনে একটি অপরূপ নিরাবরণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। বেশি দূরে নয়, হাত বাড়ালেই বোধহয় স্পর্শ করা যায়, তবু অস্পষ্ট। কোন জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাহিরে, কিছুই টের পাওয়া যায় না। ঘুম ভাঙিবার পর ছায়া মিলাইয়া যায়, ওই রকম কয়েকটি দেহ পরীক্ষা করিবার ঔৎসুক্য শুধু জাগিয়া থাকে রাজকুমার।[৩১]

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কনে দর্শন করেও তার মাথার মধ্যে নগ্ন নারীদেহ দেখার খাপছাড়া বাসনা দুর্মর হয়ে ওঠে। তার মনের অন্তর্জগতে তোলপাড় করে ফেরে একটিই আকাঙ্ক্ষা :

> কাপড়-ঢাকা দেহ দেখিয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারা যায়? দশ মিনিটের জন্য যদি ভগবান যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন ঠিক তেমনি অবস্থায় মেয়েটিকে সে দেখিতে পাইত! বন্ধুর দাম্পত্য জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার জানা হইয়া যাইত।[৩২]

অবশেষে সরসী তার এই উদ্ভট ইচ্ছা পূরণ করেছে নগ্নদেহে তার সামনে উপস্থিত হয়ে। একান্ত গৃহকোণে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে সরসী এসে দাঁড়ানোর পর রাজকুমার কোনো প্রকার যৌন চপলতা প্রকাশ করে নি, বরং বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি নিয়ে বলেছে :

> এবার যাও সরসী।
>
> 'তোমার কাজ হয়েছে? এসেছি যখন,

---

৩১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১২-৬১৩

৩২. ঐ, পৃ. ৬২৫

মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে লাভ হবে না। আর দু তিন মিনিট কোনো রকমে সইতে পারব।' 'আর দরকার নেই।[৩৩]

অবচেতন ইচ্ছা পূরণের পর পরই রাজকুমারের অসুস্থতা ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে, এবং তার ভেতর থেকে সুস্থ এক যুবক আত্মপ্রকাশ করতে থকে। ফ্রয়েড জানিয়েছেন, অবদমন কাটিয়ে ওঠার পরে মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে – মেঘ কেটে গেলে সূর্যের আলো যেমন প্রকাশিত হয়। রাজকুমারের অকপট স্বীকারোক্তি, 'তুমি আজ জ্বালাটা দূর করে দিলে। --- তুমি আজ আমার বিকারটা কাটিয়ে দিয়েছ সরসী'[৩৪]

এ উপন্যাসে কেবল রাজকুমার চরিত্রের মধ্যে নয়, মনোরমা, কালী, গিরি, সরসী, রিণি মালতী, শ্যামল চরিত্রের প্যাটার্ন সৃষ্টিতেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। সর্বত্রই একটি বিকার, এক ধরনের উদ্ভট, খাপছাড়া আচরণ চরিত্রগুলোকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

মনোরমা বিগতযৌবনা রমণী। কিন্তু যুবক বয়সী পাতানো ভাই রাজকুমারকে সে যেভাবে স্তন প্রদর্শন করেছে, তা তার অবদমিত যৌন কামনা-বাসনাকেই মূলত পরিস্ফূট করে, বাৎসল্য নয় :

> কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজু ভাই, এক মিনিটের জন্যে?'
>
> এবার দেখা গেল, মনোরমা তার দেড় বছরের ছেলেকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। কচি কচি হাত দিয়া খোকা তার আঁচলে ঢাকা পরিপুষ্ট স্তন দুটিকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রাজকুমারের দৃষ্টি দেখিয়া মনোরমা মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, 'এমন দুষ্ট হয়েছে ছেলেটা! খায় না কিন্তু ঘুমোনোর আগে ধরা চাই। মনে মনে খাওয়ার লোভটা এখনো আছে আর কি?'
>
> 'তুমিই ওর স্বভাবটা নষ্ট করছ দিদি। ধরতে দাও কেন?' মনোরমা আবার মৃদু হাসিল।

---

৩৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৯

৩৪. ঐ, পৃ. ৬২৯

'দ্যাখ না ছাড়াবার চেষ্টা করে?'

সরল সহজ আহ্বান, একান্ত নির্বিকার। পঞ্চাশ বছরের একজন স্ত্রীলোক যেন তার কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথা হইতে দুটি পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিতেছে দশ-বার বছরের এক বালককে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর বাড়ি ঘুরিয়া আসিবার আগে হইলে হয়তো রাজকুমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা অস্বস্তি বোধ করিত না, এখন মনোরমার প্রস্তাবে সে যেন নিজের মধ্যে কুঁচকাইয়া গেল।

মনোরমা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'খোকাকে ছোঁয়ার নামেই ভড়কে গেলে! ছোট ছেলেপিলেকে ছুঁতেই তোমার এত ঘেন্না কেন বল তো রাজু ভাই?'

রাজকুমার বিব্রত হইয়া বলিল, না না, ঘেন্না কে বললে, ঘেন্না কিসের![৩৫]

রাজকুমারকে জৈবিকভাবে কাছে পাওয়ার নেশা চতুষ্কোণের কথিত চার নায়িকার মধ্যে মালতীর মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল ও তীব্র। বর্ষণস্নিগ্ধ সন্ধ্যাবেলা ছাত্রী পড়াতে এসে রাজকুমার মালতীর প্রতি যে আবেগ অনুভব করেছে, তা জৈবিক কামনা বাসনায় রঞ্জিত। মালতীর রাজকুমারের আংটি-চুম্বন এবং রাজকুমারের মালতীর চুলে মাথা রাখার মধ্যেই সে দিনের ঘটনা সীমাবদ্ধ থাকতো না, ঘটতে পারতো আরো বড়ো কোনো ঘটনা। হঠাৎ করে শ্যামল ঘরে ঢুকে পড়ায় দুজন সংকুচিত হয়ে পড়ে। লেখকের বর্ণনা :

মালতীর খোলা খাতার সাদা পৃষ্ঠা দুটিতে একটি অক্ষরও লেখা হয় নাই, দুটি পৃষ্ঠার যোগরেখার উপর লিখিবার কলমটি পড়িয়া আছে। রাজকুমার হাত বাড়াইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গেল অন্য পৃষ্ঠায় কিছু লেখা আছে কিনা। তার বুকে লাগিয়া মালতীর মাথাটিও নত হইয়া গেল। রাজকুমারের আঙুলে তারের মতো সরু একটি আংটি, তাতে এক বিন্দু জলের মতো একটি পাথর। দুহাতে সেই আংটি পরা হাতটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আরো মাথা নামাইয়া আংটির সেই পাথরটিতে মুখ

৩৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৭

> ঠেকাইয়া মালতী চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে যেন পিপাসায় কাতর, জলবিন্দুর মতো ওই পাথরটি পান করিয়াই পিপাসা মিটাইতে চায়।
>
> তখন এক কোমল অনুভূতির বন্যায় রাজকুমারের চিন্তা আর অনুভূতির জগৎ ভাসিয়া গেল, মনে হইল শুধু মমতায় এবার তার মরণ হইবে। মালতীর একটি চুলের জন্য তার একি মায়া জাগিয়াছে! এক মুহূর্তের বেশি সহ্য করাও কঠিন এমন এই আত্মবিলোপ। মালতীকে বিশ্বজগতের রানী করিয়া দিলে তার সাধ মিটিবে না, ফুলের দুর্গে লুকাইয়া রাখিলে ভয় কমিবে না, তাই শুধু মালতী ছাড়া কিছুই সে রাখিতে চায় না, নিজেকে পর্যন্ত নয়।
>
> কয়েক মুহূর্ত শ্রান্ত হইয়াই সে যেন ধীরে ধীরে মালতীর চুলে মাথা রাখিল।
>
> 'মুখ তোল, মালতী।'
>
> মালতী মুখ তুলিল। তারপর ব্যস্তভাবে উঠিয়া সরিয়া গেল।
>
> রাজকুমার বলিল, 'কি হয়েছে মালতী?'
>
> মালতী মৃদুস্বরে বলিল, শ্যামল এসেছে।[৩৬]

রাজকুমারকে শরীরীভাবে কাছে পাবার উত্তেজনায় মালতী ছটফট করে। এই শরীরী উন্মাদনা একান্তভাবেই তার অবদমিত কামতাড়না থেকে উদ্ভূত। লেখকের বর্ণনা :

> কিন্তু আর তার সহ্য হয় না। এই অনির্দিষ্ট অসহ্য-হওয়ার প্রতিকার চাই। এভাবে আর চলে না, চলিতে পারে না। হয় রাজকুমার তাকে লইয়া যাক সমুদ্রতীরের কোনো বন্দরে, পাহাড়ের মাথায় কোনো শহরে, মাঠের ধারের কোনো গ্রামে, সেখানে সন্ধ্যা হইতে তাকে বুকে তুলিয়া এত জোরে পিষিতে থাক যেন শেষ রাত্রে তার দম আটকাইয়া যায়, নয়তো তাকেই অনুরোধ করুক জোরে তার গলা জড়াইয়া ধরিতে

---

৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০১-৬০২

> যাতে আর রাজকুমার নিঃশ্বাস নিতে না পারে। তার দুর্বোধ্য অর্থহীন যন্ত্রণার মতো এইরকম খাপছাড়া ভয়ানক কিছু ঘটুক।[৩৭]

বিয়ে বাড়িতে কনেকে দেখে রাজকুমারের মধ্যে বিকারগ্রস্ততা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন বৌটিকে তার মনে হয় ভোঁতা, জড়বস্তু বিশেষ। স্বামী ধীরেনের দম দেওয়া পুতুলের মতো হবে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড :

> মেয়েটি একটু বোকা এবং অহঙ্কারী। মুখ দেখিয়া এটুকু বোঝা যায়। কাপড়ে পুঁটলি করা দেহটি দেখিয়া অনুমান করা যায় ভোঁতা, অনাড়ম্বর, নিষ্ক্রিয় প্রেমের সে উপযোগী। নীরবে অনেকটা নির্জীব পুতুলের মতো নিজেকে দান করার জন্য সে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; ধীরেনের যখন খুশি গ্রহণ করিবে যখন খুশি করিবে না, তার দিক হইতে কখনো কোনো দাবি আসিবে না, কোনো সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বামীর সঙ্গে অন্তরালের জীবনটিও প্রথম হইতেই তার কাছে হইয়া থাকিবে প্রকাশ্য উঠা-বসা-চলা-ফেরার জীবনের মতোই বাঁচিয়া থাকার নিছক একটা অঙ্গ মাত্র, আবেগ ও রোমাঞ্চের বাড়াবাড়ি যাতে বিকারের শামিল। দাবি সে করিবে সুখ, সুবিধা ও অধিকার, কর্তৃত্ব সে করিবে অনেক বিষয়ে, সংসারে নিজের স্থানটি দখল করিতে কারো সাহায্যের তার দরকার হইবে না, তার হুকুমেই ধীরেন উঠিবে বসিবে। নিস্তেজ প্রাণহীন শুধু হইয়া থাকিবে স্বামীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক।[৩৮]

'চতুষ্কোণে' একমাত্র কালী চরিত্রের মধ্যেই পরিপূর্ণ সুস্থতা লক্ষ করা যায়। সে রাজকুমারকে ভালোবাসে এবং ব্যক্তিজীবনে তাকে স্বামী হিসেবে পেতে চায়। রাজকুমারের অনেক খাপছাড়া ব্যবহার সে সহ্য করে শুধু ভালোবাসার কারণে। রাজকুমারকে ভালোবাসে বলেই রাজকুমারের কাছে কোনো মেয়ে এলে সে ঈর্ষায় বিদ্ধ হয়। এই ঈর্ষার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে রাজকুমারকে একান্তজীবনে একান্তভাবে পাওয়ার বাসনা :

---

৩৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৪

৩৮. ঐ, পৃ. ৬২৪

আরো কিছুক্ষণ বসিয়া, কালীর সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়া সরসী চলিয়া গেল। সরসীকে কালী পছন্দ করে না, রাজকুমারের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে দেখিলেই তার মুখ কালো হইয়া যায়। এক মিনিটের বেশি কাছে থাকিতে পারে না কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কাছে আসে। সরসী আবার রাজকুমারের মুখের দিকে তাকায়, ঠোঁট কামড়ায়, হঠাৎ একটা খাপছাড়া কথা বলে, দুপদাপ পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।[৩৯]

রিণি সুস্থ অবস্থায় রাজকুমারকে কখনো কখনো যে ক্ষণিক উন্মাদনায় কাছে পেতে চেয়েছে, তার তাড়া এসেছে জৈবিক আকর্ষণ থেকে। কিন্তু পাগল হয়ে যাবার পর যেন সে হঠাৎ করেই সুস্থ হয়ে ওঠে, স্বামীর মতো রাজকুমারের সঙ্গে সে সহজ, স্বাভাবিক আচরণ করে। রিণির মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পর রাজকুমার-রিণির যৌনজীবন রূপ নেয় অনেকটা দাম্পত্যজীবনের মতোই সুস্থ, স্বাভাবিক। বিকারভারাক্রান্ত 'চতুষ্কোণে' এ চিত্রটি তাই অনেকটাই শরৎচন্দ্রীয় মহিমায় মন্ডিত :

রাজকুমার বলিল, 'একটু শুয়ে থাকবে রিণি?'

রিণি উদাসভাবে বলিল, 'তুমি বললে শুতে পারি।'

'তোমার শরীর ভালো নেই, শুয়েই থাক। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।'

'তুমি আর আসবে না।'

'আসব, নিশ্চয় আসব।'

বিনা দ্বিধায় রাজকুমার তাকে শিশুর মতো দুহাতে বুকে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। তার অনেক দিনের লিপস্টিক ঘষা ঠোঁট আজ শুকনো রক্ত মাখা হইয়া আছে। সন্তর্পণে সেখানে চুম্বন করিয়া সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।[৪০]

---

৩৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪২

৪০. ঐ, পৃ. ৬৪৪

অসুস্থ বাতাবরণ দিয়ে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাস শুরু হলেও এ উপন্যাসের শেষে শান্ত-স্নিগ্ধ প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশ লক্ষ করা যায়। রাজকুমারের প্রতি সরসী অনুভব করে সুস্থ, স্বাভাবিক প্রেম। রাজকুমারের নগ্নদেহ দেখার প্রবল ইচ্ছাকে পূরণ করে সে রাজকুমারের বিকারগ্রস্থতাকে অনেকখানিই সারিয়ে তুলেছে। সরসীর প্রতি তার কোনো ঈর্ষা নেই, বরং সেবা-শুশ্রূষায় সে রাজকুমারের সঙ্গী হয়। তার প্রেম উত্তীর্ণ হয় শুদ্ধতায়, পরিপূর্ণতায় :

> সরসী মালতীর ভার নেওয়ায় রাজকুমার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সরসীর উপর সে নির্ভর করিতে শিখিতেছিল, সব বিষয়ে সরসীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা ও পরামর্শ করার প্রেরণাও তার এই মনোভাব হইতে আসিতেছে। তাকে রিণির প্রয়োজন, তাই শুধু উন্মাদিনী রিণির সাহচর্য স্বীকার করিয়া সকলের জীবন হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে সরসী। সরসীকেও সে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিল, মুক্তি পাইতে সরসী অস্বীকার করিয়াছে। রাজকুমার তাকে ডাকে না, সরসী নিজেই তার কাছে আসে, বাড়িতে না পাইলে স্যার কে. এল-এর বাড়ি গিয়া তার খোঁজ করে। রিণি তাকে সহ্য করিতে পারে না, নিচে বসিয়া রাজকুমারের সঙ্গে সে কথা বলে। বার বার রিণি তাদের আলাপে বাধা দেয়, রাজকুমারকে উপরে ডাকিয়া অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখে, সরসী ধৈর্য্য হারায় না, বিরক্ত হয় না, অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মনে হয়, সে যেন সকলকে রেহাই দেয় নাই, তাকেই সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র সরসী তাকে ছাঁটিয়া ফেলে নাই, আরো তার কাছে সরিয়া আসিয়াছে।[৪১]

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করেছেন হায়দার আকবর খান রনো।[৪২] সুতপা ভট্টাচার্য বলেছেন : জীবনানন্দ যখন লিখছেন 'বোধ' এর মতো কবিতা, তাঁর কাছাকাছি সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও রচিত হলো একাকী মানুষের মানসচিত্র। চতুষ্কোণের মতো

৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫০

৪২. উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

উপন্যাসে দেখা পেলাম সেইসব একা মানুষদের, বাইরের জগতের ঘটনা-ঘনঘটা নয়, মনের জগতের বিচিত্র জটিলতা যাদের একাকিত্বের মূলে।[৪৩] সিরাজ সালেকীন 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে লক্ষ করেছেন গবেষণাময় বিকার এবং তার থেকে উদ্ধারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। সমালোচকের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> দিবারাত্রির কাব্যে আত্মবিশ্লেষণের অহংকার আছে কিন্তু চতুষ্কোণে আছে এ-বিষয়ক গবেষণাময় বিকার এবং তার থেকে উদ্ধারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। হেরম্বের চাকরি ছিল; রাজকুমার নির্ভেজাল বেকার, কেবল মালতীকে পড়ানো দৃশ্যমান থাকে, যদিও সামাজিকভাবে এলিটদের সঙ্গেই তার চলাফেরা। বোঝা যায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থে সে মনে ও ব্যবহারে ভরকেন্দ্রহীন মধ্যবিত্ত। ভারহীন মনের প্রকট শূন্যতা, মানিক যাকে বলেছেন ফেঁপে-ওঠা, রাজকুমারকে স্থিরতা দেয় নি। নারীরাজ্যে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই শ্যামল ব্যতীত; অবশ্য সে হেরম্বের মতো ভাবে না 'পৌরুষ ও কবিত্ব সমধর্মী', নারীসঙ্গ সে প্রাণের আবেগেই উপভোগ করে – এজন্যই চারপাশে গিরি, মালতী, রিণি, সরসী আর কালীর উপস্থিতি। এই স্থান-প্রস্থানের দ্বন্দ্ব নিয়েই রাজকুমারের অব্যবস্থিত মনের সংকট। দিবারাত্রির কাব্যে মানিকের সন্দর্ভ-জিজ্ঞাসা প্রেম নিয়ে এবং তা হেরম্বের বিবেচনায় উত্তরণহীন।[৪৪]

'নর-নারী' নামে যে পত্রিকায় চতুষ্কোণ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, সে পত্রিকা ছিল মূলত একটি যৌন পত্রিকা – পত্রিকাটিতে যৌন প্রাসঙ্গিক আলোচনা মূলত স্থান পেত। সুপতা ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন : পত্রিকাটির চরিত্রের সঙ্গে মানানসই করেই হয়তো উপন্যাস কল্পনা

---

৪৩. সুতপা ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নরনারী সম্পর্ক : প্রথম পর্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯

৪৪. সিরাজ সালেকীন, দায়/বিদায়ের মধ্যবিত্ত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭

করতে হয়েছিল অভাবক্লিষ্ট লেখককে।[৪৫] 'নর-নারী'তে লিখতে হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই থেকে যান – কোনো পর্নোগ্রাফি লেখক বনে যান না। সুতপা ভট্টাচার্যের নিরীক্ষণ :

> 'নর-নারী'তে লিখতে হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই থেকে যান। আবু সয়ীদ আইয়ুব রাজকুমার চরিত্রটিকে 'পুরোপুরি নিউরটিক' আখ্যা দিয়েছেন। আর বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন : `A story about a youth of perverted sex curiosity ...'। রাজকুমার নিজে নিজেকে perverted অবশ্য বলে না, তবে নিউরটিক বলে। কিন্তু নিজের নিউরসিস যে এত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, সে কি নিউরটিক থেকে যায় তবু? এর উত্তর আমার জানা নেই, তবে আমি দেখি যে, সরসীকে রাজকুমার তার আয়না বলে মনে করে, সে কিন্তু রাজকুমারকে আদৌ নিউরটিক বলে ভাবে না। সংসারে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ সমাজবিহিত চিরাচরিত আচরণই করে থাকে। শতকরা একজন সেটা নাও করতে পারে। রাজকুমার শুধু যে আত্মবিশ্লেষণ করে, তাই নয়, সেই সঙ্গে সে সমাজেরও বিশ্লেষণ করে। সমাজের চাপা যৌনতা তার বিশ্লেষণের বিষয়।[৪৬]

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রেই বিকারগ্রস্ততা লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে সমালোচকের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> রাজকুমার নিজেকে বিকারগ্রস্ত বললেও তার নয়, তার চারপাশের নারী-পুরুষেরই মনোবিকার তুলে ধরেছেন লেখক। মেয়েদের মধ্যে যে ন্যাকামি আর ভাবপ্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেছেন মানিক তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যে, রিণি চরিত্রে তার

---

৪৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নরনারী সম্পর্ক : প্রথম পর্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

৪৬. ঐ, পৃ. ২২৫

> বাড়াবাড়ি প্রথম থেকেই দর্শিয়েছেন লেখক, হয়তো-বা তিনি বলতে চান, সেই ভাবপ্রবণতার অতিরেকই শেষ পর্যন্ত মনোবিকারে পরিণত হতে পারে। রাজকুমারের প্রতি মালতীর শ্রদ্ধার মনোভাবকে যে সে চিনতে পারে না, ভালোবাসা ভেবে ভুল করে, সেও একধরনের বিকার। সন্তানের জননী মনোরমা যেভাবে ছল করে রাজকুমারের স্পর্শ চায়, সেও তো যৌনবিকারের নিদর্শন। শ্যামলের মালতীর প্রতি ভালোবাসা মালতীর চোখে 'নীরব পূজার ন্যাকামি' সে ন্যাকামি যেন বিকারেরই নামান্তর। রাজকুমার যে শরীর-মনের সম্পর্কের তত্ত্ব খাড়া করে তার জন্যে নগ্ন নারীশরীর দেখতে চায়, দেখেও, তার সেই দেখার মধ্যে কোনো বিকার থাকে না। হয়তো-বা লেখক বলতে চান, নর-নারীর সম্পর্ক যেখানে সত্য, সেখানে যৌনতা গৌণ, যৌনতাকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা মানুষের আছে।[৪৭]

সুতরাং কি যৌনতত্ত্ব বিশ্লেষণে,[৪৮] কি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপট উন্মোচনে[৪৯] 'চতুষ্কোণ' একটি স্তরবহুল উপন্যাস। এ উপন্যাসের কাহিনীর অন্তর্বয়নে এবং চরিত্র পরিকল্পনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ফ্রয়েড থেকে।

---

৪৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নরনারী সম্পর্ক : প্রথম পর্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৪৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৫

৪৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাঁচটি তলোয়ারে হৃদয় খান্‌খান্‌, *শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

পঞ্চম অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব : প্রথম পর্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাবের ধরন লক্ষ করলে দেখা যাবে গল্পগুলো দুটো পর্বে বিভাজিত। ১৯৪০ সালের পূর্বে লেখা ছোটগল্পসমূহে ফ্রয়েডের প্রভাব যেমন প্রবল ও তীব্র, ১৯৪০ পরবর্তী ছোটগল্পগুলোতে ফ্রয়েডের প্রভাবের সে রকম প্রবল ও তীব্র নয়। এর কারণ হিসেবে সমালোচকেরা ফ্রয়েড থেকে মার্কসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালাবদলের কথা বলে থাকেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন, তবু তাঁর সাহিত্যকর্মসমূহে ১৯৪০ সাল থেকেই মার্কসের প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে 'সহরতলী' (প্রথম খণ্ড) (১৯৪০) উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে। ১৯৪০ সালের আগে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থগুলোতে ছিল ফ্রয়েডের ব্যাপক প্রভাব। এ পর্যায়ে রচিত তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'অতসীমামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) ও 'সরীসৃপ' (১৯৩৯)। এ সব গল্পগ্রন্থের ফ্রয়েড-প্রভাবিত গল্পগুলোতে ফ্রয়েডীয় প্রভাব কীভাবে রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

মানবমনের বিকারক্লিষ্ট রূপাঙ্কনের শিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে শ্রেষ্ঠত্ব, 'অতসীমামী' গল্পগ্রন্থের 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে তার প্রথম প্রমাণ মেলে।[১] এ গল্পে প্রধান তিনটি চরিত্রের রূপায়ণে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রধান তিনটি চরিত্রের – শিপ্রা, অনিন্দিতা ও পরাশর – মানসগঠনে, তাদের প্রেম, অপ্রেম, ঈর্ষা, অসূয়া, প্রতিহিংসার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকারের যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে। সৈয়দ আজিজুল হকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৯

> শিপ্রার অপমৃত্যু (অতসীমামী) গল্পে ত্রিভুজ-প্রণয়ের দ্বন্দ্ব চিত্র উপস্থাপিত হলেও গল্পের মূল সমস্যা শিপ্রার মনোজাগতিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ... লেখকের সযত্ন প্রয়াস শিপ্রার বিকারগ্রস্ত মনোভূমির রহস্যজটিল আবরণ উন্মোচনেই অধিকতর কেন্দ্রীভূত। ... তার অনাথ ও অসচ্ছল জীবনই তার বিয়েকে করেছে বিলম্বিত। আর এর পরিণতিতে সৃষ্ট অতৃপ্তি, অচরিতার্থতাবোধ, অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ নিয়ে অসহনীয় কল্পনা প্রভৃতি শিপ্রার মানসিক ভারসাম্যচ্যুতির কারণ। নিজ ছাত্রীর সঙ্গে অসংকোচ প্রণয়দ্বন্দ্ব, বয়সে ছোট এক যুবককে আয়ত্ত করার জন্য স্নায়ু-টানটান সতর্ক অভিনয়, পরিপার্শ্বকে তুচ্ছজ্ঞান প্রভৃতি শিপ্রার মনোবিকারের সুস্পষ্ট প্রমাণ। ... অর্থগত দৈন্যের কারণে ত্রিশ বছর বয়সেও যখন কোনো নারীর দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়, তখন তার সামাজিক অবস্থান যাই হোক, জীবন – উপভোগের অতৃপ্তি কোনো অনুকূল পরিবেশে তাকে বিচলিত অসুস্থ ও অস্বাভাবিক করে তুলবে – সেটাই স্বাভাবিক।[২]

পূজার অবকাশে পদ্মাতীরের কোকনদ গ্রামে পরাশর, শিপ্রা ও অনিন্দিতা একত্র হয়েছে। এ গ্রামেই অনিন্দিতার বাড়ি। তার বাল্যপ্রেমিক পরাশরও এ গ্রামেরই ছেলে। অনিন্দিতার একসময়ের শিক্ষক, বর্তমানে বান্ধবীস্থানীয়া শিপ্রা তার বাসায় বেড়াতে এসেছে। অনিন্দিতার গ্রামে আসার পেছনে বিশেষ কোন কারণ নেই। কলেজ ছুটি হলে যে প্রায়ই গ্রামে চলে আসে। পরাশর এসেছে বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায়। এবার তার ধারটা হয়েছে বেশি। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত পরপর দুটি সোসাইটি গার্লের বিলাসিতার খরচ জোগানো সহজ কথা নয়। যথেষ্ট কৃপণতা করেও পরাশরের ধার না করে চলে নি। মেয়ে দুটির সঙ্গে একে একে তার বিচ্ছেদ হয়েছে, ছ মাসের মধ্যে দুটি অস্ত্রোপচার। ক্ষতের চিহ্ন অবশ্য লোপ পেয়েছে একমাসের মধ্যেই কিন্তু ধারটা বেঁচে থেকে সুদে বেড়েছে। পরাশর চরিত্র সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন : সে বড়লোকের একমাত্র অপোগণ্ড দায়িত্বহীন ছেলে — পৈতৃক অর্থের যথেচ্ছ ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে নিজের আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেই তার লোলুপ

---

২. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৮০

নেশা।[৩] শিপ্রা এসেছে অনিন্দিতাদের বাড়ি বেড়াতে। শিপ্রার পরিচয় দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> শিপ্রার কোকনদে আসবার কারণটি পুরোনো। সে শহরের মেয়ে। শহরের রাশি রাশি ইটের আনাচে-কানাচে নিশ্বাস ফেলে সে বড়ো হয়েছে। সংকীর্ণ গৃহ, সীমাবদ্ধ আকাশ, শুধু সম্মুখ ও পিছন-থাকা পথ, পুনরাবর্তিত কর্তব্য ও অবকাশ! সব জড়িয়ে বাহান্নটি সপ্তাহে তার বছর, এ বছরের সঙ্গে ও বছরের কোনো পার্থক্য নেই। বেড়াতে যদি সে কখনো যায় তো মাইনের টাকা বাঁচিয়ে হয় একা, নয় দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে যায় পশ্চিম, যায় পুরী। পাহাড়ের বন্ধুর পথে হেঁটে বেড়িয়ে সে হাঁপায়, সমুদ্রতীরে বালিতে লুটোপুটি খেয়ে সমুদ্রস্নান করে আর সর্বদা আধ-আধ অন্যমনস্ক হয়ে হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে ভাবে, সমস্ত জীবনটার মতো এবারের ছুটিটাও তার মাঠে মারা গেল। তারপর একদিন সে মরিয়া হয়ে চলে যায় তার পিসিমার কাছে হাজারিবাগে।[৪]

পিতৃমাতৃহীন শিপ্রার আত্মীয়ের মধ্যে আছে একমাত্র পিসি — তার নিবাস হাজারিবাগ। অন্যদিকে স্কুলশিক্ষিকা শিপ্রা থাকে কলকাতায়, হোস্টেলে। বেতনের অর্থই তার জীবিকানির্বাহের একমাত্র সম্বল। বেতন থেকে অর্থ বাঁচিয়ে প্রতিবছর ছুটিতে দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এমনই এক ব্যর্থতার বছরে ব্যয়মুক্ত বেড়ানোর আমন্ত্রণ পেয়ে বার্ষিক ছুটি কাটাতে সে যায় কোকনদ গ্রামে। মানিকের ভাষায়, 'এবার পশ্চিম অথবা পুরী যাবার টাকা হাতে না থাকায় এবং হাজারিবাগের পিসিমা করাচি চলে যাওয়ায় অনিন্দিতা ডাকামাত্রা শিপ্রা তার সঙ্গে কোকনদে চলে এসেছে।'[৫] শিপ্রার অর্থনৈতিক দৈন্য রয়েছে কিন্তু তার বেশবাস, সাজগোজ এবং চলাফেরার মধ্যে এক ধরনের পারিপাট্য ছিল। গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে পরাশরকে আকৃষ্ট করাই ছিল শিপ্রার এসব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে লেখক একাধিক দীর্ঘ বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন :

---

৩. *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৭৪

৪. শিপ্রার অপমৃত্যু, *অতসীমামী*, মানিক রচনাবলি (প্রথম খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৪৯

৫. ঐ, পৃ. ৪৫০

ক. শিপ্রার শাড়িসম্পদ ছিল প্রচুর। সকালবেলা প্যারাসোল হাতে পরি সেজে সেই যে সে বেড়াতে যায়, সারাদিন কয়েকবার বেশপরিবর্তন করলেও তার বেশে পরিত্বের ছাপ কখনো ঘোচে না। তার চলার ভঙ্গি, তার কথা ও হাসি, তার নাওয়া ও খাওয়া এবং বিশ্রাম সমস্তই এমন অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হয়ে যায় যে তার শরীরটা মেয়েমানুষের রক্তমাংসে তৈরি কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জাগে। প্রাণের প্রাচুর্যে সে যেন ফেটে পড়তে চায়, কী করবে দিশে পাচ্ছে না। গ্রামে পা দেবার সাতদিনের মধ্যেই পূজার ছুটিতে যে কটা কলেজের ছেলে বাড়ির দুধ-ভাত খাবার জন্য গ্রামে এসেছিল তাদের একত্র করে সে আড্ডা দেয়, গান শোনায়, নাচ দেখায়, আর আজ একে কাল ওকে নিয়ে অনভ্যস্ত লোকেরও বোধগম্য হয় এমনিভাবে ফ্লার্ট করে। সাতবছরের মেয়ের অপরিমেয় চঞ্চল উল্লাসে পরাশরের চোখের সামনে ওদের সঙ্গে সে গ্রামের পথে রেস দেয়, গৃহে পরাশরের সান্নিধ্যে সে ওদের কাছে হয়ে ওঠে হরিণীর মতো চপল, — রানীর মতো প্রভাবশালিনী, অভিনেত্রীর মতো রহস্যময়ী, প্রবঞ্চিতার মতো সংযত, প্রজাপতির মতো হালকা। তার পাশে অনিন্দিতা বৈদ্যুতিক বাল্‌বের পাশে প্রদীপের মতো নিভে যায়। শিপ্রার দিকে তাকিয়ে পরাশর চিন্তিত হয়ে ওঠে।

নাম ছড়ায়। কলকাতার একটি নগণ্যা স্কুল-মিস্ট্রেস আশেপাশের দশটা গ্রামে আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[৬]

খ. কিন্তু শিপ্রা যাই আরম্ভ করুক, একটা আশ্চর্য সংযম সে আগাগোড়া বজায় রেখে চলছিল। তার সাজগোজ অশীল নয়, তার আড্ডাতে হলা হয় না, তার ফ্লার্টিং শুধু কথা ও হাসির। ভোরে ঘুম ভেঙে রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত অজস্র খাপছাড়া কাণ্ডে সে সকলকে উত্তেজিত করে রাখে কিন্তু নিজে সে উত্তেজিত হয় না। তার কথা হয় মৃদু ও সুরের রেশ লাগানো, তার হাসি হয় অপার্থিব একটা অধর-ভঙ্গি, তার চলন হয় টিমে তালের একটা নৃত্যছন্দ! এক কাব্যিক আভিজাত্য, খুব উঁচুস্তরের আধুনিকতা ব্রহ্মাস্ত্রের মতো আত্মরক্ষার জন্য সে পরিস্ফুট করে রাখে। গ্রামের অল্পশিক্ষিত অল্প আলোকপ্রাপ্ত

---

৬. শিপ্রার অপমৃত্যু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২ – ৪৫৩

> নরনারীর মধ্যে সে আলোর মতো উদয় হয়েছে, এরা যদি তাকে পছন্দ না করে সেটা হবে এদেরই সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের দোষ, এদেরই পিছনে পড়ে থাকার পরিচয়। এ ছাড়াও শিপ্রার আরো একটা চালাকি আছে। অনেক ভেবে কৌশলে সে এই ভাবটাও বজায় রেখেছে যে, সে সকলকে মাতায়নি তাকে নিয়ে সকলে মেতেছে। অনিয়ম ও অসংযম যদি কিছু ঘটে থাকে তার দায়িত্ব অন্যের, তার নয়।[৭]

শিপ্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। পরাশর তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমশ তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু শিপ্রার এসব ভড়ং অনিন্দিতার একদম সহ্য হয় না। শিপ্রার এক একটি বানানো কথা, এক একটি নকল হাসি অনিন্দিতার কানে আর চোখে বিঁধতে আরম্ভ করতেই সে দুজনকে আসর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। শিপ্রাকে পরাশরের ভালোলাগার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানিক জানান :

> পরাশর বোকা নয় যে সব বুঝতে পারে। শিপ্রাও বোকা নয়, পরাশর যে সব বুঝতে পারছে এটা বুঝতে পারে সে। কিন্তু পরাশর তার ভানকে গোপন করলেও শিপ্রা এ বিষয়ে কোনো ছলনার আশ্রয় নেয় না। তার জটিল মস্তিষ্কগত হৃদয়াভিযানে তাই একটি মনোরম সারল্যের ছাপ পড়ে। পরাশরের তা ভালো লাগে। এদিক দিয়ে সে একটু দুর্বল বোহেমিয়ান। বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তোলা ভালোবাসার মধ্যেও সে একটু বোকামি একটু সরলতার খাদ পছন্দ করে। তার রঙিন কাগজের ফুলটির অন্তত চেহারায় আসল ফুলের মতো হওয়া চাই।[৮]

ঈর্ষার দুর্মর আগুনে পুড়তে থাকে অনিন্দিতা। তার বাল্যপ্রেমিক, সমবয়সী পরাশরকে একজন অতিক্রান্তপ্রায়যৌবনা[৯] নারী ছলনার জটাজাল বিস্তার করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, এটা সে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। শিপ্রার সঙ্গে অনিন্দিতার কথা চালাচালি বেশ উপভোগ্য :

ক. বদনাম কুড়োচ্ছ কেন শিপ্রাদি?

---

৭. শিপ্রার অপমৃত্যু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩

৮. ঐ, পৃ. ৪৫৪

৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫২৬

অনেক বয়েস হল, এই বেলা একটু কুড়িয়ে না নিলে আর তো পাব না।[১০]

খ. তোর বুদ্ধি এখনও কাঁচা আছে অনি। পৃথিবীতে রোমান্স না থাকলে মেয়েদের উপায় আছে? রোমান্টিক যুগে মেয়েদের ভোঁতা হওয়া চলত, হাজার প্র্যাকটিক্যাল হলেও ক্ষতি ছিল না। এখন পুরুষরা রোমান্স ভুলতে বসেছে, সিনিক আর প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠেছে। মেয়েদেরই এখন রোমান্টিক সেন্টিমেন্টাল সব কিছু হওয়া দরকার। নইলে তারা টিকবে কী করে? স্যানস্ক্রিট পড়ে পড়ে তুই যে কেমন হয়ে গেছিস অনি!

অনিন্দিতা খানিকক্ষণ ভেবে বললে, তুমি তাহলে সিরিয়াস শিপ্রাদি? সময় কাটাচ্ছ না।

শিপ্রা গম্ভীর হয়ে বললে, সময় কাটাবার মতো সময় আর আছে কই? সিরিয়াস না হয়ে একটি ছোটো ছেলেকেও কি এ বয়সে ভোলাতে পারব?

অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বললে, পরাশর তোমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোটো।

নিজের বোকামি বুঝতে পেরে শিপ্রা তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করলে। হেসে বললে, এই যে জেলাসি উপচে উঠছে!

এবার অনিন্দিতা তর্কচ্ছলেও একথার প্রতিবাদ করলে না।[১১]

প্রেমে পড়ার পর শিপ্রার পরিবর্তন লক্ষণীয়। শারীরিক সৌন্দর্যে সে যেমন হয়ে ওঠে একজন পরিপূর্ণা নারী, তেমনি মানসিক আভিজাত্যেও সে হয়ে ওঠে পরম আকাঙ্ক্ষিতা :

ক. অনিন্দিতার সামনে পড়ে গেলে শিপ্রা একটু হাসে। তাকে এত সুন্দর দেখায় যে তাকে আর তার হাসিকে চেনা যায় না। মুখ থেকে সে যেন এক পরত মরা চামড়া তুলে ফেলেছে, লাবণ্যের একটা অজ্ঞাত মাজন দিয়ে দেহ মার্জন করেছে। কোকনদে এসে এই কদিনের মধ্যে তার স্বাস্থ্য অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে, তার দেহের কঠোর শুভ্রতা রঙে ভিজে কোমল হয়ে এসেছে। মাথার চুলগুলি পর্যন্ত

---

১০. শিপ্রার অপমৃত্যু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪

১১. ঐ, পৃ. ৪৫৫

যেন খোলস বদলে হয়েছে উজ্জ্বলতর। তার মুখে চোখে যে অশান্ত উদ্বেগ ও গ্লানিকর বিরক্তির অভিব্যঞ্জনা অনিন্দিতা চিরকাল দেখে এসেছে এখন তার চিহ্ন নেই। তার দৃষ্টি গভীর ও গম্ভীর, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক অবস্থায় অনিন্দিতার দিকে চেয়ে একটু কেবল শঙ্কা তার চোখে দেখা দেয়।[১২]

খ. অনিন্দিতা লক্ষ করে, শিপ্রা প্রতিদিন নিজেকে সংহত ও অখণ্ড করে এনে পরাশরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভোজবাজির মতো তার জাদুনির্মিত শহরটি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে, অকস্মাৎ সমস্ত বিষয়ে সে যে সব বাহুল্য আমদানি করেছিল একে একে তাদের পরিত্যাগ করে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ... পরাশরকে সে যতখানি আকর্ষণ করে, নিজেকে ততখানি ভালো লাগায়। ... মানুষের চোখের আড়ালে এই কোকনদ গ্রামের অনেক গেঁয়ো-বউয়ের মতো পরাশরের প্রেমের মোহে সে দাসী হয়ে থাকে।[১৩]

অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে শিপ্রা ও পরাশরের বিয়ে বিলম্বিত হয়। লেখক জানান :

> শিপ্রা তার হাজারিবাগের পিসিমাকে পত্র লিখেছিল। পত্রে সে প্রস্তাব করেছিল যে পিসিমা যদি কলকাতায় এসে তার বিয়েটা দিয়ে দেন তবে বড়ো ভালো হয়। পিসিমা চিঠির জবাবে লিখেছেন, তাঁর বড়ো টাকার টানাটানি, কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে শিপ্রার বিয়ের আয়োজন করার সংগতি তাঁর নেই। শিপ্রা টাকা পাঠালে ব্যবস্থা করতে পারেন। শিপ্রা নিঃসকোচে এ চিঠি পরাশরকে দেখিয়েছে। পরাশর বলেছে, তাই তো! [১৪]

এ দিকে পরাশরের বাবা ও মা শেষ পর্যন্ত মত দিলেও এ বিয়ে তাঁরা অনুমোদন করেন নি, গম্ভীর উদাসীন হয়ে আছে। পাত্রপক্ষের বিয়ের আয়োজনেও অনিচ্ছুক মন্থর গতিতে চলেছে। পাত্রীর এক পিসিমা পৃথিবীর কোথাও আছে এবং পাত্রীপক্ষে যতটুকু আয়োজন দরকার তিনিই

---

১২. শিপ্রার অপমৃত্যু, পূর্বোক্ত,, পৃ. ৪৫৬
১৩. ঐ, পৃ. ৪৫৬— ৪৫৭
১৪. ঐ, পৃ. ৪৫৮

তা করবেন এমনি একটা আভাস পেয়ে পরাশরের আত্মীয়স্বজন চুপ করে আছে। এখন এ পক্ষের ব্যবস্থার ভারটাও তাঁদের নিতে বলার সাহস পরাশরের নেই। এ পরিস্থিতিতে লেখক আমাদের জানান :

> শিপ্রা ইচ্ছা করল এই অসুবিধা রদ করতে পারত। দুটি সুব্যবস্থা সম্ভব ছিল। হাজারিবাগের পিসিমাকে মধু বোসের আর্থিক অবস্থার বিবরণ লিখে জানিয়ে অভয় দিলে তিনি কলকাতায় ছুটে এসে উৎসবের আয়োজন করতেন। কলকাতায় শিপ্রার কয়েকটি বন্ধু আছে। তাদের অনুরূপ বিবরণ দিয়ে পত্র লিখলে তারা দরকার হলে চাঁদা করেও শিপ্রার বিয়েতে দু-চারশো টাকা খরচ করতে পিছপা হত না। কিন্তু শিপ্রা অনেক ভেবে এদিক দিয়ে কোনো চেষ্টাই করেনি। পরাশরের কাছে নিজেকে সে অসহায় অনন্যনির্ভর করে রাখতে চায়। পরাশর শুধু ভালোবেসেই তাকে গ্রহণ করছে না, তাকে দয়া করছে। সহায়-সম্পদহীনা এক নারীর প্রতি এ তার অনন্ত অনুগ্রহ। শিপ্রা জানে এই করুণার ভেজাল-মেশানো প্রেম খাদ-মেশানো সোনার মতো খাঁটি জিনিসটির চেয়ে শক্ত হয়। চারিদিক থেকে বাধা ও আঘাত পেয়ে শেষের দিকে পরাশর যদি ভালোবাসাকে অস্বীকারো করতে চায়, এই ভেজালকে তা মানতে হবে। জগতে যার কেউ নেই তাকে সে কোনো কারণেই ভাসিয়ে দিতে পারে না।[১৫]

সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন "শিপ্রার সকল সমস্যা-সংকটের মূলে রয়েছে তার আর্থিক দৈন্য, তার অভিভাবকহীন আত্মীয়হীন নিরাশ্রয়ী জীবনের সীমাহীন যন্ত্রণা।[১৬] সমালোচকের এ মত আমরা মানতে পারি নি। শিপ্রার মূল সংকট পুকুরের পানিতে ডুবে মরার সম্ভাবনার সময় পরাশরের নিরুদ্‌বিগ্ন নিশ্চেষ্টতাজনিত প্রেমহীনতা দর্শন। অনিন্দিতা এ সময় ঈর্ষাবশত শিপ্রাকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে শিপ্রাকে সে বুঝিয়ে দিতে চায় যে সে অক্ষম নয়। পরাশর নিরুদ্‌বিগ্ন, নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকে। পরদিন শিপ্রাকে স্টিমারে তুলে দিতে যাবার সময় পরাশর ছিল অনুপস্থিত। সে শিপ্রাকে প্রেম বা বিয়ের কথা

---

১৫. শিপ্রার অপমৃত্যু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮ – ৪৫৯

১৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

বলে, অন্তত ভদ্রতাবশতও কোকনদে থাকার কথাটি পর্যন্ত সে বলে নি। শিপ্রা বুঝতে পারে তার মানসিক অপমৃত্যু ঘটেছে। সহসা সে যেন পরাশরের প্রেমের প্রকৃতি অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। সুতরাং তার সংকট অর্থনৈতিক নয়, মানসিক। প্রেমের ছলাকলা করতে গিয়ে সে একসময় প্রেমে পড়ে যায় কিন্তু পরাশরও যে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছে, পানিতে ডোবার আগ পর্যন্ত শিপ্রা এই নির্মম সত্যটি বুঝতে পারে নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন :

> 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে পরাশরকে অনিন্দিতার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য অতিক্রান্তপ্রায়যৌবনা শিক্ষয়িত্রী শিপ্রার স্পর্ধিত ও দুঃসাহসিক কৌশলজাল বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত শিপ্রার ডুবিয়া মরার সম্ভাবনায় পরাশরের নিরুদ্‌বিগ্ন নিশ্চেষ্টতায় এই অস্বাভাবিকরূপে তীব্র ও বেগবান প্রেমাভিনয়ের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।[১৭]

কেবল শিপ্রা চরিত্রে নয়, অনিন্দিতা এবং পরাশর চরিত্রেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যাবে। শিপ্রাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখার সময় অনিন্দিতা ইগো এবং সুপার ইগোর দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছে। শিপ্রা যখন নকল প্রেমের মোহজাল বিস্তার করছিল তখন অনিন্দিতা অবদমন করেছে। আর পরাশরকে তো বলা যায় 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের হেরম্ব ও 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের রাজকুমারের যোগ্য পূর্বসূরী। লিবিডোই তার চালিকা শক্তি।

দিলীপ মালাকার 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পের মনস্তত্ত্বিক পরিবেশ নির্মাণে গল্পকারের প্রশংসা করেছেন।[১৮] এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এ গল্পে অনাথ স্কুল শিক্ষিকা শিপ্রার অচরিতার্থ জীবন ও যৌবনের রেখাপাত আমরা প্রত্যক্ষ করি। অভিভাবকহীনতা ও দারিদ্র্যের কারণেই মূলত শিপ্রার বিবাহ বিলম্বিত হয়েছে। বিগতযৌবনা হয়ে পড়ার কারণে শিপ্রার মধ্যে যৌবনগত তীব্রতার অতৃপ্তি তাকে মানসিকভাবে বিকল করে ফেলেছে। যৌবনের অচরিতার্থতা

---

১৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬

১৮. *বিবিধ সমালোচনা*, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ. ৭৩

> যে মানবসম্পর্কে নেতিবাচকতা সৃষ্টি করে - সেটির শিপ্রার চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে।[১৯]

'অতসীমামী' গল্পগ্রন্থের 'সর্পিল' গল্পেও বিকারগ্রস্ততার চিত্র আছে। একদা প্রগতিশীল বর্তমানে বিকারগ্রস্ত ধর্মোন্মাদ স্বামী শঙ্কর ; হাসি-খুশি, বন্ধুবৎসল আধুনিকা স্ত্রী কেতকী এবং কেতকীর বাল্যবন্ধু ও প্রেমিক অনন্তকে ঘিরে এই গল্পের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তিনটি চরিত্রই কমবেশি অবদমনের শিকার হলেও শঙ্করের অবদমন অনেক বেশি বলে সে পুরোপুরি বিকারগ্রস্ত।

শঙ্কর নিঃসন্দেহে স্ত্রীকে ভালোবাসে কিন্তু স্ত্রীর উপর বিশ্বাস বা আস্থা কোনটিই তার নেই। স্ত্রীকে সে ভালোবাসে বলেই সন্দেহ করে। কেতকী স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে চায় কিন্তু তার অবচেতন মনে অম্লান হয়ে আছে তার পূর্বপ্রেমিক একদা বাল্যবন্ধু অনন্ত। কেতকী হয়তো স্বামী শঙ্করকে নিয়েই আর দশজন নারীর মতো ঘর সংসার নিয়ে সুখী হতে চায় কিন্তু মনের গহন কোণে বিঁধে থাকা কাঁটার মতো অনন্তের স্মৃতি তাকে তার অজ্ঞাতসারেই অসুখী করে রাখে। সামন্ত মানসিকতায় আচ্ছন্ন শঙ্কর স্ত্রীকে বাগে আনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। শহরের আধুনিক জীবন, প্রগতিশীল মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে সে তার পৈতৃক বাড়িতে উঠে আসে এবং ধীরে ধীরে রক্ষণশীল ধর্মোন্মাদে পরিণত হয়। স্ত্রীকে বশে আনতে না পারার কারণেই তার জীবনে এই বিপর্যয় ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়, স্ত্রীর বাল্যবন্ধু ও প্রেমিক অনন্তের প্রতি প্রবল ঈর্ষাই তাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। ফ্রয়েডের মতে অবদমন মানুষকে ধীরে ধীরে বিকারগ্রস্ত করে তোলে। এ গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্রই অবদমনে ভুগেছে বলে তারা হয়ে উঠেছে একান্তভাবে ফ্রয়েডীয় চরিত্র।

অনন্তের পূর্ণ পরিচয় লেখক আমাদের জানান নি। সে কেতকীর বাল্যবন্ধু, তবে কেতকীর সাথে তার সম্পর্ক কেবল বন্ধুত্বের না কী তার সাথে মিশে আছে প্রেমের সম্পর্ক — এ নিয়ে সমালোচকেরা একমত হতে পারেন নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্তকে কেতকীর 'প্রণয়ী'

---

১৯. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫

হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[২০] , গোপিকানাথ রায়চৌধুরী পরপুরুষ অনন্তের প্রতি বিবাহিত জীবনে অতৃপ্ত কেতকীর আসক্তি লক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> সর্পিল গল্পে ধর্মোন্মাদ শঙ্করের অতৃপ্ত স্ত্রী কেতকী 'পরপুরুষ' অনন্তের প্রতি আসক্ত হয়। ... কেতকীর নির্ভীক, নিঃসঙ্কোচ যৌনচেতনা শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনে আতঙ্কজনক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। লেখক নিপুণ বিশ্লেষণী ও বর্ণনাশক্তির সাহায্যে যৌনবিকৃতির সেই জটিল মনস্তত্ত্বকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।[২১]

সৈয়দ আজিজুল হক গোপীকানাথ রায়চৌধুরীর মূল্যায়নকে 'পুরোপুরি সত্যের নিকটবর্তী নয়'[২২] বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এ গল্পে অনন্ত কেতকীর নিকট 'পরপুরুষ' নয়। যে তার বাল্যবন্ধু। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আসক্তির নয়, বরং স্নেহ-প্রীতির। আসক্তির কোন আভাস গল্পে কোনভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকলে তা শংকরের অনাধুনিক সন্দেহগ্রস্ত মনের ভাবনামাত্র, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। যৌনবিকৃত কোন চিত্র বা আভাসও গল্পের অভ্যন্তরে সহজলভ্য নয়।[২৩]

সৈয়দ আজিজুল হকের এ মত আমরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। অনন্ত কেবল কেতকীর বাল্যবন্ধু নয় প্রেমিকও বটে। কেতকী ও অনন্ত পরস্পর পরস্পরকে কামনা করে — এমন অনেক প্রমাণ এ গল্পে মিলবে। তিন বছর জাপান কাটিয়ে কেতকীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে বর্ণনা করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

> নিবিষ্ট চিত্তে মন্দির দেখিবার ফাঁকে কখন কেতকী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল অনন্ত টের পায় নাই। কেতকী কথা বলিতে সে একটু চমকিয়া উঠিল।
>
> তিন বছর পরে তুমি এলে —

---

২০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৭

২১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩২৭

২২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

২৩. ঐ, পৃ. ৮৩

অনন্তের চমক লক্ষ্য করিয়া কেতকী হাসিয়া কথাটা শেষ করিল, — আর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছ মন্দির!

অনন্তও হাসিল। বলিল, অভ্যর্থনা করার জন্য তুমি দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে রাগ হয়েছিল। কেতকী বলিল, দাঁড়িয়ে থাকতাম, কিন্তু তুমি এত আগে এসে পড়বে ভাবিনি। এখানে পৌছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

ভালো ভালো খাবার ঘুষ পেয়ে বেহারারা উড়ে এসেছে। অত খাবার পাঠিয়েছিল কেন বলো তো?

বলিয়া অনন্ত হাসিতে লাগিল। কেতকী বলিল, বিলিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, নিজে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলে তো?

নিয়েছিলাম। আর খেতে খেতে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমি কী খেতে ভালোবাসতাম সব তোমার মনে রইল কী করে! লেবুর শরবতটি পর্যন্ত তো ভোলনি?

কেতকীর মুখের পাশে রোদ পড়িয়াছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, যেন কত জন্ম কেটে গেছে, ভোলাই উচিত! তিন বছরেই মানুষের স্মৃতি লোপ হয় এই বুঝি তোমার ধারণা? কী করে চিনলাম ভেবে তো কই আশ্চর্য হলে না?

অবিকল এমনিভাবে কেতকী হাসিত, এমনি ভঙ্গিতে কথা কহিত, প্রত্যেকটি বাক্য তাহার এমন রসাত্মক লাগিত যেন এক একটি সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র কাব্য।[২৪]

এ প্রতীক্ষাকে বাল্যবন্ধুর জন্য প্রতীক্ষা বলা সংগত হবে না — এ প্রতীক্ষা প্রাক্তন প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার।

অনন্তের জাপান যাওয়ার আগের রাতে শঙ্কর প্রবল ঈর্যার আগুনে দগ্ধ হয়। অতিমাত্রার অবদমন তাকে শারীরিকভাবে অসুস্থ করে তোলে। "স্ত্রী কেতকীর বন্ধু-পরিবৃত আধুনিক জীবন

---

২৪. সর্পিল, *অতসীমামী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

পদ্ধতি শংকরের মস্তিষ্ক ও রক্তকোষের অণু-পরমাণুতে ঈর্ষার আগুন প্রজ্বলিত করে তার বিকারকে দেয় উস্কে। কেতকীর বাল্যবন্ধু অনন্তের জাপান-যাত্রার পূর্বরাত্রে প্রথম এই বিকার শংকরের 'মাথার মধ্যে ভূমিকম্প' রূপে প্রকাশিত হয়। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, আসন্ন বিরহচিন্তায় কেতকী-অনন্তের অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা প্রকাশ শংকরের সামন্ত-সংস্কার লালিত মনে হয়ত অসহ্য ঠেকেছিল।"[২৫] এই অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতার প্রকাশ তাদের অন্তরশায়িত ভালোবাসারই মূর্ত প্রকাশ। অতীতচিত্রণরীতিতে মানিক ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে কেতকী?
>
> কোন রাত্রির কথা?
>
> শঙ্করের অসুখ হয়েছিল বিছানার দু পাশে বসে আমরা রাত জেগেছিলাম?
>
> পড়ে বৈকি মনে। সে অসুখ তো আর ভালো হল না। দুমাস ছটফট করে পাগলের মতো এখানে ছুটে এল। পরদিন তোমার জাপান যাবার কথা ছিল।
>
> অনন্ত চিন্তিতভাবে বলিল, হ্যাঁ। শঙ্কর ঘুমোলে বিদায় দিতে তুমি আমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসেছিলে। কী সব অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে চিঠি লিখতে বারণ করেছিলে এখনও স্পষ্ট মনে আছে কেতকী। বাকি রাতটুকু শঙ্কর ঘুমিয়েছিল?
>
> এতদিন পরে কী প্রশ্ন!
>
> মাথা নাড়িয়া কেতকী বলিল, না। ফিরে গিয়ে দেখি বিছানায় উঠে বসে নিজেই কপালে বরফ ঘষছে।
>
> খুব ধীরে ধীরে হাঁটিলেও এতক্ষণে তারা ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল।
>
> অনন্ত গলা নামাইয়া বলিল, সেদিন হঠাৎ ওর কী হয়েছিল আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেতকী।
>
> কেতকী বলিল, মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছিল।[২৬]

---

২৫. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

২৬. *সর্পিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪ - ৪৬৫

গত তিন বছরে কেতকীর গায়ের রঙ মলিন হয়ে গেছে, দেহের গড়ন ভেঙে গেছে, মুখে লাবণ্যের রেশ নেই, চোখ দুটি নিষ্প্রভ। তার উপর অতিরিক্ত হারে চুল পড়ায় কেতকী শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। কেতকীর এ দুর্দশা মানিক লক্ষ করেছেন অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রেমিকসুলভ ভালোবাসায় তার মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। লেখকের বর্ণনা :

> কেতকীর চুলে যে মড়ক লাগিয়াছে খানিক আগে অনন্ত তাহা লক্ষ করিয়াছিল। কী আগুন জ্বলিতেছে ওর মাথায় কে জানে? তালু কতখানি তপ্ত হইয়া ওঠায় চুল ঝরিয়া পড়িতেছে, ওর মাথায় হাত দিয়া তাহা অনুভব করিবার জন্য হঠাৎ একসময় অনন্তর মন কেমন করিয়া ওঠে। কিশোর বয়সে কেতকী একদিন তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল। অনেক দিনের কথা। কেন প্রণাম করিয়াছিল আজ মনে পড়ে না, বোধ হয় কোনো কারণ ছিল না। আশীর্বাদ করিতে সেদিন যে খেয়াল থাকে নাই, সেকথাটা স্পষ্টই মনে পড়ে। বিদায় নেওয়ার সময় এবার যদি কেতকী প্রণাম করে — অকারণেই প্রণাম করে — প্রণাম করিতে হয় বলিয়া নয়, — মাথায় হাত রাখিয়া সে আশীর্বাদ করিবে।
>
> কিন্তু কী বলিয়া আশীর্বাদ করিবে?
>
> ইহার কল্যাণের কোন পথটা আজ খোলা আছে? মনে মনেও কোনো আশীর্বচন উচ্চারণ করিলে আজ ব্যঙ্গের মতো শোনাইবে না?[২৭]

বিকারগ্রস্ত, ঈর্ষাবিদ্ধ স্বামী শঙ্কর পার্টির দিন কেতকীকে যখন শিকলবদ্ধ ঘরে আটকে রাখে তখন জাপান প্রবাসী প্রেমিকপুরুষ অনন্তের কাছে ছুটে গিয়ে পালিয়ে বাঁচার জন্য কেতকীর মন কেঁদে উঠেছিল :

> এখানে আসবার আগে আমি একটা পার্টি দিয়েছিলাম। একটা কথা শোনো বলে আমায় তেতলার সেই ছোটো ঘরে ডেকে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই আমার প্রথম শাস্তি পরে আর কাঁদিনি, সেদিন কেঁদেছিলাম, আর ভেবেছিলাম জাপান কতদূর?

---

২৭. *সর্পিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, বসো কেতকী। বসে বলো।[২৮]

রাতে কাছারি-বাড়িতে অনন্তর শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অনন্ত কেতকীর কাছাকাছি থাকতে চায়। কেতকীরও রয়েছে মৌন সম্মতি। গল্প বর্ণনার এ পর্যায়ে মানিক তাদের যে সংলাপ ও অভিব্যক্তি নির্মাণ করেছেন, তা স্পষ্টতই প্রেমিকযুগলের মতো :

> অনন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, খেয়ে নিয়ে তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও। কাছারি-বাড়িতে এরা তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।
>
> অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? এখানে শোবার ঘর নেই?
>
> আছে। কিন্তু তুমি যাও। এই ভাঙা বাড়িতে রাত কাটাবে কোন দুঃখে?
>
> কেতকীর পাংশু-মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল, বেচারিরা ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাইছে, দরকার না থাকলে ওদের ছুটি দাও কেতকী।
>
> তুমি যাবে না?
>
> তুমি যদি যাও, যেতে পারি। যাবে?
>
> কেতকী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা তোমরা যাও ঠাকুর।[২৯]

ভাঙা দেউলে নীড় বাঁধার দরকার হলো কেন, কার শান্তির জন্য এ ব্যবস্থা — এ প্রশ্নের উত্তরে কেতকীর জবাব 'স্বামীর শান্তিতেই স্ত্রীর শান্তি।' কেতকীর এ উক্তির সত্যাসত্য সম্পর্কে লেখক পাঠককে জানান 'এ কথার সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন'। ঝড়ের রাতে ভয় পেয়ে কেতকী মন্দিরে ছুটে যায়। অদূরে উপসনারত স্বামীর উপস্থিতিতেই কেতকী অনন্তের জামার হাতায় টান দিয়ে বলে 'চলো এসো। আমার ভয় করছে।' স্বামীর কাছে অভয় বা আশ্রয় প্রার্থনার কথা কেতকীর মনে আসে নি; অথচ স্বামী অদূরেই উপস্থিত ছিল। বস্তুত কেতকীর

---

২৮. *সর্পিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮
২৯. ঐ, পৃ. ৪৬৯

মনোজগত পূর্বাপর আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো অনন্ত। এ অনন্ত কেবল তার বাল্যবন্ধু নয়, প্রাক্তনপ্রেমিকও বটে।

সুতরাং শঙ্করের ঈর্ষা অমূলক নয়। স্ত্রীকে বশে আনতে না পেরে সে প্রবল অবদমনে ভোগে যা তাকে শেষ পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক অনন্তর সহসা আবির্ভাব শঙ্কর তাই সহজভাবে নিতে পারে না। তিন বছর পর তাদের পুনরায় সাক্ষাতের দৃশ্য নির্মাণ করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বর্ণনা করেন :

> খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া এক প্রান্তে কার্পেটের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে স্বয়ং শঙ্কর। ছোটো করিয়া চুল ছাঁটিয়া মাথার পিছনে সে স্থূল শিখা রাখিয়াছে, কপালে আঁকিয়াছে রক্তচন্দনের স্বস্তিক।
>
> কে, অনন্ত? বলিযা সে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেল। বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিল, কিন্তু আসবে আশা করিনি। তারা! তারা! কত অদ্ভুত ঘটনাই তোমার পৃথিবীতে ঘটে!
>
> কী অভ্যর্থনা! অনন্ত হতবাক হইয়া গেল।
>
> কেতকী বলিল, আমি ওকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম।
>
> বেশ করেছিলে, কিন্তু কথাটা সময়মতো আমায় জানানো বুঝি তুমি উচিত বিবেচনা করনি?
>
> স্বামীর অসম্ভব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেতকী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না। সময়মতো জানালে তুমি ওকে আসতে বারণ করতে।
>
> শঙ্কর একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। তারা! তারা! তোমার সন্তানকে সবাই কী ভুলই বোঝে মা! আসতে বারণ করতাম না কেতকী। অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমিও সাদর আহ্বান জানাতাম।[৩০]

---

৩০. *সর্পিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৫

স্বামী ও প্রেমিকের মাঝে দোলাচলবৃত্তির ফলে কেতকীর মনোজগতেও নেমে এসেছিল নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। এ পর্যায়ে কেতকীর অবদমন লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে তার মনের মধ্যে পাক খায় শৃঙ্খলাহীন অবাস্তব চিন্তা :

> একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।
>
> পুবের জানালার শিক ধরিয়া কেতকী বহুক্ষণ নিশ্চল নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে গ্রামের ভিতর দিয়া এখানে আসিতে হইয়াছিল তার চেয়ে কাছে বোধ হয় অন্য গ্রাম আছে, অনেকগুলি কুকুরের ডাক অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বিকালে যে ঠাণ্ডা বাতাসটি বহিতেছিল হঠাৎ কখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে খেয়ার থাকে না। মনের মধ্যে শুধু পাক খায় শৃঙ্খলাহীন অবাস্তব চিন্তা।[৩১]

গল্পের শেষে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে কেতকী ও অনন্তের মৃত্যু ঘটলে শঙ্কর তাই ভাবলেশহীনভাবে তাদের মৃত্যুদেহের উপর ঝুড়িঝুড়ি ইট এনে ফেলতে থাকে। বিকারগ্রস্ত, প্রায় উন্মাদ, ঈর্ষান্ধ শঙ্করের মানসিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মানিক বলেন :

> দেহ দুটিকে সে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি যে শয্যায় ইহারা পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছে অনন্তকাল সেই শয্যাতেই ইহারা ঘুমাইয়া থাক, শঙ্করের আপত্তি নাই। কিন্তু কেহ যেন না জানে।[৩২]

'সর্পিল' গল্প সম্পর্কে দিলীপ মালাকার বলেছেন :

> সর্পিলে প্রেমের পরিণতি এক বীভৎস রসে সমাপ্ত। কেতকী আর তার প্রেমিকের অনাবিল ভালবাসার ওপর চরম আঘাত হানলো শংকর। অথচ এই শংকরকে ভিলেন বলতেও আমাদের বাধে।[৩৩]

রহমান হাবিবের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

---

৩১. *সর্পিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

৩২. ঐ, পৃ. ৪৭৪

৩৩. বিবিধ সমালোচনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

> শংকরের স্ত্রী কেতকী আধুনিকা হলেও এবং তার বাল্যবন্ধু অনন্তর প্রতি তার সম্প্রীতিবোধ থাকলেও; তাদের সম্পর্কটি কিন্তু রিরংসা কলঙ্কিত নয়। কেতকীর স্বামী শংকরের বিকারগ্রস্ততা এজন্যই প্রকট ও অমানবিক হয়ে উঠেছে বলা যায়; কারণ অনন্তর প্রতি কেতকীর সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা তাকে ঈর্ষার আগুনে প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত করেছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তরক্তের অহংকার তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে কেতকীর প্রতি আরো নির্মম ও বিকারগ্রস্ত করে তোলে। ঈর্ষার এবং সামন্ত প্রভুত্বময়তার সম্পর্কায়নে শংকর চরিত্রটি মানব সম্পর্কের নেতিবাচকতার তুঙ্গে উঠে গেছে– এ গল্পে।[৩৪]

প্রাগৈতিহাসিক গল্পের চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা সংস্থান তথা গল্পবয়ন ও গল্পের জীবনদর্শন একান্ত ভাবেই ফ্রয়েডীয় জীবন ব্যাখ্যার সঙ্গে একান্তভাবে সংগতিপূর্ণ। সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন : ভিখুর জীবন পরিণতিকে ফ্রয়েডীয় চেতনার সমান্তরালে বিন্যাস করা হয়েছে। ভিখু চরিত্র পরিকল্পনার মূলে ফ্রয়েডীয় ভাবাদর্শ অনেকাংশে সক্রিয়।[৩৫] তাঁর ভাষায় :

> এ-গল্পে জীবনের এমন নিগূঢ় সত্য উন্মোচিত হয়েছে যাতে মানবপ্রবৃত্তির দুটি মৌল প্রান্ত — ইন্দ্রিয়-আবেগ ও উদর তাড়না — পাঠকের দৃষ্টিসীমায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখুর জীবনগতির অনিবার্য উপাদানরূপে প্রাধান্য অর্জন করে এ দুটি মৌল প্রবৃত্তি। তবে গল্পের সমাপ্তিতে ভিখুর জীবনপ্রেরণার উৎস আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। গল্পশেষে উচ্চারিত জীবনদর্শন এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের দিকে আমাদের অঙ্গুলিনির্দেশ করে — যেখানে যৌবনাবেগই মুখ্য হয়ে ওঠে মানবজীবনশক্তির মূলসুর হিসেবে।[৩৬]

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের এরস্ (Eros) বা জীবনমুখী শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে — আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (Self preservation) এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি

---

৩৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৩৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৩৬. ঐ, পৃ. ৯২

(Reproduction)। আমরা যত রকম কাজই করি না কেন, তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়। এই এরস্‌কে ফ্রয়েড লিবিডোও (libido) বলেছেন। লিবিডো হচ্ছে কাম তাড়না। নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে রয়েছে লিবিডো, লিবিডোর মূলে রয়েছে বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্য, আর বংশবৃদ্ধির মূলে রয়েছে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। এভাবেই এরস্‌ জীবনকে সামনের দিকে নিয়ে যায়।[৩৭]

ফ্রয়েডের মতে : মনের স্তর তিনটি — Id, Ego এবং Super Ego। Id অন্ধ, বন্য, পাশব কামনা-বাসনার জাগায়। Id-এর কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই। সে কেবল তার দাবি পূরণের জন্য প্রবল ঊর্ধ্বচাপ দেয়। এটিই libido। এটি নিমজ্জমান রয়েছে মানুষের অবচেতন মনে। Id এর তাড়না অত্যন্ত প্রবল এবং সাধারণত অপ্রতিরোধ্য। Id কোন নৈতিকতা বা সামাজিক অনুশাসনের ধার ধারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প প্রাগৈতিহাসিক-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু একান্তভাবেই Id চালিত, libido তাড়িত চরিত্র। ভিখু চরিত্রে আদিম অসভ্য জীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সে বাঘের বসবাসের অযোগ্য বনে বর্শাবিদ্ধ জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় ক্ষুধা তৃষ্ণা, পোকামাড়ক, মশামাছি, পিঁপড়া-জোঁক-সাপ-শেয়ালের অত্যাচার উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে। তার জীবনসংগ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক বিস্তারিত ভাবেই :

ক. বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোনো না কোনো অংশ হইতে ঘন্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সংকীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভ্যাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চারদিনের মতো চিড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে

---

৩৭. সুনীল কুমার সরকার, ফ্রয়েড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৫

লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনও মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।[৩৮]

খ. মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দুঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু-একঘণ্টা অন্ত রই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল। মরিবেনা। সে কিছুতেই মারিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।[৩৯]

গ. ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসিটা এক সময় নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে

---

৩৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, *প্রাগৈতিহাসিক*, মানিক রচনাবলি, (২য় খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৫৭

৩৯. ঐ, পৃ. ২৫৮

আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।[৪০]

এক পর্যায়ে ভিখুর একসময়ের সহযোগী পেহ্লাদ ভিখুকে বন থেকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। ঘরের মাচার উপর খড় বিছিয়ে শয্যা তৈরি করে তাকে শুইয়ে রাখে। আর এমনি শক্তপ্রাণ ভিখুর যে এই আশ্রয়টুকু পেয়েই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনাযত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটিয়ে সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করে ফেলল। কিন্তু তার ডান হাতটি ভালো হলো না। বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে ডান-কাঁধেই সে বর্শার প্রবল আঘাত পেয়েছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা ভাঙা পুলটার নিচে পৌঁছে অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবিয়ে শরবনের মধ্যে সে লুকিয়ে ছিলো। পরের রাত্রে আরো নয় ক্রোশ পথ হেঁটে সহযোগী ডাকাত পেহ্লাদ বাগদির বাড়িতে গিয়ে সে উপস্থিত হয় এবং আশ্রয় প্রার্থনা করে। পেহ্লাদ তাকে বাড়িয়ে আশ্রয় না দিলেও পাঁচ মাইল দূরবর্তী বনের দুর্গম অংশে বাঁশ কেটে মাচা বানিয়ে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে পেহ্লাদ তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এখানেই সুস্থ হয়ে ওঠে ভিখু যদিও ডান হাতটি গাছের মরা ডালের মতো শুকিয়ে গিয়ে অবশ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

পঙ্গুত্ব বরণ করে বেঁচে ওঠার পর শুরু হয় ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। যে পেহ্লাদ তাকে বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে আশ্রয় দিয়েছিল, একদিন সন্ধ্যার সময় ভিখু যৌনবাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীর হাত চেপে ধরে। কিন্তু পেহ্লাদের বউ বাগদির মেয়ে দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাকে আয়ত্ত করা ভিখুর পক্ষে সহজ ছিল না। পেহ্লাদের স্ত্রী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে গাল দিতে দিতে চলে গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরলে সে তাকে সব বলে দেয়। রাগে উন্মত্ত হয়ে পেহ্লাদ ও তার ভগ্নিপতি ভরত দুজনে মিলে ভিখুকে মারতে মারতে আধমরা করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ভিখুর শুকিয়ে আসা ঘা ফেটে রক্ত পড়ছিল। হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে ধুঁকতে ধুঁকতে ভিখু চলে যায়। Id-এর তাড়নায় — প্রবল প্রতিহিংসায়

৪০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত ভিখু মাঝ রাতে এসে পেহ্লাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর একটা জেলে ডিঙি চুরি করে সে চিতলপুর ছেড়ে সারা রাত নৌকা বেয়ে বিশ-ত্রিশ মাইল দূরে মহকুমা শহরে দিয়ে উপস্থিত হয় এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। ডাকাত ভিখুর ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ মূলত তার জীবনসংগ্রামেরই বহির্প্রকাশ। ভিখারি জীবনেও ভিখু লিবিডোতাড়িত, প্রবল কামজর্জর ব্যক্তি। লেখক বর্ণনা করেন :

> নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।
>
> রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।
>
> নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনা-বহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।[৪১]

নারীসঙ্গহীন একাকী শয্যায় ছটফট করতে গিয়ে তার মনে পড়ে অতীতের নারীসঙ্গ উপভোগের কিছু উদ্দাম স্মৃতি — রাখু বাগদির সঙ্গে শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটিকে সে চুরি করেছিল ... রাখুর বউকে নিয়ে নোয়াখালি হয়ে সমুদ্র ডিঙিয়ে পাড়ি দিয়েছিল একেবারে হাতিয়ায় ... মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতচিত্রণরীতি অবলম্বন করে ভিখুর এসব স্মৃতিচারণের যথার্থ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নিচে বসে ভিখু ভিক্ষা করে। দৈনিক তার রোজগার পাঁচ-ছ আনা, কোনদিন আট আনার কাছাকাছি, হাটবার এক টাকার নিচে নামে না। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সচ্ছল হয়ে উঠলে বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশের ভাঙা চালাটা মাসিক আট আনায় সে ভাড়া করে। বাজারে ঢোকবার মুখেই অল্পবয়সী ভিখারিণী পাঁচী ভিক্ষা করতে বসে। বয়স তার বেশি নয়। দেহের বাঁধনিও বেশ আছে। শুধু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তার থকথকে তৈলাক্ত ঘা। পাঁচীর প্রতি ভিখু আদিম আগ্রহ অনুভব করে। সে উপলক্ষ ছাড়াই বিভিন্ন উসিলায় পাঁচীর কাছে যায়, তার সাথে

---

৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে পাঁচীকে সে নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব দেয়। পাঁচীও কম সেয়ানা নয়। পাঁচী ও ভিখুর কথোপকথন বেশ উপভোগ্য :

ক. ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, ঘা-টি সারবো না, লয়?

ভিখারিণী বলে, খুব! অসুদ দিলে অখনি সারে।

ভিখু সাগ্রহে বলে, সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা-টি সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না, — জানস্? আমি তোরে রাখুম।

আমি থাকলি ত।

ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পাটি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই কিয়ের লেগে?

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা-টি মুই তখন পামু কোয়ানে?

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিণী কোনো মতেই রাজি হয় না। ভিখু ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসে।[৪২]

খ. একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনীর কাছে যায়। বলে, আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।

ভিখারিণী বলে — আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।

ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কী?

তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আসি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।[৪৩]

গ. উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমর কাছে চ।

---

৪২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৪৩. ঐ, পৃ. ২৬২-২৬৩

ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মতো কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নাইলে গাল দিমু কইলাম।

ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, তোর নামটা কির‍্যা?[৪৪]

ঘ. ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

ফের লাগতে আইছস্? হোই ও বুড়ির কাছে যা। ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে, খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে, — পাঁচী। তুই কলা দিছস, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।[৪৫]

পাঁচীকে ফেলে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ভিখুর মন সায় দেয় না। নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে ভিখুর অন্তর্জগত নির্মাণ করতে গিয়ে লেখক বলেন :

তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার

---

৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
৪৫. ঐ, পৃ. ২৬৩

> মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।[৪৬]

এরপর ভিখু কর্তৃক বসিরহত্যা গল্পের পরিণতির জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পাঁচী ভিখুর মতোই প্রবল জীবনসংগ্রামী, বাস্তববাদী ও লিবিডোতাড়িত নারী। পুরুষসঙ্গ তারও প্রয়োজন। সে ভিখু হোক বা বসির হোক তাতে তার কিছু আসে যায় না। তবে সে যে বসিরকে বেছে নেয়, তার কারণ বসিরের আর্থিক সংগতি বেশি। গল্পের শেষে ভিখু যখন বসিরকে হত্যা করে পাঁচীকে নিয়ে পালিয়ে যায়, তখন দেখা যায় : একদা সঙ্গী মৃত বসিরের জন্য তার কোন মায়া মমতা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় সে যে আঁতকে ওঠে, সেটা তার নিজের অমঙ্গল আশঙ্কায় — বসিরের হত্যাকাণ্ড দর্শনে নয়। গল্পের পরিণতিতে সে তাই নির্বিকারভাবে বসিরের সঞ্চিত টাকা ভিখুর হাতে তুলে দিয়ে তার কাঁধে চেপে বসে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে আদিম পুরুষপ্রকৃতির মতো পাঁচীও যথোপযুক্ত আদিম নারী প্রকৃতি। সভ্যতার আলো থেকে দুজনেই তারা বঞ্চিত। লেখকের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।[৪৭]

ভিখু চরিত্রে ফ্রয়েডীয় প্রভাব অস্বীকার না করেও সৈয়দ আজিজুল হক ভিখুর জীবনসত্যকে মানব জীবনের সমগ্র সত্য হিসেবে গ্রহণ করা অযৌক্তিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর

---

৪৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪

৪৭. ঐ, পৃ. ২৬৬

বিবেচনায় ভিখু সমগ্র মানবসত্তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নয়।[৪৮] তাঁর মতের সাথে আমরা একমত হতে পারি নি। ভিখু ও পাঁচী হয়তো অন্ধকার জগতের আদিম মানুষ, তাই তাদের Id Super ego-র সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। তাদের মনোজগত ও আচরণ উলঙ্গ বলে দৃষ্টিকটু। তারা কোনো অবদমনে ভোগে না — আলোকিত জগতের সাধারণ মানুষেরা যেমন ভোগে। 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে আলোকিত জগতের মানুষ বলে Super ego-র নিম্নচাপে অনিন্দিতা তাই শিপ্রাকে ডুবিয়ে মারে না — যদিও তার Id ডুবিয়ে মারার জন্য সদা প্রস্তুত; 'সর্পিল' গল্পে আলোকিত জগতের মানুষ বলে অনন্ত কেতকীকে নিয়ে পালিয়ে যায় না, কেতকীও জীবনসঙ্গী হিসেবে অনন্তকে গ্রহণ করে না। যদিও অনন্ত এবং কেতকীর পরস্পরের জন্য ভালোবাসাময় নীড় রচনার স্বপ্ন তাদের অবচেতন মনে আছে। আলোকিত জগতের মানুষ বলে Super ego-র চাপে অনিন্দিতা, কেতকী ও অনন্ত সভ্য, মার্জিত আচরণ করে। অন্ধকার জগতের মানুষ বলে ভিখুর কোনো Super ego-র নিম্নচাপ নেই। তাই তার উলঙ্গ Id সুস্পষ্ট। বস্তুত ভিখু ও পাঁচীর সাথে অনিন্দিতা, কেতকী ও অনন্তের কোন প্রভেদ নেই। গোপাল হালদার স্পষ্ট করেই বলেন : শত সত্ত্বেও কেউ অস্বীকার করতে পারব না যে, এ প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা আমাদের গহন মনের কোনো গহ্বরে লুক্কায়িত নেই।[৪৯] উদরের ক্ষুধা ও যৌন প্রয়োজনই যেখানে মানুষকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে অন্য কোন মহত্তর মূল্যবোধের প্রয়োজন কতটুকু — অস্তিত্বের সেই নিদারুণ কঠিন প্রশ্ন যেন উচ্চারিত হয়েছে গল্পটির মধ্য দিয়ে ... [৫০] ভিখুর জীবনে সভ্যতার আলো পড়ে নি তাই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে তার উত্থান ও বিলয়[৫১] ।

এ গল্প সম্পর্কে সরোজমোহন মিত্রের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

এই অন্ধকার হইল মানুষের আদিম জৈবিকবৃত্তি। লেখকের মতে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাহার উপর অনেক প্রলেপ পড়িয়াছে। কিন্তু তার মধ্যকার যে যৌনবৃত্তি তাহার কোন

৪৮. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৪৯. *মানিক বিচিত্রা*, বিশ্বনাথ দে (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৫৭

৫০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১০

৫১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৩৭

পরিবর্তন হয় নাই। বরং অবদমিত অবস্থায় তাহা সুস্থ প্রাণধর্মকে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে।[৫২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত :

> শেষের মাত্র দুটি অনুচ্ছেদ একটি নিশ্চিত আখ্যায়িকা এই বিশাল ব্যঞ্জনায় মুক্তি পেলো; ভিখুর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং শেষ পরিণতি একটি প্রতীতির সমগ্রতা লাভ করল; ভিখুর হাতে বসিরের দানবিক হত্যাকাণ্ড জৈব-কামনার একতম 'মহামুহূর্ত' রূপায়িত হল এবং বৈজ্ঞানিক জীবন-সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণভাবে এতে ধরা দিল।[৫৩]

আহমদ রফিকের মন্তব্য :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটিতেও মানব-অস্তিত্বের একটি চিরন্তন সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। ঘটেছে গল্পশেষের পঙ্‌ক্তিমালার ব্যঞ্জনাধর্মী কারুকুশলতার নির্মাণে। মানব অস্তিত্ব তথা মানব সভ্যতার দুটি প্রাথমিক বৃত্তি অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশরক্ষার চেষ্টা; আর এই দ্বিতীয়ের সাথে জড়ানো আদিম যৌন প্রবৃত্তি, সেখানে আবার অন্ধ-গহ্বরে প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ।[৫৪]

উত্তরকালের গবেষক আনন্দ ঘোষ হাজারাও 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ফ্রয়েডীয় মৌল অবচেতনের যৌনতাবোধ লক্ষ করেছেন।[৫৫]

'প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু চরিত্রের সাথে 'চোর' গল্পের মধু ঘোষের মিল ও অমিল দুটোই রয়েছে। মিল এই যে তারা দুজনই অন্ধকার জগতের মানুষ — ভিখু ডাকাত ও ভিখারি, মধু

---

৫২. *ছোটগল্পের বিচিত্র কথা*, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ২১১

৫৩. *সাহিত্যে ছোটগল্প*, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৩৩৫

৫৪. *ছোটগল্পের শিল্পরূপ পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩

৫৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৯

ঘোষ পেশায় মূলত চোর। স্বার্থ ছাড়া জগতে সে আর কিছুই বোঝে না। তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> বৈধ উপায়ে আজ পর্যন্ত সে একটি পয়সাও উপার্জন করেছে কি না সন্দেহ। গোপন ও প্রকাশ্য যত প্রকার উপায়ে তাহার অনিয়মিত আয় হয় তার সবগুলিই নীতিবিগর্হিত। কিন্তু কোনোরকম নীতির ধার মধু ধারে না। পয়সার জন্য সে করিতে পারে না জগতে এমন কাজ নাই। সে শিশুর গলার হার ছিনাইয়া লইয়াছে, মেলায় জুয়াড়ি সাজিয়া দরিদ্র চাষার উপার্জনে ভাগ বসাইয়াছে, পকেট মারিয়াছে, দূর গ্রামে গিয়া পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়াছে। কোমরে ল্যাঙট আঁটিয়া সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া মাঝে মাঝে গৃহস্থের ভিটায় সিঁদও সে দিয়াছে। দেহে শক্তি ও মনে সাহস থাকিলে বোধ হয় ডাকাতি করিতেও সে ছাড়িত না।[৫৬]

ভিখুর সাথে তার প্রধান অমিল এখানে যে, ভিখু চরিত্রে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই কিন্তু মধুর চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। ভিখু একেবারেই অন্ধকার জগতের আদিম মানুষ, তার উপর সভ্যতার কোন আলো পড়ে নি। সে তুলনায় মধু ঘোষের মনোজগতে গাঢ় অন্ধকারের পাশাপাশি কিছুটা আলো ছায়ার খেলা লক্ষ করা যায়। ভিখু যা করে সবই Id এর তাড়নায়, লিবিডোর প্রেরণায়। তার কোনো Super ego-র নিম্নচাপ নেই। মধু ঘোষের মধ্যে রয়েছে Id ও libido-র তাড়না তবু সে মাঝে মাঝে Super ego-র চাপে নৈতিক উৎকণ্ঠায় ভোগে।

মাসে দশ টাকা আর খাওয়াপরা দিলেই কুমোরপাড়ার সৌদামিনী তার সঙ্গে বাস করতে রাজি ছিল কিন্তু দুশো টাকা পণ দিয়ে কাদুকে সে বিয়ে করে ঘরে আনে। কাদুর রূপ তার চেতনালোককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ কারণে এতগুলো টাকা বেহাত হয়ে যাওয়ার জন্য মধু কখনো আপসোস করে নি। তার বিবেচনায় : কাদুর রূপ ও গুণের তুলনায় ও টাকা কিছুই নয়। হাতে টাকা থাকায় কাদুকে ঘরে এনে বছরখানেক সে সুখেই দিন কাটিয়েছে। এই এক

---

৫৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চোর, *প্রাগৈতিহাসিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭-২৬৮

বছরের মধ্যে উপার্জনের জন্য মধু একেবারেই মাথা ঘামায় নি। কাদুময় জগতে কাদুর নেশায় বিভোর হয়ে মধু অলস অকর্মণ্য জীবনযাপন করেছে। তারপর টাকার অভাবে প্রায়ই তারা কষ্ট পেয়েছে, কখনো দু-একবেলা পর্যন্ত উপবাস করতে হয়েছে কিন্তু কাদু কখনো অনুযোগ করে নি।

গল্প শুরুতেই কাদু চরিত্রের একটি পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি। মেয়ে বিয়ে দেবার জন্য গ্রামের বড়লোক রাখাল মিত্র অনেকগুলো নগদ টাকা বাড়িতে রেখেছিল। রাখালের বাড়িটা কাঁচা, টাকা রাখবার লোহার সিন্দুকও তার নেই। এই টাকাগুলো হাতিয়ে নেয়ার লোভ মধুকে উন্মত্ত করে তোলে। রাখাল মিত্র বাড়ি এলে তার স্ত্রী গৃহকর্মের সুবিধার জন্য একটা ঠিকা ঝির খোঁজ করে। ঘরের সন্ধান আনবার জন্য অনেক বলে কয়ে কাদুকে রাজি করিয়ে মধু তাকে রাখালের বাড়িতে কাজ করতে পাঠিয়েছিল। রাখালের বাড়ি কাজ করতে যাওয়ার পর থেকে কাদুর মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। লেখকের ভাষায় : 'কিন্তু সেই হইতে নিজেও সে যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে।'

কাদুর এই বদলে যাওয়ার ব্যাপারটি পাঠক পুরোপুরি বুঝতে পারে গল্পের শেষে। রাখালের বাড়িতে কাদু কাজ করতে গেলে রাখালের বড় ছেলে পান্নাবাবুর সাথে তার যৌন আসক্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠে যার দুর্নিবার আকর্ষণে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি থাকতে চায় এবং গল্প শেষে পান্নাবাবু নৌকায় করে কাদুকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আবেগহীন অভ্যাসের কারণে স্বামীকে আর ভাল লাগছিল না কাদুর। তাই অভ্যাসহীন আবেগের টানে পান্নাবাবুর প্রতি সে দুর্মর আকর্ষণ অনুভব করে। যে রাতে মধু রাখালের বাড়িতে চুরি করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই একই রাতে কাদুর পরিকল্পনা ছিল পান্নাবাবুর সাথে পালিয়ে যাওয়ার। চুরি করতে যাওয়ার সময় স্ত্রীর হাবভাব অভিব্যক্তি মধুর কাছে তাই অচেনা মনে হয়। লেখকের ভাষায় :

ক. ফুঁ দিয়া আলো নিবানোর সময় কাদুর আলোকোজ্জ্বল মুখখানি মধু একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, কাদুর মুখে একটা অপরিচিত ছায়া পড়িয়াছে।

প্রদীপের শিখার কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া গিয়া ফুঁ দেওয়ার আগে কাদু যেভাবে আড়চোখে তাহার দিকে চাহিল সে ভঙ্গিও মধুর কাছে অচেনা ঠেকিল।[৫৭]

খ. সবচেয়ে বেশি করিয়া মধুর মনে পড়িতে লাগিল এই কথা যে, কাদু জ্বরের ক-দিন ভালো করিয়া তাহার সেবা করে নাই, সময়মতো খাইতে দেয় নাই, না ডাকিলে কাছে আসে নাই। সর্বদা কি রকম অন্যমনস্ক থাকিয়াছে। একদিনের বেশি তাহার দাসীবৃত্তি করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু বিশেষ করিয়া বারণ করা সত্ত্বেও তাহাকে অসুস্থ রাখিয়া সে রাখালের বাড়ি কাজ করিতে চলিয়া গিয়াছে। কৈফিয়ত দিয়াছে, হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে লোকে সন্দ করবে যে!

সন্দ করবে, না করবে আমি বুঝব। তুই আর যাসনে কাদু।

এ মাসের ক-টা দিন যাই। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মানুষ কাজ ছেড়ে দেয় কী করে শুনি?

এমনি সব কথা যার অর্থ বুঝা যায় না।[৫৮]

গ. মধু স্থিরদৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া রহিল। কাদুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, একটা গোপন-করা চাঞ্চল্য এতক্ষণে সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। সে নিজে পাকা চোর, চোরের ভাবভঙ্গি তাহার অজানা নয়। কাদুর চোখে-মুখে চুরির উদ্দেশ্য সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, তোর ভাবখানা কি বল তো? ওরকম করছিস কেন?[৫৯]

চুরি করতে যাওয়ার পথে এবং রাখাল মিত্রের ঘরে ঢোকার পর অন্তত দুবারের জন্য মধুর মনে Id ও Super ego-র দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। আত্মগ্লানিতে সে যে রকম ভুগেছে তেমনি তার চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার যে মনোভাব জেগেছে তা ফ্রয়েডীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় বহন করে। লেখকের ভাষায় :

---

৫৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চোর, *প্রাগৈতিহাসিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

৫৮. ঐ, পৃ. ২৬৯

৫৯. ঐ, পৃ. ২৭১

ক. বহুকাল পরে আজ সে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাপপুণ্য ভালোমন্দের যে সংস্কার তাহার মরিয়া মরিয়া একেবারে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই যেন আবার আগের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। খালের ধারে ধারে খানিক দূরের পুলটার দিকে চলিতে চলিতে রত্নাকরের মতো সহসা মধু অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, এতকাল সে অতি ঘৃণ্য জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। অকথ্য কদর্য জীবন। পাপের তার সীমা নাই। নরকেও তাহার ঠাঁই হইবে না।[৬০]

খ. ফিরিয়া গিয়া নতুন করিয়া জীবন আরম্ভ করে। সংযত সুন্দর পচিত্র জীবন। ঈশ্বরকে আর কি ভক্তি করা যায় না? কাদুকে শেখানো যায় না লোভ করিতে নাই, নোংরা থাকিতে নাই, অবাধ্য হইতে নাই কলহ করিতে নাই? সোনার চুড়ির চেয়ে রুপার চুড়িতে সুখ বেশি এ কি কাদুকে বোঝানো যায় না? পরকালের কথা ভাবিয়া পরদ্রব্যে লোভ করা কি তাহারা দুইজনে বন্ধ করিতে পারে না? সে মজুর খাটিবে। গরু কিনিয়া দুধ বেচিবে। জমি কিনিয়া চাষ করিবে। না হয় গ্রামের মধ্যে মনিহারি দোকান দিবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া তাহারা মন্ত্র গ্রহণ করিবে। সকালে উঠিয়া দিনের দেবতাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিকার্জনের জন্য খাটিয়া সন্ধ্যার পর একাগ্রচিত্তে তাহারা মালা জপ করিবে। আস্তে কথা কহিতে শিখিবে। দুঃখে বিচলিত হইবে না। হৃদয়ের শান্তিতে সকল অবস্থায় শান্ত হইয়া থাকিবে। কাদুর একটি ছেলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে — কাদুরই অসাবধানতায়। এবার ছেলেমেয়ে হইলে বাঁচিবে। তাহাদের লইয়া সুখে তাহারা ঘরসংসার করিবে।

এতকাল সে তো চুরি করিয়াছে। চুরি করিয়া লাভ কোথায়?[৬১]

মধুর মন কীভাবে দ্বিধাশূন্য হয়ে ওঠে, তার কারণ মানিক ব্যাখ্যা না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এসব সামান্য ভাবাবেগে দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে কারো মুক্তি সম্ভব

৬০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চোর, *প্রাগৈতিহাসিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

৬১. ঐ, পৃ. ২৭৫

নয়।[৬২] মধু আত্মগ্লানিপীড়িত মন চৌর্যবৃত্তির কদর্য জীবন ত্যাগ করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে লগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বারবার দীপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত অভ্যাসের কাছে সে পরাজিত হয়।[৬৩] মধুর মনে Id-এর উর্ধ্বচাপই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। Ego 'বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ্‌দের মত অসৎ'[৬৪] বলে মধু শেষে নিজেকেই নিজে বোঝায় :

> চুরি করার মধ্যে আর সে দোষের কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে। কেউ করে আইন বাঁচাইয়া, কেউ আইন ভাঙে। স্বাধীনতার মূলধন লইয়া এ ব্যবসায় নামিতে যাহাদের সাহস নাই, চুরিকে পাপ বলে শুধু তাহারাই। পারিলে তাহারাও চুরি করিত। চোরের চেয়েও তাহারা অধম। তাহারা ভীরু কাপুরুষ।[৬৫]

চুরি করে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে এবং তার শাড়ি গয়না খুঁজে না পেয়ে এবং পান্নাবাবুর নৌকা কুমারপাড়ার ঘাট থেকে উধাও হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সরল সমীকরণ করে মধুও বুঝতে পারে স্ত্রী কাদু পান্নাবাবুর সাথেই পালিয়ে গেছে। লেখকের বর্ণনা :

> মধুর মনের উত্তেজিত আনন্দ সহসা নিঝুম হইয়া গেল। টাকা ও নোটে ভরা বালিশের খোলটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়িয়াছিল। সেদিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল আবার তাহার জ্বর আসিতেছে। সহসা মধু বীভৎস হাসি হাসিল। রাখালের ঘরের দিকে চলিবার সময় সে যুক্তি দিয়া নিজের চৌর্যবৃত্তিকে সে সমর্থন করিয়াছিল, সেই কথাটি হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।[৬৬]

---

৬২. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০০
৬৩. ঐ, পৃ. ৯৯-১০০
৬৪. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
৬৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চোর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩
৬৬. ঐ, পৃ. ২৭৬

রাখাল মিত্রের ঘরে চুরি করতে ঢুকে তার ঘুমন্ত সুন্দরী মেয়েকে দেখে মধু যে আদিম আবেগ অনুভব করে তা একান্তভাবেই লিবিডোতাড়িত। লেখকের দীর্ঘ বর্ণনা এখানে প্রণিধানযোগ্য :

ক. কিন্তু কাদুর হাতে রুপার চুড়ি। মেয়েটা সোনার চুড়ি পরিয়াছে। কাদুর মতো ও মোটাও নয়, এখনও দেহটি ওর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সময় পায় নাই। ক্ষীণ কটিতটে দেহরেখা ওর ধনুকের মতো বাঁকিয়া আছে। মুখখানা কচি। ফুলের মতন কোমল। কাদুর মুখের মতো পাকিয়া যায় নাই। গায়ের রং গোধূলির মতো মনোরম, প্রভাতের মতো উজ্জ্বল।[৬৭]

খ. রাখালের ঘুমন্ত মেয়েটার জন্য একটা প্রগাঢ় অস্থায়ী প্রেম অনুভব করিতে মধুর হৃদয় কোনো বাধাই পাইল না। হৃদয়ের এই আকস্মিক আবেগসঞ্চার তাহার নূতন নয়। গহনার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া এমনই আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস সে অনুভব করিয়াছে। দোকানের সুরক্ষিত গহনাগুলিকে দুর্লভ জানিয়া সে যেমন ব্যথা পাইয়াছে, আজ তাহার এই কলঙ্কিত নিশীথ-অভিযানের উগ্র ভয়কাতর উপলব্ধিগুলির মধ্যে আকাশের চাঁদের মতো দুষ্প্রাপ্য শিথিলবসনা মেয়েটির জন্য ক্ষণিকের নিড়ির ব্যর্থ প্রেমে তেমনই একটা বেদনা অনুভব করিল। তাহার সাধ হইল, মেয়েটিকে একবার সে স্পর্শ করে। পরম আগ্রহে কম্পিত ব্যাকুল বাহুতে কাদুর মতো ওকে একবার সজোরে বুকে চাপিয়ে ধরিয়া পলাইয়া যায়। টাকা দিয়া তাহার কাজ নাই।

স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত দেবতা হঠাৎ চোখ মেলিয়া অদূরে স্বর্গের ছবি দেখিলে যেমন করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে, মধুর বিকৃত মন নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটির একটু স্পর্শ লাভের জন্য তেমনইভাবে কাঁদিয়া উঠিল। মরুপথিকের সামনে এ যেন সরোবরের আবির্ভাব। মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইবে জানিয়াই ঝাঁপ দেওয়ার সাধ যেন কমে না, বাড়িয়া যায়।[৬৮]

---

৬৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চোর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

৬৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চোর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪-২৭৫

মধুর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রাখাল মিত্রের মেয়ের প্রতি আদিম লালসা, পান্নাবাবুর প্রতি কাদুর অভ্যাসহীন আবেগজনিত আকর্ষণ এবং কাদুর প্রতি পান্নাবাবুর দুর্বলতা এ গল্পে ফ্রয়েডীয় ভাবাবেশ নির্মাণ করেছে। তিনটি চরিত্রই লিবিডোতাড়িত।

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> 'চোর' গল্পের মধুঘোষ মূলত চোর হলেও ছিনতাই ও প্রতারণার মাধ্যমেও সে তার জীবিকার্জন করেছে। চৌর্যবৃত্তিতে মধু ঘোষ সম্পৃক্ত থাকলেও সে বৃত্তিকে সে ঘৃণ্য ও কদর্য হিসেবে বিবেচনা করায় এবং সেখান থেকে মুক্ত হবার অনুভাবনা তার মধ্যে কাজ করায়, মানব-সম্পর্কের ইতিবাচকতাবোধ একজন চোরের মধ্যেও যে ক্রিয়াশীল থাকে, সে জীবনসত্যটিই পরিস্ফুট হয়।[৬৯]

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগ্রন্থের 'ভূমিকম্প' গল্পে মনোরোগগ্রস্ত প্রসন্নর উদ্ভট কর্মকাণ্ড ও তার খাপছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সূত্রে ফ্রয়েড অনিবার্য। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, যৌন অতৃপ্তির কারণেই মানুষ স্নায়ুরোগগ্রস্ত হয়[৭০]। ভূমিকম্পের পরে প্রসন্নর যে মানসিক রোগ নানা উপসর্গ নিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে, তার পেছনে প্রসন্নর স্ত্রীহীন নিঃসঙ্গ জীবনের যোগসূত্রিতা আছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসন্নর রাত্রিকালীন নিদ্রার মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হলে অন্ধকার গৃহাভ্যন্তরে যে বন্দি হয়ে পড়ে। উচ্চকণ্ঠ মাতৃ-আহ্বানে তার নিদ্রার অবসান হলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সে উপলব্ধি করে, কিন্তু দ্রুত গৃহ থেকে বহির্গমনের পথ পায় না। ফলে সেই অন্ধকার ভূকম্পনপীড়িত পরিস্থিতিতে গৃহাবদ্ধতা তার মনে এক স্নায়ু-ছেঁড়া মৃত্যুভীতি সঞ্চার করে। স্বল্পস্থায়ী আতঙ্কের এই দুর্বিষহ স্মৃতিই তার অবচেন মনে সৃষ্টি করে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। অতঃপর মৃত্যু ভাবনার অন্তর্পীড়নজাত এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে

---

৬৯. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৭০. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

নানাভাবে। দীর্ঘক্ষণের উপবিষ্ট — অবস্থা থেকে অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হলে কিংবা উচ্চৈঃস্বরে নাম-ধরে কেউ সম্বোধন করলে প্রসন্নর মাথার মধ্যে একটি কালোপর্দা দুলতে থাকে।[৭১]

ভূমিকম্পে তার বাহ্যজগৎ যতটা বিপন্ন হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছিল তার মগ্নচৈতন্য। বলা যায় : ভূমিকম্পের ঘটনা তার অবচেতন মনকে দুমড়েমুচড়ে দেয়। ফলে সে ধীরে ধীরে মনোরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। লেখক বলেন :

> ভূমিকম্পের চেয়ে হৃৎকম্পই এবার তাহার বড়ো বিপদ হইয়া উঠিল। মাটির সঙ্গে কাঁপিতে গিয়া সাজানো ইটের বাড়ি যেভাবে ভাঙিতে থাকে প্রসন্ন তেমনইভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। নাড়া খাইয়া তাহার মগ্ন চেতনা হইতে যে কত দুঃখ ভয় ও উত্তেজনার তলানি উঠিয়া আসিয়া তাহার বর্তমান আতঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার হিসাব হয় না।[৭২]

ভূমিকম্পের পর মনোরোগগ্রস্ত প্রসন্নর বিকারগ্রস্ততার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> সেই ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসন্নের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কেহ জোরে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দা দুলিতে আরম্ভ করে। পর্দাটির প্রান্তগুলি পরল পরল অন্ধকার দিয়া দরমার বেড়ার মতো করিয়া বোনা এবং ঝাপসা অন্ধকারের দেয়ালে আটকানো। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া পর্দা সরানো যায় না, অতীত জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মতো দুলিতে থাকে। চেষ্টা স্থগিত করিলে হঠাৎ এক সময় পর্দাটা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আশ্চর্য এই, তখন আর পর্দাটির

---

৭১. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৭২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকম্প, *প্রাগৈতিহাসিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩

ভূতপূর্ব অস্তিত্বে প্রসন্ন বিশ্বাস করে না। মাথার মধ্যে যে মাঝে মাঝে তাহার অমন খাপছাড়া অভিনয় হয় সেকথাটাও সে বেশ ভুলিয়া থাকে।[৭৩]

এর দুবছর পরে চাকরির চেষ্টায় মাদ্রাজ ঘুরে এলে তার মাথা থেকে কালোপর্দা অন্তর্হিত হলেও আবির্ভাব ঘটে নতুন উপসর্গের। ভয়, অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের নানা বাতিক সৃষ্টি হয় মনোমধ্যে। সামান্য পোশাক-পরিচ্ছদ চুরির ভয়ে যাত্রাপথে বিনিদ্র রাত্রিযাপন, সমস্ত রাত্রির অচেতন অসহায় অবস্থা কল্পনা করে নিদ্রাহীনতার রোগ, মাসিক পত্রিকার ধাঁধার উত্তর মেলাতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভে-ক্রোধে বিচলিতবোধ, বিছানায় ভালোভাবে মশারি গুঁজে শুয়েও কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে এই নিয়ে সন্দেহের বাতিক কিংবা বর্হিদ্বার তালাবদ্ধ করেও প্রতিরাতে চৌকির নিচে চোরের অনুসন্ধান, হৃদয়বৃত্তিগুলোর তীক্ষ্ণ সতেজতা লাভ, অনুভবশক্তির আশ্চর্যরকম বিকাশ, অবাস্তব কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার প্রকোপ, বিমর্ষতা ও বেঁচে থাকার অর্থহীনতা উপলব্ধি প্রভৃতি তার মনোজগতে সৃষ্ট নতুন নতুন উপসর্গের নানা দিক।[৭৪] এক রাতে প্রসন্ন আশ্চর্য ও ভীতিকর স্বপ্ন দেখে। সে দেখে এক উঁচু পর্বতশিখরে তার স্কুল। অনেক বয়সে স্কুলে পড়ছে বলে সে খুব লজ্জা পাচ্ছে। টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে পাহাড়ের একেবারে ধারে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটি ছেলে তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ফলে পাহাড় থেকে সে ক্রমশ নিচে পড়তে থাকে। পাহাড়ের ঠিক নিচে অজানা রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ইঁদারা। ইঁদারার ভেতরে পড়ার বিপদ এড়িয়ে সে শূন্যে সাঁতার কেটে অবশেষে ইঁদারার পাড়ে আছড়ে পড়ে। ফ্রয়েড তার স্বপ্নবিশেষণ সংক্রান্ত তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে শূন্যে ভাষার স্বপ্নের সঙ্গে যৌনতার যোগসূত্রিতা রয়েছে। ফ্রয়েডের মতে :

> ... বিশেষ রকমের স্বপ্নে আমরা আমাদেরকে বাতাসে ভাসতে দেখি। শিশুকে আদর করতে গিয়ে বড়রা অনেক সময় তাকে হাত বা পা ধরে শূন্যে দোলাতে থাকে। বড় হলে তাই অনেকে শূন্যে ভাষার স্বপ্ন দেখে থাকে। কিন্তু আসলে এ ধরনের স্বপ্নের সঙ্গে যৌনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা

---

৭৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকম্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪

৭৪. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১-১১২

> জানা যায় যে প্রথম যৌন চেতনার সঙ্গে ছোটবেলার দোল খাওয়া, লম্ফঝম্প, কোন কিছু বেয়ে উপরে ওঠা ইত্যাদির সম্পর্ক আছে; অর্থাৎ এই সব কাজ করার সময়ই বালক-বালিকারা প্রথম যৌনতা বোধ করে। তাই স্বপ্নে শূন্যে ভাষার সঙ্গে যৌনতার যোগসূত্র আছে।[৭৫]

স্বপ্নদর্শন শেষে ঘুম ভাঙার পর সংগত কারণেই তার মাথায় জেগেছে অনাগত স্ত্রী সম্পর্কে ভাবনা :

> প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, একটা বউ থাকিলে এ সময় কাজ দিত। প্রেমালাপ, মানুষের সঙ্গে দুটি সাধারণ কথা বলিবার এত বড়ো প্রয়োজন কি সচরাচর আসে? বউ নিশ্চয় তাহার ভয়ের ভাগ লইত, দুচোখ বড়ো বড়ো করিয়া ভীতকণ্ঠে বলিত, কী গো কী? সে বলিত, কিছু না, বড্ড মশা লাগছে। উঠে মশারিটা একবার ঝাড় না? আলোটা বাড়িয়ে দাও, আমার বড়ো ভয় করছে। আমি রয়েছি ভয় কী? বলিয়া সে হাসিত। বউ তথাপি বলিত, না না, আলোটা তুমি বাড়িয়ে দাও।[৭৬]

ফ্রয়েড বলেছেন, স্বপ্ন সম্পূর্ণ মানসিক ঘটনা — স্বপ্ন ইচ্ছার চরিতার্থতা[৭৭] স্বপ্ন আমাদের ইচ্ছাকে কাল্পনিকভাবে চরিতার্থ করে।[৭৮] অফিসের বড়বাবুর কন্যার সাথে প্রসন্নর বিবাহের প্রসঙ্গ উঠলে রাতে তাই তার ঘুমাতে কষ্ট হয়। প্রসন্নর এ পর্যায়ের মানসিকতার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন মানিক এভাবে :

> বড়োবাবুর মেয়েটি যেন কড়া নেশা, তাহার কল্পনা সেই নেশারই অবসাদ; নিস্তেজ অথচ নির্মম; তাহার বেশ ঘুম আসতে থাকে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জট পাকাইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই — সহসা সে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হইয়া ওঠে। জাগরণ এমন আকস্মিক হয় যেন চমক লাগে।

---

৭৫. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৭৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকম্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

৭৭. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৭৮. ঐ, পৃ. ৭২

> সার্কাসের তাঁবুতে পাঁচ-ছয়টা উঁচু দোলনার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিবার কসরত করিতে এ কী ঘুম ভাঙা![৭৯]

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের অবচেতন মন তার সমগ্র কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভূমিকমম্পের সময় প্রসন্ন সে ভয় পেয়েছিল, সে ভয় তার অবচেতন মনকে এতটাই গ্রাস করেছিল যে তার বিকারগ্রস্ততা এমনকি বাসর রাতেও কাটে না। বাসর রাতে প্রসন্নর খাপছাড়া আচরণ যেমন পরিহাসউদ্দীপক, তেমনি লেখকের সহানুভূতিতে আর্দ্র :

ক. ক্রমে মেয়েরা বিদায় লইল। বাহির হইতে কে যেন দরজায় শিকল তুলিয়া দিল। প্রসন্ন মুহূর্তে পাংশু হইয়া গেল।

> যে মেয়েটি শিকল দিয়াছিল বাহির হইতে সে পরিহাস করিয়া বলিল, কই গো বর, খিল চড়াবার শব্দটা পাচ্ছি না যে? আমাদের ভদ্রতায় এতখানি বিশ্বাস কোরো না, ঠকে যাবে।
>
> প্রসন্ন এতক্ষণে উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, শিকল দিলেন কেন? খুলে দিন।
>
> বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ কিরকম বর?[৮০]

খ. প্রসন্ন খাটে গিয়া বসিল। তাহার কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে, ঘরের বাতাস তাহার নিশ্বাস লওয়ার পক্ষে অপ্রচুর।

> কত জল্পনাকল্পনাই সে করিয়া রাখিয়াছিল। সে সব কিছুই হইল না। বিপন্ন হইয়া প্রসন্ন এই বলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল —
>
> তোমার ভাইটাই কাউকে ডেকে বলো না শিকলটা খুলে দিক!
>
> বউ মৃদুস্বরে বলিল, একটু পরেই খুলে দেবে!

---

৭৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকম্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮
৮০. ঐ, পৃ. ৩০৯

> প্রসন্ন তাহা জানে। এ যে কৌতুক, দশ-পনেরো মিনিট পরে মেয়েটি যে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া শিকল খুলিয়া দিয়া যাইবে ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বস্তি মেলে না। বন্ধ ঘরে এক মুহূর্ত থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার দম আটকাইয়া আসে।[৮১]

'অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> আশঙ্কাজনিত প্রতিক্রিয়ায় রোগী অহেতুক ভয়ের পীড়নে আক্রান্ত হয়। রোগীর মনে হয় কি এক অজানা বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার ফলে অনেক সময় রোগীর শ্বাসরোধ হয়ে আসে, বুক ধড়ফড় করে, এমনকি নাড়ীর গতিও বেড়ে যায়।[৮২]

প্রসন্ন চরিত্রের মধ্যে এই অস্বভাবী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রহমান হাবিব যথার্থই বলেছেন :

> মানিক তাঁর "ভূমিকম্প' গল্পে ভূমিকম্পের কারণে ঘরে রুদ্ধ হয়ে থাকা প্রসন্নর মনোভীতির পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্প্রসারিত জীবনেও কিভাবে প্রভাব ফেলেছে – সে প্রসঙ্গটি শৈল্পিকভাবে তুলে এনেছেন। ভূমিকম্পাক্রান্ত হবার পর থেকে প্রসন্ন বিভিন্ন রকম মানসিক রোগে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। নিদ্রাহীনতা ও সন্দেহ বাতিকগ্রস্থতা তার মনোজগতকে অধিকার করতে থাকে। যদিও সামান্য কাপড়-চোপড় তবুও তা চুরি হয়ে যায় কিনা, সেই ভয়ে ভ্রমণ পথে প্রসন্নর নিদ্রাহীন রাত্রি কাটানো, সামান্য ধাঁধার উত্তর মেলাতে না পেরে তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হওয়া, ঘরের বাহিরের দরজা তালা লাগানোর পরও চৌকির নিচে চোর রয়েছে এমনতর অনুভাবনা – প্রসন্নর মানসিক বিকারগ্রস্ততাকেই নির্দেশিত করে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মৃত্যুর দরজা থেকে প্রসন্নর ফিরে আসার কারণে তার মধ্যে অবাস্তব ভাবকল্পনা যেমন স্থিত হয়েছে; তেমনি জীবনের প্রতি বিষণ্ণতা ও যাপিত

---

৮১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকম্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯

৮২. মীর ফখরুযামান, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০২

> জীবনকে অর্থহীন মনে করার অনর্থকবোধও তার মধ্যে উচ্চকিত হয়েছে। ভীতিজাত প্রচণ্ডতা যে মানবমনকে মনোসমস্যাক্রান্ত করতে পারে – তারই শৈল্পিক মানবসম্পর্ক সন্ধান এ গল্পের প্রতিপাদ্য হয়েছে।[৮৩]

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগ্রন্থের 'অন্ধ' গল্পে সনাতনের অপরাধবোধতাড়িত জীবনাচরণ, সেই সূত্রে তার বিকারগ্রস্ততা ও জীবনবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে ফ্রয়েডীয় দর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দোতলা অট্টালিকা নির্মাণকালে অর্থাভাবে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করলে সেই শোকে চাকরিজীবী সনাতনের স্ত্রী সাত বছরের একমাত্র কন্যা ও স্বামীকে রেখে প্রথমে গৃহত্যাগ ও পরে মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রীর প্রতি গভীর মমত্ব ও ভালোবাসার ফলে সনাতনের মধ্যে, এই ঘটনায়, কতগুলো মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একদিকে সীমাহীন অনুশোচনা, অনুতাপ, পাপবোধ, অন্যদিকে কন্যার প্রতি স্নেহশূন্য বিরাগ, আত্মক্ষয়ী জীবনমমতা, একান্ত স্বার্থপুষ্ট অস্তিত্বরক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তার পরবর্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।[৮৪]

ফ্রয়েডের মতে, সমস্ত মানসিক রোগের কারণ হলো আবেগের দ্বন্দ্ব (emotional conflict)।[৮৫] সনাতন তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। স্ত্রীকে ভালোবাসত বলেই সাত বছর তাকে রাজরানীর মতো সুখ দিয়েছিল। আবার দোতলা বাড়ি করবার প্রাক্কালে অর্থাভাব যখন সনাতনকে তাড়িত করে, তখন সে জোর করে স্ত্রীর সমুদয় গয়না এক রকম কেড়ে নিয়েই বিক্রি করে দেয়। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং একই সঙ্গে বাড়ি করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ তার মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> স্ত্রীকে সাত বছর রাজরানীর মতো সুখও জোগাইয়াছিল সনাতন, তারপর ভিখারিণীর মতো দুঃখও দিয়াছিল সে। এই বাড়ি করার ঝোঁকে এমনই হয়। প্রথমে রাজরানীর মতো সুখ পাইয়াছিল বলিয়াই না তার রাজরানিত্ব খসাইয়া একটা ইটের বাড়ি করার ঝোঁক ভগবান সনাতনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছিলেন।

---

৮৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৮৪. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৮৫. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

> স্ত্রীর বদলে বাড়ি। সাত বছর যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মনে হইত বুকের পাঁজর ফাঁক করিয়া একেবারে হৃদয়ে চালান করিয়া দিতে না পারিলে সাধ মিটিবে না, সেই স্ত্রীর বদলে একটা চুন-সুরকি ঢাকা সাজানো ইটের স্তূপ! সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ শুধু এই নিয়মটা বজায় রাখার জন্য ছাড়া কেন ভগবান তার মনে উদ্ভট বাড়ি-প্রেম আনিয়া দিবেন, রামচন্দ্রের প্রজানুরাগের মতো?[৮৬]

Id-এর তাড়নায় ও Ego-এর সাময়িক সমর্থনে সনাতন গয়না বিক্রি করে বটে কিন্তু তার স্ত্রী গৃহত্যাগ করলে এবং পরবর্তীতে মারা গেলে Super ego-র নৈতিক উৎকণ্ঠায় ভুগে সনাতন ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনুশোচনার প্রবল আগুনে সে নিয়ত দগ্ধ হয় লেখকের ভাষায় :

> প্রায়শ্চিত্ত? কী প্রায়শ্চিত্ত করিত সনাতন? পাপের যা একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আছে — অনুতাপ! প্রায় আধঘন্টা কী তারও বেশি সময় ব্যাপিয়া নিয়মিতভাবে গম্ভীর আন্তরিক অনুতাপ, ফাঁকি নয়। তপস্যা করার মতো নিবিষ্টচিত্তে অনুতাপ করিত সনাতন, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম আসা পর্যন্ত আর সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠা পর্যন্ত। যেদিন রাত্রে সহজে ঘুম আসিত না সনাতনের, স্নায়বিক চাঞ্চল্য আনিয়া দিত সাময়িক অনিদ্রা রোগ, সেদিন তার অনুতাপের আর তুলনা থাকিত না, অনুতাপের তীব্রতায় তার মাথা দিয়া ছুটিতে থাকিত আগুন। বুকে তার যে জ্বালা ছিল, এটা সম্ভবত তারই হলকা। হায়, অনুতাপেই যখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মেয়ের মনে ব্যথা দিবার অতিরিক্ত পাপটুকু করিয়া কেন সনাতন বেশি মদ গিলিয়া অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারিত না?[৮৭]

এখান থেকেই শুরু হয় সনাতনের বিকারগ্রস্ততা ও জীবনবিনাশী কর্মকাণ্ড।

---

৮৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ, *প্রাগৈতিহাসিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১ - ৩১২

৮৭. ঐ, পৃ. ৩১০ - ৩১১

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি সবসময় সক্রিয় থাকে, এর একটিকে তিনি বলেছেন এরস্ (Eros), অপরটির নাম দিয়েছেন থ্যানাটস্ (Thanatos)। এরস্ ও থ্যানাটসের কার্যক্রম সম্পর্কে ফ্রয়েডের মত :

> আমাদের মনের মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তি কাজ করছে — একটি জীবনমুখী, অপরটি মৃত্যুমুখী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে আমাদের মনের শক্তি শুধুই জীবনমুখী। এই শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে — আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (Self preservation) এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি (reproduction)। আমরা যত রকম কাজই করি না কেন তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়। আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই দুটি প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। জীবনমুখী এই দুটি প্রবৃত্তির কর্ণধার যে মানসিক শক্তি তাকে তিনি বললেন এরস্ (Eros)। দ্বিতীয় মানসিক শক্তির পরিচয় তিনি পেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। যুদ্ধের ধ্বংসময় তাণ্ডবলীলা দেখে তিনি ভাবলেন যে মানুষের শুধু জীবনমুখী প্রবৃত্তি থাকলে এই ধ্বংসলীলা সম্ভব হত না। তাই তিনি বললেন যে আমাদের আরও একটি প্রবৃত্তি বা মানসিক শক্তি আছে। তিনি এটির নাম দিলেন থ্যানাটস্ (Thanatos) এই শক্তি দুদিকে বইতে পারে — এক. এটি আত্মঘাতী হতে পারে; দুই. এটি পরঘাতী হতে পারে। যখন আত্মঘাতী তখন এর উদ্দেশ্য হল জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে দেয়া; আর যখন পরঘাতী তখন উদ্দেশ্য হল অপরকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা। 'জীবন থেকে সরিয়ে ফেলা' বলতে আমরা বুঝব এই যে থ্যানাটস্ আমাদেরকে বিবর্তনের (evolution) উল্টো দিকে নিয়ে যেতে চায়। এরস্ ঠিক তেমনি বিবর্তনের পরিপন্থী নয়, সহায়ক। এরস্ জড় থেকে জীবনের দিকে প্রকৃতিকে চালিত করে, আর থ্যানাটস্ জীবন থেকে জড়ের প্রতি প্রকৃতিকে সঞ্চালিত করে।[৮৮]

সনাতনের জীবনের প্রথম ভাগ এরস্ চালিত এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জীবনের দ্বিতীয় ভাগ থ্যানাটস্ চালিত।

---

৮৮. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

স্ত্রীর গৃহপরিত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করার পর সনাতন যে আত্মপীড়ন ও গ্লানিজর্জরতার সম্মুখীন হয়, নিয়মিত অনুতাপের মধ্য দিয়েই তা থেকে সে মুক্তি খোঁজে। আর এই তীব্র অনুশোচনাজনিত হৃদয়দহন থেকে মুক্তিকল্পে সে নিমজ্জিত হয় নিয়মিত পানাভ্যাসে। সনাতনের এ সকল আচরণের মধ্য দিয়ে যে প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ করি, ফ্রয়েডকথিত মৃত্যুপ্রবণতার সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত।[৮৯] ফ্রয়েডের ভাষায় :

> The second class of instincts was not so easy to define; in the end we came to recognize sadism as its representative. As a result of theoretical considerations, supported by biology, we assumed the existence of a death-instinct, the task of which is to lead organic matter back into the inorganic state.[৯০]

এই জীবনবিরোধী প্রবৃত্তির ফলে একাকিত্বই হয়ে ওঠে সনাতনের একমাত্র আরাধ্য। যে-কারণে একমাত্র কন্যাকেও সে বিয়ে দিয়ে দ্রুত শ্বশুরালয়ে প্রেরণে উদ্যোগী হয়। পরিতাপক্লিষ্ট চিত্তদাহ থেকে চিরমুক্তিলাভের মতো সাহসী সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষমতার ফলে সনাতন স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যই প্রতীক্ষা করে।[৯১] ধীরে ধীরে নিজেকে সে নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা করে। সে একাকী থাকতে চায় কন্যা-জামাতার একত্রবাসের প্রস্তাব সে একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রস্তাবে তখনই সম্মতি মেলে যখন তার সঞ্চিত অর্থ শেষ এবং তার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। অনুশোচনা, একাকিত্ব প্রবল পানাসক্তি তার মধ্যে একধরনের বিকারগ্রস্ততা সৃষ্টি করে। জামাতা গিরিজাকুমারের বাতগ্রস্ত বৃদ্ধা মার হাঁটু ইচ্ছাকৃতভাবে মাড়িয়ে দেয়া, কপালে লাঠি মারা, চোখে খোঁচা দেয়া ইত্যাদি তার সেই বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। গয়নার প্রতি প্রবল বিরাগ সনাতনের অন্ধজীবনেও বজায় ছিল। কন্যা মোহিনীর সেবাপরায়ণতা তার স্বর্ণের বালার কারণে বাবার কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। সনাতনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক বর্ণনা করেন :

---

৮৯. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৯০. Edt. by John Rickman, *A General Selection From the Works of Sigmund Freud*, India, 1941, P. 296

৯১. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

> এমন মেয়েও কি কারো কাছে যে মেয়েমানুষকে মারে আর বাপের ঘাড়ে বালা দিয়া আঘাত করে? সবই আশ্চর্য এ জগতে, সবই অদ্ভুত! খাপছাড়া তলোয়ারের মতো একদিকে ধার একদিক ভোঁতা। ভাবিয়া দেখা কথাটা। তাই যদি না হয়, বালা পরার জন্য মেয়েকে কেউ ঘেন্না করে? শুধু বালা পরার জন্য?[৯২]

ক্রন্দনরতা কন্যার প্রতি মমতাবশত সনাতন স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয়ার সময় গলার হারে স্পর্শ লাগায় কন্যার প্রতি তার মমতা নিমেষেই নিঃশেষ হয়ে যায়। লেখক বর্ণনা করেন :

> সনাতন হঠাৎ খুব শান্ত হইয়া যায়। স্বাভাবিক চড়া গলা ঝাপসা হইয়া আসে। মেয়েকে কাছে ডাকিয়া তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে আরম্ভ করে সনাতন। আহা! ওর মা যখন ওকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, তখন বয়স ছিল মোটে সাত বছর। মা-র জন্য কী কান্নাই তখন মোহিনী কাঁদিত! ঝরঝর করিয়া কী জলটাই ঝরিত দুচোখ দিয়া! মোহিনীর গলার হারে হাত পড়ায় সনাতন চমকাইয়া ওঠে। মেয়ের একটা হাত তুলিয়া চুড়ি ও বালা স্পর্শ করিয়া হাতটা সে ছুঁড়িয়া দেয়। গয়না! গয়নার শোকে যে স্বামী সন্তানকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল তার মেয়ে কত গয়না পরিয়াছে দেখো। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে।[৯৩]

পাপবোধতাড়িত সনাতনের জীবনাচারণ প্রসঙ্গে সমালোচকদের কিছু মতামত প্রণিধানযোগ্য। নিতাই বসু বলেছেন, "স্ত্রীর জন্য সনাতনের চেতনায় নানারকম বিকার দেখা দেয়।"[৯৪] নিতাই বসুর এ মন্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য। এ গল্পে তিনি 'মার্কসীয় চেতনার প্রস্তুতি পর্বের প্রমাণ'[৯৫] পেলেও বলেছেন, "সনাতন অন্ধ, কিন্তু শরীরের ভেতরে আরেক সনাতন যে বাস করে সে অন্ধ নয়।"[৯৬] সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের এ মন্তব্য

---

৯২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

৯৩. ঐ, পৃ. ৩২১

৯৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৪১

৯৫. সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পা.), *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩৫

৯৬. ঐ, পৃ. ৩৫

ফ্রয়েডীয় জীবনসত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে। সনাতন অন্ধ, স্ত্রীর গয়না বিক্রি করার সময় Id তাকে স্বার্থপরতায় অন্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু স্ত্রীর অন্তর্ধান ও মৃত্যুর পরে তার যে অনুশোচনা, তা তার Super ego-র প্রবল তাড়নার ফল। অন্ধ হলেও সনাতন তাই মানসিকভাবে অন্ধ নয়। সরোজমোহন মিত্র স্পষ্ট করেই বলেছেন, "আসলে সনাতন অন্ধ নয়, এ সংসারে সকলেই নিজের স্বার্থবোধের দ্বারা অন্ধ।"[৯৭] ফ্রয়েডের মতে সব মানুষই কমবেশি স্বার্থপর — মানব মনের গভীরে নিমজ্জমান Id মানুষকে ঊর্ধ্বচাপ দেয় এবং সুচতুর Ego সুকৌশলে সমাজবাস্তবতার কাছে গ্রহণযোগ্য করে Id-এর ইচ্ছাকে পূরণ করে।[৯৮] সময়ের বির্বতনে, সভ্যতার অভিঘাতে, Super ego-র অনুশাসনে মানুষ আজকের অবস্থায় উন্নীত হলেও তাকে ভেতরে ভেতরে 'সুখকামী পশু'[৯৯] হিসেবেই লক্ষ করেছেন ফ্রয়েড। সরোজমোহন মিত্র বোঝাতে চেয়েছেন এ সংসারে সকলেই নিজের স্বার্থবোধের দ্বারা অন্ধ — ফ্রয়েডের ভাষায় সবাই সুখকামী পশু। সনাতন আমাদেরই একজন।

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিব মন্তব্য করেছেন, 'সনাতন চরিত্রে যুগপৎ মনোবিকারগ্রস্ততা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা ও লোলুপময় মানবস্বভাবের নেতিবাচক মোহাচ্ছন্নতারই প্রকাশ ঘটেছে।'[১০০]

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগ্রন্থের 'মাথার রহস্য' গল্পে দুই হাজার টাকা হারানোর পর পিতা পতিতপাবনের এবং অসুস্থ পিতাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টার অনুষঙ্গ হিসেবে যৌতুক নিয়ে কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করে পুত্র যাদবের মনোরোগগ্রস্ততার মূলে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন সক্রিয়। সারা জীবনের সঞ্চয়কৃত অর্থ হারিয়ে বৃদ্ধ বয়সে পতিতপাবনের মনোগত ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া একটি অনিবার্য ঘটনা। টাকা হারানো ও তার মাথা খারাপ হওয়ার ঘটনা এক সূত্রে গাঁথা। লেখক বর্ণনা করেন :

---

৯৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৪২

৯৮. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯ - ৩০

৯৯. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, অরূপরতন বসু (অনু.), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩১

১০০. হাবিব রহমান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

> শেষ বয়সে একসঙ্গে থোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর পতিতপাবনের মাথা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।
>
> বেচারি গরিব মানুষ। সারাজীবন সামান্য মাহিনায় চাকরি করিয়া অতিকষ্টে ছেলেদের মানুষ করিয়াছে, ধারকর্জ করিয়া স্ত্রীর গহনা বেচিয়া মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়াছে, জীবনে একটিবারের জন্যও কোনোদিন দুই হাজার টাকা নিজের বলিয়া দাবি করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। পেনশন নেওয়ার পর মাসে মাসে সাঁইত্রিশ টাকা পেনশন আর জীবনবিমার ওই দুই হাজার টাকা ছাড়া পতিতপাবনের আর কিছুই ছিল না। টাকা তো নয়, গায়ের রক্তের চেয়েও বেশি। কলিকাতা শহরের ভোজবাজিতে এক মিনিটের মধ্যেই সেই টাকাটা যে কোথায় উড়িয়া গেল![১০১]

ফ্রয়েডের মতে, সমস্ত মানসিক রোগের কারণ হল দু আবেগের দ্বন্দ্ব (emotional conflict)[১০২] । টাকা হারিয়ে ফেলার দুর্ঘটনাটি পতিতপাবন প্রাণপণে ভুলে থাকতে চায়। এ জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে টাকা হারানোর কথা গোপন রেখে সে বলে যে সব টাকা সে গোপনে পুঁতে রেখেছে। পতিতপাবন ভালো করেই জানে তার এ বক্তব্য সত্য নয়। তাই তার টাকা হারানোর যন্ত্রণা তীব্র ও তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। বিরুদ্ধভাবের এ দুই আবেগের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত তাকে মনোরোগগ্রস্ত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তার স্ত্রী ও পুত্রের কথোপকথন প্রণিধানযোগ্য :

> অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিল, কী অদেষ্ট করেই জন্মেছিলাম আমি। টাকাকে টাকা গেল, এদিকে আবার কী সর্বনাশ হল দেখ! হ্যাঁ রে মাধু, টাকার শোকে মানুষ কি সত্যি পাগল হয়ে যায়? আস্তে আস্তে কমে যাবে তো?
>
> মাধব মুখ খিঁচাইয়া বলিল, যাবে না? ও তো বাবার ঢং। টাকাগুলো বিসর্জন দিয়ে এসে কী আর করেন, মাথাখারাপ হওয়ার ভান করছেন।

---

১০১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাথার রহস্য, *প্রাগৈতিহাসিক*, মানিক রচনাবলি, (২য় খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৩২

১০২. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

> অন্নপূর্ণা আরো বেশি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোরও মাথা খারাপ হয়েছে মাধু, নইলে ওঁর নামে তুই অমন কথা বলিস? ঢং করবার মানুষ উনি?[১০৩]

বিকারগ্রস্ত পতিতপাবনের চোখে অবিবাহিত কন্যা পুঁচকি হয়ে ওঠে বিবাহিত। কপালে সিঁদুর দেয় নি বলে পতিতপাবন তাকে 'হারামজাদি' বলে গালমন্দও করে। লেখক জানান, তার সমস্ত বিকারের ভিত্তি ঐ দু হাজার টাকা। বিকারগ্রস্ত পতিতপাবনের অসুস্থ মানসপট উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক জানান :

> তার সমস্ত বিকারের ভিত্তি ওই দুহাজার টাকা!
>
> কোন চুলায় গিয়াছে সে টাকা ভগবান জানেন, দিবারাত্রি তার মনের মধ্যে ওই টাকার চিন্তা পাক খাইয়া বেড়ায়। কখনো নিজের মনে ভাবে, কখনো ভাবনাগুলি শোনাইয়া বেড়ায় দশজনকে। অন্য লোকে নিজেদের মধ্যে যখন যে বিষয়েই আলোচনা করুক পতিতপাবন সে আলোচনায় যোগ দিলে দুহাজার টাকার কথা টানিয়া আনে — যে টাকাটা সে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, আর যে টাকাটার দিকে পৃথিবীসুদ্ধ সকলের লোভ, আর যে টাকাটা দিয়া সে একদিন এই করিবে, ওই করিবে, তাই করিবে।[১০৪]

পতিতপাবনের অসুস্থতা কমে না বরং ধীরে ধীরে তা প্রবল হয়ে ওঠে। দুই হাজার টাকা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অসুস্থ পতিতপাবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেন :

> দাড়িগোঁফে পতিতপাবনের মুখখানা একরকম ঢাকিয়া গিয়াছে, তার চোখের দিকে চাহিলে কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কেমন একটা জটিল দুর্বোধ্য রহস্য তাহার দুটি চোখে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন জ্যোতির মতো ঘনাইয়া আসিয়াছে; শিশুর চোখে যেন ফুটিয়া আছে শ্মশানচারী কাপালিকের দৃষ্টি।

---

১০৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাথার রহস্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩

১০৪. ঐ, পৃ. ৩৩৪

> পাগলামি পাগলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পতিতপাবনের পাগলামি এমন বেমানান মনে হয়। এ অস্বাভাবিকতা যেন তার পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক, অনুচিত কিছু।[১০৫]

বাড়িতে এসে একজন ডাক্তার পতিতপাবনকে দেখে যায়। ডাক্তারের Point of view থেকে মানিক আমাদের জানান : "বড়ো আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড়ো খাপছাড়া, বড়ো রহস্যময়। কিসে যে এখন কী হয়, কারো তা বলার ক্ষমতা নাই।"[১০৬]

মানুষের মস্তিষ্ক রহস্যময় হতে পারে তবে তা কিছুতেই খাপছাড়া নয়। মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে ফ্রয়েডের যুগান্তকারী গবেষণা মনোবিকলন তথা বিকারগ্রস্ততার নানা রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হলে আমরা পতিতপাবনের এই ভারসাম্যহীনতাকে হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ততার সঙ্গে তুলনা করতে পারি।[১০৭] হিস্টিরিয়া রোগ সম্পর্কে ফ্রয়েড জানিয়েছেন অসুখী জীবনের এক পর্যায়ে মানুষ হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়। টাকা হারিয়ে পতিতপাবন হয়ে উঠেছিল চরম অসুখী সুতরাং মনোরোগে আক্রান্ত হওয়া ছিল তার জন্য স্বাভাবিক ঘটনা।

পিতার বিকারের চিকিৎসায় তার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ বিবেচক পুত্র যাদব নিজেকে উৎসর্গ করে কীভাবে নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেই ক্রমশ ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে — তার কাহিনীনির্মাণ করে মানিক এ গল্পকে যেমন করেছেন সমৃদ্ধতর, তেমনি এ জাতীয় মনোরোগের বৈশিষ্ট্যকেও ভিন্নতর তাৎপর্য দান করেছেন। শিল্পী হিসেবে এখানেই মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। যে পরিমাণ অর্থ হারিয়ে গেছে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে পতিতপাবনের হাতে দিতে পারলে তার রোগমুক্তি সম্ভব — এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে যাদব অস্বাভাবিক পরিশ্রমের বিনিময়ে কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে ও সেই সূত্রে সুপাত্র হিসেবে নিজেকে তৈরি করে। অতঃপর যৌতুকের বিনিময়ে এক কুরূপা কন্যাকে সে বিয়ে করে। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে যাদব যখন তার পিতাকে 'পুঁতে রাখা' অর্থের

---

১০৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাথার রহস্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৫

১০৬. ঐ, পৃ. ৩৩৫

১০৭. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

সন্ধান দেয়, তখন পতিতপাবনের সুস্থ-স্বাভাবিক আচরণ যাদবকে করে তোলে অস্বাভাবিক, বিকারগ্রস্ত।[১০৮] ফ্রয়েড স্পষ্ট করেই বলেছেন : মানুষের বিষাদগ্রস্ততার কারণ তার যৌন অতৃপ্তি।[১০৯]

ভালো পাস করা সুপাত্র যাদবের পাত্রী পেতে অসুবিধা হয় না। পাত্রীর বাবা নগদ দিতে রাজি থাকেন তিন হাজার, ঘটকের তিনশ বাদ দিলে যাদবের বাকি থাকে দুই হাজার সাতশ। বৌভাত ইত্যাদির খরচ হিসেবে ব্যয় হয় সাতশ টাকা তখন তার হাতে থাকে পুরোপুরি দুহাজার টাকা — তার পরম সাধনার ধন। টাকার নেশায় যাদব এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে হবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখা হয়ে ওঠে নি তার। বিয়ের রাতে স্ত্রীকে দেখে সঙ্গত কারণেই সে হতাশ হয়। স্ত্রী কালিদাসীর কুরূপ দর্শনে যাদবের যে মনোবিচলন ঘটে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। বউ অবশ্য সুবিধার হইল না, সবদিকে সুবিধা হয়ও না। রং একটু কালো, বউয়ের দেহ একটু স্থূল, মুখখানা একটু চ্যাপ্টা, আর বাঁ চোখটা এত ছোটো যে, এ চোখে তার দৃষ্টি নাই। নামটা পর্যন্ত ভালো নয় বউয়ের। কালিদাসী।
>
> যাদব আগেই মেয়ে দেখিয়াছিল, তবু বিবাহের রাত্রের চোখে পলক ফেলিতে তার যেন একটু একটু কষ্ট হইতে লাগিল। উপবাস আর অনিদ্রায় যেরকম হয় তার চেয়ে অন্যরকম কষ্ট।
>
> তোমার ঘুম পেয়েছে?
>
> বউ মাথা নাড়িল।
>
> তোমার গালে কাটা দাগটা কিসের?
>
> ফোঁড়া হয়েছিল।

---

১০৮. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১০৯. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

> বোঝা গেল, মেয়ে দেখার সময় যেমন মনে হইয়াছিল বউয়ের গলা তার চেয়েও কর্কশ। অতিরিক্ত লজ্জার ভেজালটা উবিয়া গেলে ও গলার স্বর কেমন শোনাইবে কে জানে!
>
> একটা নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া নিশ্বাসটা যাদব চাপিয়া গেল, কিন্তু প্রকাণ্ড হাইটাকে কোনোমতে দমন করা গেল না।[১১০]

সকালবেলা যাদব যখন শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে পতিতপাবনের 'পুঁতে রাখা' কথিত দু হাজার টাকা ভর্তি সিলমোহর করা বড়ো কাঁসার ঘটি বের করে আনে, তখন পতিতপাবন দিব্যি ভালোমানুষের মতো জানায় : "আমার সে টাকা এখানে কোথেকে আসবে? সে টাকা তো ব্যাংকে জমা দেবার সময় চুরি গিয়াছে।"[১১১] একথা শুনে তখন যাদবের অসুস্থ হবার পালা। পড়াশুনার জন্য তার দীর্ঘ সাধনা, সেই সূত্রে সহজ-স্বাভাবিক আনন্দময় জীবনকেও উপেক্ষা, তার অবদমন, শুধু টাকার জন্য কুৎসিত, স্থূলাঙ্গী স্ত্রীকে নির্দ্বিধায় বিয়ে করা — সব কিছুই তার কাছে পণ্ডশ্রম মনে হয়। তার মনে হয়, তার ব্যক্তিজীবন তাকে ব্যঙ্গ করছে। তার সমগ্র চেতনালোক জুড়ে থাকে তার কুরূপা স্ত্রী :

> যাদব উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে সোজা দেখা যায়, নূতন বউ মস্ত দেহখানি লইয়া কৌতূহলভরে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মোটা মোটা আঙুল দিয়া ঘোমটা ফাঁক করিয়া উঠানের ব্যাপারটা চাহিয়া দেখিতেছে।[১১২]

যাদবের সহসা অসুস্থ হওয়ার পেছনে লিবিডোর ঊর্ধ্বচাপ প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুযায়ী, সকল মনোব্যাধির পেছনে রয়েছে লিবিডোর ভূমিকা। সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন :

> ... মানুষের মনোগত আচরণের নিয়মাবলি অনুসন্ধানে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতিও কম নয়। ফ্রয়েড ও তার সহকর্মীরা মনোব্যাধির কারণ ও

---

১১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাথার রহস্য, পূর্বোক্ত, ৩৩৬-৩৩৭
১১১. ঐ, পৃ. ৩৩৭
১১২. ঐ, পৃ. ৩৩৮

তার প্রতিকারের জন্য যেসব ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তা এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লবসাধন করেছে। ফ্রয়েড লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধনকে মনোব্যাধির পরোক্ষ কারণ এবং যে আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডো ওই সংবন্ধনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাকে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যাবর্তিত লিবিডোকে তার শৈশবকালীন সংবন্ধনস্থল থেকে মুক্ত করাই মনোব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র উপায়। সুতরাং ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ হোক পরোক্ষ হোক সকল মনোব্যাধির পেছনেই লিবিডোর ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী।[১১৩]

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিব মন্তব্য করেছেন :

প্রচণ্ড আর্থিক-মানসিক আঘাতে মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে – মনোবিজ্ঞানের সে মনোরহস্যের মানবসম্পর্কসূত্রই গল্পটিতে প্রতিপাদিত হয়েছে।[১১৪]

'মিহি ও মোটা কাহিনী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কবি ও ভাস্করের লড়াই' গল্পটিতে লিবিডোতাড়িত তিন ধনীর দুলাল-দুলালী — চারণী, অরবিন্দ ও মহাব্রতর — ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। চারণীর মৃত্যুর পর তার প্রণয়স্মৃতিকে অমরত্ব দানের মোহে কবি মহাব্রত ও ভাস্কর অরবিন্দর ঈর্ষাকাতর লড়াই এ গল্পের আখ্যানভাগকে পরিপুষ্ট করেছে। ধনীর দুলালী চারণীর মনে অল্প বয়সেই বিকারগ্রস্ততা দানা বেঁধেছিল। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের হেরম্ব ও 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের নায়ক রাজকুমারের সঙ্গে তার তুলনা চলে। হেড়ম্ব ও রাজকুমারের মতো চারণীর বিকারগ্রস্ততা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিপন্ন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ও সমান্তরাল। আবু সয়ীদ আইয়ুব লক্ষ করেছেন:

---

১১৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

১১৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত পৃ. ২১

> বিশ শতকে আবার হাওয়া গেল পালটে। প্রেমের কবিতা লেখা এক রকম বন্ধ হয়ে এল, উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেমের জায়গা নিল নির্জলা সেক্স। এর জন্য দায়ী ভিয়েনীজ স্কুলের মনোবিকলন-তত্ত্ব। বিস্তর তথ্যাদি ঘেঁটে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে অত্যন্ত খাঁটি শেলীমার্কা সেই— যে the worship that the heart lifts above, and the heavens reject not — তার পেছনেও রয়েছে চাপা লিবিডোর প্রবল তাড়না। এর ফলে সেক্স সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন বাড়ল, স্নায়ুবিক চাঞ্চল্যজনিত যে— কৌতূহল একদিন ধামাচাপা ছিল তাও তেমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। লেখাপড়া কথাবার্তায় চিন্তা-ভাবনায় সর্বত্রই প্রসঙ্গটির ছড়াছড়ি এবং বাড়াবাড়ি। ... তাই ক্যাপিটালিস্ট দেশে প্রচন্ড বেগে সেক্সের চর্চা চলে, জন্মায় যৌনবিকার, মানসিক ব্যাধি এবং ব্যাধির প্রতি আসক্তি।[১১৫]

যুগব্যাধিতে আক্রান্ত বিকারগ্রস্ত চারণীর মানসপট উন্মোচন করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> প্রতিভার প্রতি চারণী দেবীর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। রূপ কাকে বলে জানার পর থেকেই সে জানত এ তার মন উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে। অল্প বয়স থেকে এই ধরনের একটা জ্ঞান মনের মধ্যে পুষে রাখার ফলে চারণীর ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে একটি বিশেষ বৃহৎ প্রতিভাকে বৃহত্তর প্রতিভায় পরিবর্তিত করার জন্য সে পৃথিবীতে এসেছে ; তার নারী-জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা সন্তান-পালনের মতো প্রতিভার প্রতিপালনে। অবিকল এই উদ্দেশ্যের উপযুক্ত করে চারণী নিজেকে গড়ে তুলেছিল। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর অথবা নিছক গদ্য-সাহিত্যিক ঠিক কোন ধরনের প্রতিভার বিকাশের ভারটা তাকে গ্রহণ করতে হবে জানা না থাকায়, সব

---

১১৫. সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ, *শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা*, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১৫

দিক বজায় রাখার জন্য, এই চার রকম প্রতিভার উপযুক্ত করেই নিজেকে সে তৈরি করেছিল।[১১৬]

পুস্তক ও অ্যালবামের মধ্যস্ততায় চারণী জগতের বড়ো প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল কিন্তু রক্তমাংসের প্রতিভার খোঁজ সে পেল না। দু-চারজন কবি শিল্পী ও সাহিত্যিক যাদের সাথে তার আলাপ হলো তারা এত গরিব যে তাদের প্রতিভাকে চারণী মেনে নিতে পারল না। এরকম প্রতিভার বিকাশের ভার নেবার সাধ তার কোনদিনই ছিলো না। কারণ দারিদ্র্য সে অত্যন্ত অপছন্দ করত। যখন তার বয়স একুশ, তার ক্ষীণ আর্টিস্টিক দেহটি একটুখানি স্থূল হয়ে উঠবার উপক্রম করল, তখন সে ভাষাতত্ত্বের এক অধ্যাপকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়ার কথা প্রায় স্থির করে ফেলল। এমন সময় প্রায় একসঙ্গে দুজন ধনবান, রূপবান, বলবান প্রতিভার আবির্ভাবে চারণীর জীবনে যেন একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল। প্রথমে এল অরবিন্দ, উদীয়মান ভাস্কর। তারপর অরবিন্দর সঙ্গে চারণীর বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে এসেছে, তখন এল মহাব্রত, উদীয়মান কবি। চারণীর তখন ভারি বিপদ। কাকে ফেলে সে কাকে গ্রহণ করবে এই দ্বন্দ্বের সে কোন সুরাহা করতে পারল না। দ্বন্দ্বদীর্ণ চারণীর দোলাচল বৃত্তির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক বেশ বিস্তারিতভাবেই :

ক. চারণীর ভারি বিপদ হল। দুটি প্রতিভা-স্রোতের সম্পর্কে যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হল তাতে পাক খেয়ে খেয়ে তার মাথা এমনই গুলিয়ে গেল যে সে কোনোমতেই ঠিক করে উঠতে পারলে না কোন স্রোতে ভেসে যাবে। আসলে চারণীর একেবারেই মনের জোর ছিল না। যখন যে প্রতিভাটি তার কাছে থাকত তার মনে হত তাকেই সে ভালোবাসে। দুজনের দুরকম কিন্তু প্রায় সমান জোরালো ব্যক্তিত্ব দিনের মধ্যে অন্তত দশবার তাকে পেণ্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক দোলাত আর বাকি সময়টা দুজনের সমান আকর্ষণ অনুভব করে তার মনে হত নিজেকে চুলচেরা দুভাগে ভাগ না করে ফেললে এ টানাটানি সমস্যার আর মীমাংসা নেই।[১১৭]

---

১১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, *মিহি ও মোটা কাহিনী*, মানিক রচনাবলি, (২য় খণ্ড) ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৭৫

১১৭. ঐ, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬

খ. আগে এসেছিল বলে অরবিন্দের কিছু কিছু দখলি স্বত্ব জন্মেছিল কিন্তু মহাব্রত এক রকম কথা বলেই তা বাতিল করে দিলে। এদিক দিয়ে অরবিন্দের চেয়ে সে ছিল বেশি শক্তিমান।. আশ্চর্য ছিল তার কথা বলার ক্ষমতা। তার বক্তব্য রূপ নিত বক্তৃতার এবং তাতে যেখানে অখণ্ডনীয় যুক্তি থাকত না সেখানে থাকত বেগবতী আবেগ, আর যেখানে বেগবতী আবেগ থাকত না সেখানে থাকত অখণ্ডনীয় যুক্তি। দশ মিনিট তার কথা শুনে চারণী ভেসে যেত। তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত না যে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা এই বিস্ময়কর মুখর কবি-প্রতিভাকে সন্তানের মতো প্রতিপালন করা। মহাব্রত চলে যাবার পর অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটা পর্যন্ত চারণী উত্তেজিত হয়ে থাকত। অরবিন্দ এসে বেশি কথা বলত না, যা বলত তাও মৃদুস্বরে, যার প্রধান সুরটা হত আদরের। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে সে ম্লানভাবে একটু হাসত। দেখে চারণীর মন যেত গলে। তার মনে হত মহাব্রতের মুখর প্রেমের চেয়ে অরবিন্দের নিঃশব্দ ভালোবাসা ঢের বেশি কাব্যময়।[১১৮]

গ. চারণীর এই দ্বিধা ও সন্দেহের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা এমনই জটিল যে বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে গেলে মনস্তত্ত্বের গবেষণার মতো শোনাবে। ঘটনাচক্রে প্রতিভা দুজনের একজন যদি কয়েকটা দিনের জন্য দূরে সরে যেত তাহলে সব গোলমালের অবসান হতে পারত, কিন্তু যেহেতু চারণীর কাছে একা থাকার সময় তাদের প্রত্যেকে টের পেত চারণী তাকেই ভালোবাসে, কোনো ঘটনাক্রমেই তাদের একটি দিনের জন্য তফাতে নিয়ে যেতে পারত না, লুকোচুরি খেলার মতো চারণীকে নিয়ে তারা জয়পরাজয়ের খেলা খেলত। সকালে চারণীকে জয় করে যেত মহাব্রত, বিকালে বিজয়ী হত অরবিন্দ। যেদিন চারণীর হৃদয়-দুয়ারে তাদের আবির্ভাব ঘটত একসঙ্গে সেদিন ঠিক কে যে জয়ী হল বুঝতে না

১১৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬

পেরে দুজনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বাড়ি ফিরত, আর দুর্বলচেতা চারণী দ্বিধাসন্দেহের পীড়নে ছটফট করে রাত কাটাত।[১১৯]

একই সঙ্গে অরবিন্দ ও মহাব্রতর প্রতি আধুনিকা চারণীর লিবিডোতাড়িত আসক্তি তাকে মানসিক রোগগ্রস্ত করে তোলে। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে সমস্ত মানসিক রোগের কারণ হলো দু আবেগের দ্বন্দ্ব (emotional conflict)[১২০] । চারণী একই সঙ্গে দুজনের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন গুণের জন্য প্রণয়াসক্ত। মহাব্রতর বেগবান আবেগ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি যেমন তার ভালো লাগত, তেমনি অরবিন্দর নিঃশব্দ ভালোবাসাও তাকে অভিভূত করত। তাই দুজনের কোনো একজনকে বাদ দিয়ে কোনো একজনকে বেছে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেশিরভাগ শারীরিক রোগের মূলে থাকে মানসিক রোগগ্রস্ততা। চারণী তাই যথেষ্ট মোটা হতে আরম্ভ করে। স্লিম থাকার অভিপ্রায়ে সে পেট ভরে খেত না, পুষ্টিকর খাবারও এড়িয়ে চলত। ফলে মোটা হওয়া স্থগিত হলেও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা একে একে দেখা দেয়।

তার মনের মতো তার শরীরটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ক্রমশ দেখা দিল তার অনিদ্রা, অজীর্ণতা ও অম্বলের রোগ — শেষে হলো নার্ভাস ব্রেকডাইন। চারণীর শারীরিক অসুস্থতা তার মানসিক বিকারগ্রস্ততাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তার অসুখের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে মহাব্রত ও অরবিন্দ বার বার তাকে দেখতে ছুটে গেলেও চারণী খবর পেয়ে চেঁচামেচি করে বাইরে থেকেই তাদের বিদেয় করে দেয়। একদিন বাড়ির সকলে শহরের অন্য প্রান্তে বিয়ের নিমন্ত্রণে গেছে। খালি বাড়িতে চারণী অনেক রাত অবধি ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে মরিয়া হয়ে একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলে। লেখকের ভাষায়, "একরাত্রির ঘুম অথবা চিরনিদ্রা কোনটা তার কাম্য ছিল জানবার উপায় নেই, পরদিন অনেক বেলায় তার ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল সে মরে গেছে।"[১২১]

---

১১৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬
১২০. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
১২১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭

চারণী টাইপের মেয়েদের প্রতি মানুষের যে প্রেম ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন লেখক, বাস্তবে দেখা যায় তা অরবিন্দ ও মহাব্রতর জীবনে সত্য হয়ে ওঠে নি। লেখক বলেছেন : "আসলে এ রকম মেয়ের প্রেমেই কেউ পড়ে না। জয় করার জেদটাকে মনে হয় প্রেম। মরে গেলে অথবা সরে গেলে এরকম মেয়েকে মনে রাখার বিশেষ কোনো কারণ থাকে না।"[১২২] চারণীর মৃত্যুতে অরবিন্দ ও মহাব্রত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। লেখক জানিয়েছেন :

> অরবিন্দ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে স্টুডিয়োতে আশ্রয় নিল, মহাব্রত চিনা আর ফিরিঙ্গি হোটেলে রকম-রকম পানীয় চেখে বেড়াতে লাগল। একজন শুকিয়ে যেতে লাগল ঘরের কোণে নীরবে, আর একজন শুকিয়ে যেতে লাগল বাইরে হইচই করে। লড়াই যেন তাদের থামেনি। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তারা যেন চারণীর জন্য পালা দিয়ে শোক করতে লাগল। তাদের প্রতিভায় যারা সন্দেহ করত এবার তাদের সন্দেহ দূর হল। অল্পবিস্তর উন্মত্ততা প্রতিভার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।
>
> তাদের এই অসামাজিক অস্বাভাবিক জীবনযাপনে আত্মীয়স্বজন ব্যথিত হল, প্রতিবাদ করল, বন্ধুবান্ধব হাসিগল্পের আড্ডায় টানবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের নির্লিপ্ত ভাব অব্যাহত রইল। হাসতে না জানলে এ জগতে বন্ধু টেকে না, দুজনের মনোবিকার সহ্য করতে না পেরে বন্ধুরা তাদের রেহাই দিল। ব্যর্থ হয়ে হাল ছাড়ল আত্মীয়স্বজন। শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে গেল।[১২৩]

ফ্রয়েড বলেছেন, জীবনের নির্মম বাস্তবতা ও জটিলতায় Ego ভয় পায় এবং উৎকণ্ঠা অনুভব করে। বহির্জগত তার মনে জাগায় বাস্তব উৎকণ্ঠা।[১২৪] ফ্রয়েড বর্ণিত এই বাস্তব উৎকণ্ঠাই অরবিন্দ ও মহাব্রতকে মনোবিকারের দিকে ঠেলে দেয়।

---

১২২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭

১২৩. ঐ, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

১২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

'কবি ও ভাস্করের লড়াই' গল্পে পরিণামে কবি পরাস্ত হয় এবং ভাস্কর জয়ী হয়। ভাস্কর অরবিন্দ চারণীর মূর্তি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেও কবি মহাব্রত মনোমতো কবিতা রচনায় অপারগ হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। গল্পের শেষাংশে প্রবল ঈর্ষান্ধ, পুরোপুরি বিকারগ্রস্ত মহাব্রত অরবিন্দর তৈরি চারণীর মূর্তি ভেঙে ফেলে। লেখকের ভাষায় :

> মহাব্রতর মাথার ভেতরে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অরবিন্দের হাতুড়ি আর বাটালিকা তুলে নিয়ে চারণীর মুখখানা সে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। সে যেন অসতী স্ত্রীকে সাজা দিচ্ছে। অরবিন্দ সবটুকু জীবনীশক্তি ব্যয় করে এই মূর্তি গড়েছিল। চামড়া দিয়ে হাড়-ঢাকা শরীরে তার একটুও শক্তি ছিল না। এবারও সে তার চারণীকে বাঁচাতে পারলে না।[১২৫]

এ গল্পটি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত নেতিবাচক। গল্পের মধ্যে তিনি বাস্তব সংস্পর্শ খুঁজে পান নি। তাঁর ভাষায় :

> 'কবি ও ভাস্করের লড়াই' – এ লেখক যে প্রেমের দ্বন্দ্ব-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা আদর্শ ভাবলোকের ঊর্ধ্বাকাশেই বিচরণ করিয়াছে ; ইহার মধ্যে বাস্তব সংস্পর্শ অতি গৌণ।[১২৬]

তবে, রহমান হাবিবের উপলব্ধি ভিন্নতর :

> চারণীর মৃত্যুর পর কবি ও ভাস্কর-উভয়েই তাদের প্রণয়িণীকে তাদের শিল্পকর্মে অমর করে রাখতে চাইলে কবির ঈর্ষাতাড়িত তন্ময়তায় ভাস্কর মনোবাধাগ্রস্ত হয়। একটি মহৎ সৃষ্টিকে সম্ভাবিত করতে যে ঈর্ষার ঊর্ধ্বে উঠে মহৎ জীবনবোধকে অঙ্গীকার করতে হয়, সেই শিল্পগত সম্পর্কই এখানে প্রস্ফুট।[১২৭]

---

১২৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ও ভাস্করের লড়াই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

১২৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৪০

১২৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

'মিহি ও মোটা কাহিনী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'শৈলজ শিলা' গল্পে জৈব প্রবৃত্তির যে কদাকার রূপ প্রকাশিত হতে দেখা যায়, তাতে ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্বই রূপময় হয়ে উঠেছে।[১২৮] দুটি চরিত্রের আচরণে লিবিডোচেতনা প্রবল বিস্তার লাভ করেছে। প্রথমটি হচ্ছে এ গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র শিলার জন্মদাতা। ইতর এই লোকটি তার বাল্যবধবা কন্যার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেছিল। শিলা এই পাপের ফসল। দ্বিতীয় চরিত্রটি হচ্ছে উত্তম পুরুষে বর্ণিত এ গল্পের গল্পকথক স্বয়ং, যিনি সদ্যোজাত, পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যাক্ত শিলাকে আশ্রয় দান ও প্রতিপালন করে বড় করেছিলেন। ফ্রয়েডের মতে, অচেতন মনের যৌন কামনা-বাসনা মানুষকে নিয়ত চালিত করে। এ প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের বক্তব্য স্মরণযোগ্য : Id হলো মনের সবচেয়ে নিগূঢ়তর স্তর। দেহ ও মনের যাবতীয় ইচ্ছা Id থেকে উদ্ভূত। আমরা যাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলি। Id এর মধ্যে যা আছে, তার সবগুলোকেই আমরা নঞ অর্থে প্রকাশ করতে পারি। Id যুক্তি মানে না, বিবেকবোধ দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। Id এর মূল্যবোধ বা ভালোমন্দ বলে কোনো জিনিস নেই। Id নীতি বোঝে না। Id এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সুখভোগ, বাস্তবতার ধার সে ধারে না। Id এর এই শক্তিই লিবিডো বা কামপ্রেরণা। Id তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কামপ্রেরণার দ্বারা বহির্জগতকে আকর্ষণ করে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় Object-cathexis বা বিষয়াকর্ষণ।[১২৯] ফ্রয়েডের ভাষায়, '... all my experience shows that these Psychoneuroses are based on sexual instinctual forces.'[১৩০]

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে এ গল্পে গল্পকথক চরিত্রটির বিকারগ্রস্ততার কারণ বিশেষণ করা যায়। ফ্রয়েডের মতে, লিবিডো বিকাশের পথে কোন বাধা পেলে বা শৈশবকালীন কোন আবেগ কেন্দ্রে সংবন্ধিত হলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হতে পারে। মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়সূত্রে ফ্রয়েড বলেছেন, লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি এবং সংবন্ধন (fixation)— এ দুটি ঘটনাই এজন্য প্রধানত দায়ী। লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি বলতে তিনি কোন বিশেষ যৌন কামনার

---

১২৮. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

১২৯. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬

১৩০. *Three Essays On The Theory Of Sexuality*, tr. by James Strachey, London, 1962, P. 29

ব্যর্থতাকেই বোঝাতে চান।[১৩১] এ ছাড়া পরিণত বয়সে কোন গুরুতর মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফলে সম্মুখে প্রবহমান লিবিডো পশ্চাৎমুখী হয়ে তার পুরনো শৈশবের অবস্থানগুলিতে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়।[১৩২] এর নাম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (regression)। মনোব্যাধি সৃষ্টিতে এই প্রত্যাবৃত্তিরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফ্রয়েডের নিজের ভাষায় :

> Inhibitions in the course of its development manifest themselves as the various disturbances of sexual life. Fixations of the libido to conditions at earlier phases are then found ...[১৩৩]

এ গল্পের উত্তমপুরুষ-চরিত্রের বিবাহ-ব্যর্থতায় আমরা লিবিডোর বাধাপ্রাপ্তি ও সংবন্ধন এবং আশ্রিতা তরুণীর প্রতি তার আকর্ষণের মধ্যে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করি।[১৩৪] আশ্রিতা, প্রতিপালিতা কন্যাসম কিশোরী শিলার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেন গল্পকথক। উত্তমপুরুষে তিনি বলেন :

> পনেরো বছর পরে ভূমিকম্প!
>
> বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়া যৌবনের শক্ত গারদ করিয়াছিলাম, তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির!
>
> মেয়েটা গুহা আলো করিয়া জন্মিয়াছিল, এখন আমার বাড়িটা এমন আলো করিয়াছে যে, এই পৌঢ় বয়সে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।
>
> একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া ফরসা একখানি কাপড় পরিয়া চঞ্চলপদে সারাদিন চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার পর আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া

---

১৩১. Sigmund Freud, *an Outline of Psychoanalysis*, tr. by James Strachey, New York, 1963, P. 22-24

১৩২. ঐ, পৃ. ৩১

১৩৩. ঐ, পৃ. ৩১

১৩৪. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

শিলা এ গল্পের প্রথম ভাগে হাসিখুশি মেয়ে ছিল। একদিন এক বর্ষাব্যাকুল দ্বিপ্রহরে ফ্রয়েডীয় আবেগের প্রাবল্যে কথক দৃশ্যত ঘুমন্ত শিলাকে চুম্বন করলে সে ধড়মড় করে উঠে বসে এবং তার হাসিখুশি ভাবটি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। কথক কোনভাবেই শিলাকে আয়ত্তে আনতে পারেন না। ইতোমধ্যে ভূপেনের সঙ্গে অন্দরমহলে শিলার কথোপকথন, সাড়ে তিনশ টাকা মাইনে পাওয়া ভূপেনের সরাসরি বিবাহ প্রস্তাব সবকিছুই কথকের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠায় দিন চারেকের মধ্যে তল্পিতল্পা বেঁধে কথক শিলাকে নিয়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমান। অতঃপর পশ্চিমে একটা শহরের প্রান্তে নিরালা বাগানবাড়িতে শিলাকে নিয়ে নিভৃত নীড় রচনা করেন। এ পর্যায়ে শিলার মানসিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

> আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর হইয়া শিলা আমার তেমনই সেবা করিতেছে। পরিহাস করিলে হাসে না, মিষ্টি কথা বলিলে শ্রান্ত চোখ তুলিয়া তাকায়, হাত ধরিয়া সোহাগ করিতে গেলে কাগজের মতো সাদা আর পাথরের মতো শক্ত হইয়া ওঠে।
>
> ইঙ্গিতে বলি, বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই শিলা।
>
> সে বলে, মরাটাও তো কঠিন নয় দাদু।[১৪০]

অন্তরস্থিত লিবিডোর প্রবল তাড়নায় জর্জরিত, ক্রমাগত অবদমনের ফলে বিকারগ্রস্ত কথক নাতনি হিসেবে পরিচিত, কন্যাসম আশ্রিতা শিলার প্রতি আসক্তিকে 'ভালোবাসা' বলে মনে করেন। গল্পের পাঠক পাঠিকার উদ্দেশে কৈফিয়ত দেবার ছলে গল্পকথকের উক্তি এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য :

> শিলাকে নিয়া আমি যে আদিকাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে বড়ো, একথা মানা আমার পক্ষে অত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কী লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব! বিলাইয়া দিবার জন্য এত কষ্টে

---

১৪০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজ শিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯

এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভুপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া? আপনারা ন্যায়বিচার করিবেন।

আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালোবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি, আমার ভালোবাসাও তেমনই। দেড়শো কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যা নই, আমার এই ভালোবাসাও কেমন মিথ্যা নয়।

আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁসিয়া কাটা তরুর মতো — শাখা নাই, কিশলয় নাই, পাতা নাই, ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপরে শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নিচে সরস সতেজ মূল, যাহার রস সঞ্চয় কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই, ইহার মধ্যে আমিও নাই, শিলা নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শাশ্বত প্রেম, পশু-পাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দুদিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিলাইব এ প্রেম তখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।[১৪১]

গল্পের শেষে গল্পকথকের বিকারগ্রস্ততাই মূর্ত হয়ে উঠেছে :

ক. বাহিরে কোনোদিন জ্যোৎস্না থাকে, কোনোদিন থাকে না, কোনোদিন বৃষ্টি পড়ে, কোনোদিন পড়ে না। দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকি। ঘুম আসে না, আসিবে না জানি, সে জন্য ভাবিও না। কিন্তু ঘরের বাতাস যেন নিশ্বাসের পক্ষে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। উপরে কাঁটা, নিচে কাঁটা দিয়া কে যেন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়াছে মনে হয়।[১৪২]

---

১৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজ শিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯
১৪২. ঐ, পৃ. ৩৯৯

খ. নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়ি। শৈলে যার জন্ম শিলা যার নাম, সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।[১৪৩]

এ লেখার বিষয় সম্পর্কে ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন, "এ গল্পে মনই প্রধান। মননে যন্ত্রণা। কামনার আগুনে জ্বলছে বাৎসল্যের পবিত্রতা।"[১৪৪] সরোজমোহন মিত্র বলেছেন, "'শৈলজ শিলা' আরেকটি বিকৃতমনের চমৎকার গল্প।"[১৪৫] গোপেশচন্দ্র দত্তের মতে গল্পটি সর্বাংশে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক।[১৪৬] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মনে করেন, 'শৈলজ শিলা' গল্পে পালকপিতা নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে যৌবনপ্রাপ্তা পালিতা কন্যার প্রতি যে উন্মত্ত কামনায় বিকৃত-বুদ্ধি হয়েছেন, তার মধ্যেও বিকৃত যৌন মনস্তত্ত্বের প্রতি লেখকের ঐকান্তিক প্রবণতাই সূচিত হবে।[১৪৭]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> 'শৈলজ শিলা' গল্পটি পরিণতবয়স্ক নিঃসম্পর্ক অভিভাবকের তরুণী শিলার প্রতি অনিবার্য প্রণয়সঞ্চারের কাহিনী। প্রৌঢ়ের এই অস্বাভাবিক প্রেমনিবেদনে তরুণীর হাসিখুশি এক বিষাদগম্ভীর মৌন ঔদাসীন্যে পরিবর্তিত হইয়াছে।[১৪৮]

নিতাই বসুর অভিমত :

> "শৈলজ শিলা' গল্পের নায়কের একাকীত্বকে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যে তার পক্ষে কন্যাস্থানীয়া শিলার মধ্যে আত্মরতির সন্ধান করার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সন্ধান মেলে।[১৪৯]

রহমান হাবিব বলেছেন :

---

১৪৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজ শিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯
১৪৪. সৈয়দ আজিজুল হক এর বই থেকে উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩
১৪৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
১৪৬. *মানিক স্মৃতি*, সুজিতকুমার নাগ (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৫
১৪৭. *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮
১৪৮. জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০
১৪৯. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৬৩

শিলার যৌবন-উদ্‌গত শরীরী লাবণ্য তার পালক অভিভাবককে প্রচণ্ড রিরংসাকাতর করে তুলেছে শিলার প্রতি। অবিবাহিত সে উত্তমপুরুষরূপী শিলার পালকের মধ্যে শিলার জন্মবৃত্তান্তের অজাচার জানার কারণে তার মনমধ্যে যৌনাচারের বিকৃতি অনুপ্রবেশ করা বিচিত্র নয়। তাছাড়া যৌবন-টগবগ শিলার দেহসৌন্দর্য তার কামনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত করে থাকতে পারে; যেহেতু শিলার সাথে তার কোন রক্তসম্পর্ক ছিল না। বয়স অধিক হলেও মানুষের মধ্যে যে কখন কিভাবে যৌনতার উদ্‌গম হতে পারে – তারই মানবসম্পর্কের ছায়াপাত গল্পটিতে ঘটেছে। অজাচারে সৃষ্ট যে শিলা, বিকৃতির অন্ধকূপে যার জন্ম– তার মধ্যে যে তার পালক-অভিভাবকের প্রতিসহ অন্য কারো প্রতি বিকৃত যৌনাভিরুচি জাগ্রত হয়নি - এর মাধ্যমে মানবসম্পর্কের মধ্যে যে বিশুদ্ধ যৌন-অনুভাবনারও উৎসারণ থাকে – সেই বিষয়টিই স্পষ্টতা পায়।[১৫০]

'মিহি ও মোটা কাহিনী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'খুকি' একটি প্রণয়মধুর কাহিনী। আটাশ বছরের যুবক সৌম্য ও আঠার বছর বয়সী কাদম্বিনী ওরফে খুকির প্রণয় থেকে পরিণয় পর্যন্ত স্তরবহুল প্রণয়সম্পর্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈল্পিক নিরাসক্তিতে রূপায়িত করেছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মানসিক ভিন্নতা প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব এ গল্পে গল্পবয়ন ও চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন :

> ... মানিক এ-গল্পে প্রণয়াবেগের ক্ষেত্রে তরুণ ও তরুণীর আচরণ, প্রকাশভঙ্গি ও চরিতার্থতামুখী সক্রিয়তাসম্পর্কিত ভিন্নতাগুলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশেষণ করেছেন। নরনারীর মধ্যে শারীরবৃত্তীয় যে-প্রভেদ, তা তাদের আবেগ গঠনেও পার্থক্য সৃষ্টি করে — শিশুকাল থেকেই এর সূচনা হয়, বিশেষত যখন তারা নিজ নিজ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিন্নতাকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করে। তরুণ অপেক্ষা তরুণীর মধ্যে এসব কারণেই অন্তর্মুখী লজ্জাতুর স্বভাব, প্রণয়াবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ঝিনুকবৈশিষ্ট্য, একধরনের হীনমন্যতা, অবদমনস্পৃহা, কঠিন সংযম প্রভৃতি গড়ে

---

১৫০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

ওঠে। হৃদয়াবেগকে সহজে প্রকাশ না করার অভ্যাস তরুণীমনে যে স্থিরতা কিংবা অচঞ্চল বাস্তববুদ্ধির জন্ম দেয়, একই বয়সের তরুণ তা থেকে থাকে বঞ্চিত।[১৫১]

মনোবিশ্লেষণ সূত্রে ফ্রয়েড নারী-পুরুষের স্বভাবগত পার্থক্য নির্দেশের সময় নারী-পুরুষের শরীরগত ভিন্নতার উপর প্রাধান্য আরোপ করেছেন। ফ্রয়েডের ভাষায় :

ক. The development of inhibitions of sexuality (shame, disgust, pity, etc) takes place in little girls earlier and in the face of less resistance than in boys; the tendency to sexual repression seems in general to be greater; and, where the component instincts of sexuality appear, they prefer the passive form.[১৫২]

খ. Puberty, which brings about so great an accession of libido in boys, is marked in girls by a fresh wave of repression ... The intensification of the brake upon sexuality brought about by pubertal repression in women serves as a stimulus to the libido in men and causes an increase of its activity. Along with this heightening of libido there is also an increase of sexual overvaluation which only emerges in full force in relation to a woman who holds herself back and who denies her sexuality.[১৫৩]

ডাক্তার অসমঞ্জ রক্ষিতের মধ্যবিত্ত পরিবারে আদুরে মেয়ে হিসেবে বেড়ে ওঠা কাদম্বিনীর। ধনীর দুলাল সৌম্যের যখন তখন আবির্ভাবে রক্ষিত পরিবারের কোন আপত্তি ছিল না বরং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান সৌম্যের প্রতি সবার একটা সমীহের ভাব ছিল। কাদম্বিনী ও সৌম্য পরস্পর পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসলেও কাদম্বিনীর আচরণ ছিল অত্যন্ত সংযত, দৃশ্যত নিরাবেগের; অপরদিকে সৌম্য স্পষ্ট করেই ঘোষণা দিয়েছিল যে জীবনে সে বিয়ে টিয়ে করবে

---

১৫১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬
১৫২. *Three Essays On The Theory Of Sexuality*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
১৫৩. ঐ, পৃ. ৮৬-৮৭

না। বিয়ে প্রসঙ্গে তার ধারণা ছিল যে বিয়ের পর ভালোবাসা নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে বিয়ের পর আবেগহীন অভ্যাসের জন্য ভালোবাসা ফিকে হয়ে আসে। সৌম্যের বিবাহ বিষয়ক বক্তব্যে ফ্রয়েডীয় এই তত্ত্বই প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

> সৌম্য তার গাম্ভীর্যকে আরো গম্ভীর করিয়া বলিল, কিন্তু তুই তো জানিস খুকি বিয়ে-টিয়ে আমি করতে পারব না? তোকে যেদিন বিয়ে করব, সেই দিন তোর জন্যে আমার সমস্ত ভালোবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে। তুই তো জানিস আমি তা সইতে পারব না।
>
> কাদম্বিনী সহজভাবেই বলিল, দুবার জানিস বললে। কী করে জানব আমি? কোনোদিন বলেছ?
>
> বলিনি? — সৌম্য যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।
>
> কবে বললে? বিয়ে করলেই ভালোবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে কেন বলো তো শুনি।
>
> সৌম্য বলিল। পাঁচ মিনিটে তার নিজের কাছেও প্রায় দুর্বোধ্য জটিল যুক্তিতর্ক বিশেষণ দিয়া এমনভাবে কথাটা প্রমাণ করিয়া দিল যে, কাদম্বিনীর আর বলিবার কিছু রহিল না।[১৫৪]

সৌম্য মুখে যত কথাই বলুক, সে আসলে দেখতে চায় তার বিয়ে না করার ঘোষণায় কাদম্বিনীর করুণ ও ভীত সন্ত্রস্ত প্রতিক্রিয়া। প্রবল চাপা স্বভাবের মেয়ে কাদম্বিনীর সেরূপ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না বলে রাগে সৌম্যের গা জ্বলে যায়। লেখক বর্ণনা করেন :

> রাগে সৌম্যের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। এখনও ভাবনা নাই কাদম্বিনীর, এখনও তার মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া যাইতেছে না! অন্য মেয়ে হইলে আতঙ্কে এতক্ষণ যে আধমরা হইয়া যাইত। কিন্তু তার শেষ কথাটা কাদম্বিনী যেভাবে গ্রহণ করিল, রাগের বদলে সৌম্য তাতে একেবারে বনিয়া গেল থ।[১৫৫]

---

১৫৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খুকি, *মিহি ও মোটা কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯

১৫৫. ঐ, পৃ. ৪০৯

বাসায় ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সৌম্য ভাবে, '... কান্নাবিহীন, অভিমানবিহীন এ কোন দেশী রাগ ছেলেমানুষ মেয়েটার? কথাগুলি শেষ করিয়াও তো অন্তত একটু তার কাঁদা উচিত ছিল।'[১৫৬]

জামশেদপুরের রিটায়ার্ড সাবজজের ছেলে, আড়াইশো টাকা মাইনে পাওয়া পাত্র দিব্যেন্দু কাদম্বিনীকে দেখতে আসার পাকা ব্যবস্থার মধ্যেও পাত্রী কাদম্বিনীর ভাবলেশহীনতা সৌম্যকে ভাবিয়ে তোলে। বলা বাহুল্য যে, নিরাবেগ কাদম্বিনীর হাবভাব তার কাছে অসহ্য ঠেকে। লেখকের বর্ণনা :

> দুঘন্টা অপেক্ষা করিয়া সৌম্যই শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, জামশেদপুর থেকে তোকে দেখতে আসবে, না?
>
> কাদম্বিনী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।
>
> আসবে। বেশ মজা হবে, না?
>
> মজা হইবে? কাদম্বিনীর নির্ভয় নিশ্চিন্ত কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানা দেখিতে দেখিতে সৌম্যের মনে হইল সে যেন ম্যাজিক দেখিতেছে। কী হবে এবার? — বলিয়া যার কাঁদোকাঁদো হওয়া উচিত ছিল, এ ব্যাপারটা তার কাছে শুধু মজা।[১৫৭]

অভিমান, কান্নাকাটি না করলেও, বাঁধহীন আবেগে বাকরুদ্ধ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করলেও সংযতভাবে সৌম্যকে সে বাবার কাছে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করার কথা বলে। কাদম্বিনী কথাটি বলে আবেগহীনভাবে, সৌম্য প্রতিক্রিয়া জানায় তার স্বভাবসুলভ বিবাহবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে। তাদের সংলাপ :

> পরশু তোকে দেখতে আসবে, না?
>
> হ্যাঁ। খুব হিংসে হচ্ছে নাকি তোমার? বাবাকে বলো না গিয়ে, এখ্‌খুনি বাবা ওদের টেলিগ্রাম করে আসতে বারণ করে দেবে।

---

১৫৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খুকি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০
১৫৭. ঐ, পৃ. ৪০৯

> সৌম্য ম্লানমুখে বলিয়াছিল, সত্যি হিংসে হচ্ছে। কিন্তু জানিস তো, বিয়ে আমি কোনোদিন করব না।
>
> কাদম্বিনী বলিল, তা না করলে, আমাকে দোষ দিয়ো না কিন্তু শেষে! ওদের দেখতে আসা বন্ধ করার উপায় বলে দিলাম।[১৫৮]

কনে দেখার অনুষ্ঠানে সৌম্য উপস্থিত ছিল। আসরে কাদম্বিনীর সহজ-স্বাভাবিক পাত্রীসুলভ আচরণ সৌম্যকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। কনে দেখার আসরে বিচলিত, হতাশ, ক্ষুব্ধ মানস পট উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক দীর্ঘ বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন :

> আগাগোড়া কাদম্বিনীকে সে অবাক হইয়া লক্ষ করিয়াছে। চার মাস ধরিয়া সে যাকে ভালোবাসিয়াছে, তার সামনে কাদম্বিনীর মতো মেয়ে যে চারজন অপরিচিত যুবকের কাছে এমন নিখুঁতভাবে নিজকে দেখাইতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সৌম্যের ছিল না। এ কী অভিনয়? হে ভগবান, এ কী অভিনয় তার কাদম্বিনীর? কিংবা তার চার মাসের প্রেমটাই তার কাছে কিছুই নয়, প্রতিদিনকার ডালভাত খাওয়া, সাজগোজ করার মতো তুচ্ছ? তাই সে চার মাস তার সঙ্গে ভালোবাসার খেলা না খেলিলেও যেমনভাবে নিজেকে দেখাইতে পারিত, আজও অবিকল তেমনইভাবে দেখাইয়া যাইতে পারিল? এমন একটা রেখা সে কাদম্বিনীর মুখে দেখিতে পাইল না, এমন একটি ভঙ্গি তার চোখে পড়িল না, যার মধ্যে গত চার মাসের একটি মিনিটকে সে খুঁজিয়া পায়![১৫৯]

ঘটনাক্রম সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেলে সৌম্য হঠাৎ তার স্বভাবসুলভ তত্ত্বাশ্রিত ভণিতা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, কাদম্বিনীকে বলে, "তোর বাবার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে খুকি। আগে বলে আসি ..."[১৬০] পাঠক বুঝে নেয়, সৌম্য কাদম্বিনীর বাবার কাছে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং রক্ষিত পরিবার সাগ্রহে তাতে সম্মতি দান করে।

---

১৫৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খুকি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০

১৫৯. ঐ, পৃ. ৪১১

১৬০. ঐ, পৃ. ৪১৩

গল্পের শেষ দৃশ্যে কাদম্বিনী-সৌম্যের সুখময় বাসর যাপনের চিত্র পাওয়া যায়। কাদম্বিনী যে সৌম্যকে প্রবল আবেগের সঙ্গেই ভালোবাসত, এ দৃশ্যে পাঠকের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৌম্যের বিবাহবিদ্বেষী মানসিকতার পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী – এটিও পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক বর্ণনা করেন :

> বাসরঘরে, মেয়েরা চলিয়া যাওয়ার পর ঘরে যখন সকলের হাসি-তামাসা গানের সুরের রেশটুকুও বোধ হয় মিলাইয়া যাওয়ার সময় পায় নাই, সৌম্যের বুকে মুখ গুঁজিয়া কাদম্বিনী তখন শুরু করে কান্না। শুকনো গ্রীষ্মের পর বর্ষার মতো প্রবল, অশান্ত, অফুরন্ত কান্না।
>
> কাঁদিতে কাঁদিতে কোনোরকমে বলে, তুমি আমায় বিয়ে না করলে আমি বিষ খেয়ে মরে যেতাম।
>
> কাঁদে সে ঘণ্টাখানেকের কম নয়। মুখে হাসি ফুটিতে লাগে আরো প্রায় আধঘণ্টা।
>
> আমাকে তুমি এবার ঘেন্না করবে?
>
> তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোকে ঘেন্না করতে পারব মনে হয় না খুকি।[১৬১]

এ গল্পে সৌম্যের বারবার মাথা ধরা ও মাথা ঘোরার কথা উলেখ আছে। ফ্রয়েডের মতে যৌন অতৃপ্তিই মাথা ব্যথা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরার কারণ।[১৬২] অবিবাহিত সৌম্য সংগত কারণেই শিরঃপীড়ায় ভুগেছে। এ গল্প সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত নিম্নরূপ :

> 'খুকী' গল্প এক সরল, ভাবাবেগহীন বালিকার নিকট প্রণয়কলাপক্ব যুবার আচরণের সমস্ত জটিল মারপেঁচ ও সূক্ষ্ম অভিনয়কৌশল কেমন করিয়া প্রতিহত হইয়াছে তাহারই বিবরণ। বালিকা কাদম্বিনীর নিকট যুবক সৌম্য নিজ অর্ধ-আন্তরিক আবেগের কথা জানাইয়াছে ও তাহার মনে হতাশ-প্রণয়-ক্লিষ্টা রোমান্সের নায়িকার অশান্ত ছটফটানি জাগাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু কাদম্বিনীর সারল্য ও স্থূল অনুভূতির কঠিন বর্মে ঠেকিয়া এই সমস্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সৌম্য

---

১৬১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খুকি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩

১৬২. *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, অরূপরতন বসু অনু., পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

> কাদম্বিনীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহজ বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সৌম্যের প্রেমাভিনয়ের বিভিন্ন স্তরগুলি ও কাদম্বিনীর যথাযথ প্রতিক্রিয়াসমূহের বর্ণনায় লেখক উপভোগ্য মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন।[১৬৩]

রহমান হাবিবের অভিমত বিজ্ঞানমনস্ক ও সমগ্রতাসন্ধানী :

> অষ্টাদশী কাদম্বরীর মধ্যে আমরা সৌম্যের প্রতি আত্মনিবেদন এবং প্রণয়চাঞ্চল্য লক্ষ করলেও তার মধ্যেই আমরা একটি সংযম-সংহত সংহতি এবং আপাতকাঠিন্যের বর্মের অন্তরালে একটি দুর্বলহৃদয় নারীচিত্ত পর্যবেক্ষণ করি। কাদম্বিনীর এ আচরণের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান – উভয়েরই অন্তর্গত যোগাযোগ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এখানে মানিক নারীর শরীর ও মনের সম্পর্কের সাথে তার শরীরবৃত্তীয় ও মনোবৃত্তীয় সম্পর্ককে প্রতিপাদন করেছেন ...[১৬৪]

ফ্রয়েডের প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব গল্পে ব্যাপক, গভীর ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, 'সরীসৃপ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাকালের জটার জট' গল্প তার মধ্যে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। দুই প্রতিবেশী গৃহে প্রায় সব চরিত্র — সুচিত্রা, সুলতা, যাদব, মনোরমা, সতীশ — মনোবিকারগ্রস্ত, অস্বাভাবিক যৌন আকর্ষণের পোষক। যুবতীর বালকপ্রণয়, যুবকের মাসিপ্রণয়, তরুণীবধূর পিতৃপ্রণয়, শ্বশুরের পুত্রবধূআসক্তি, স্বামী ও সন্তানহারা মাতার পুত্রপ্রণয় এ গল্পের অসুস্থ মনোভূমিকে কলুষতাযুক্ত করেছে।[১৬৫]

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, মাতার প্রতি পুত্রের এবং পিতার প্রতি কন্যার পক্ষপাতমূলক যে আকর্ষণ, তা সর্বাংশে যৌনতামণ্ডিত। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন ইডিপাস ও ইলেকট্রা কমপেক্স। অন্যদিকে মনোবিকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড লিবিডোর সংবদ্ধন (fixation) ও প্রত্যাবৃত্তির (regression) কথাও বলেছেন। শৈশবকাল থেকে লিবিডো তার

---

১৬৩. জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

১৬৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১৬৫. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩

ক্রমবিকাশের কোনোস্তরে এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যে, তার স্বাভাবিক বিকাশ আর সম্ভবপর হয় না অর্থাৎ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওই আবেগ-কেন্দ্র থেকে লিবিডোর মুক্তি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এরূপ সংবন্ধনের ফলে স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে লিবিডো স্থবিরতাপ্রাপ্ত হয়। ফ্রয়েডের মতে, এ ছাড়া সংবন্ধন ঘটতে পারে আরেকভাবে। এক্ষেত্রে লিবিডো স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। কিন্তু একটি স্তরে পৌঁছে ওই স্তরের কোন বস্তু-আকর্ষণে সমর্থ না হয়ে লিবিডো তার সম্মুখগতি উপেক্ষা করে পশ্চাদ্‌গতি অর্জন করে। এরই নাম প্রত্যাবৃত্তি। লিবিডোর ক্রমবিকাশের সময় শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রগুলো যদি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয় তাহলে, এ অবস্থায়, লিবিডো ওইসব ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।[১৬৬] 'মহাকালের জটার জট' গল্পের চরিত্রগুলোর অস্বাভাবিক, অসুস্থ আচরণসমূহের মধ্যে ইডিপাস কমপেক্স, ইলেকট্রা কমপেক্স এবং লিবিডোর সংবন্ধন ও প্রত্যাবৃত্তিসংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় মনোবিশেষণের সকল ব্যাখ্যাই অনুসন্ধানযোগ্য। মানবমনে লিবিডোর এই রহস্যজটিলতার বৈচিত্র্যই প্রজনন ও সংহারশক্তির আধার শিব তথা মহাকালের জটার জট রূপে প্রতিকায়িত হয়েছে এ গল্পে।[১৬৭]

গভীর অনুজমমতা পূর্ণযুবতী সুচিত্রার লিবিডো সংবন্ধনের মূলে ক্রিয়াশীল। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর লিবিডো সংবন্ধনই মৃত ভাইয়ের সমবয়সী বালক পঞ্চুর প্রতি তার অন্ধ, উগ্র প্রণয়কল্পনায় রূপান্তরিত হয়। মানিকের বর্ণনায় মূর্ত হয়ে ওঠে সুচিত্রার এই বিকৃতি :

> পঞ্চু ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ে। সরমার ছোটো ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে অত বড়োই হইত এতদিনে। সুচিত্রার বিকৃত মনে এই ভাইটির জন্য কেমন করিয়া একটা আশ্চর্য প্রখর মমতা জন্মিয়াছিল, খুব সম্ভব সেই ভালোবাসাই এখন পাশের বাড়ির গম্ভীর প্রকৃতি ছেলেটির উপর পড়িয়াছে; পাগল মেয়ের অন্ধ উগ্র ভালোবাসা। প্রকাশটি বিচিত্র। পাঁচুর স্কুল বন্ধ থাকার দিনটির প্রতীক্ষায় সুচিত্রা ছটফট করে, অন্যদিন তার কাছে পাঁচুর বেশিক্ষণ থাকা নিষেধ, তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখিয়া পাঁচু মানুষ হোক সুচিত্রার এই আগ্রহ একেবারে নিষ্ঠুর। ছুটির দিন দুপুরটা পাঁচু

---

১৬৬. Sigmund Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality,* পূর্বোক্ত See, Chapter : The Finding of an object, পৃ. ৮৮-৯৬

১৬৭. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

> তার কাছে থাকে। সকালে পঞ্চুর পড়া চাই, বেশ মনোযোগ দিয়া পড়া চাই, সুচিত্রার মাথার দিব্যি।
>
> খাওয়াদাওয়ার পর এগারোটা কি বারোটার সময় সলজ্জভাবে পঞ্চু আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র তাহাকে ভিতরে নিয়া গিয়া সুচিত্রা ঘরে দুয়ার দেয়। পাঁচটা অবধি ছেলেটিকে লইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সোহাগ করিয়াও তার যেন তৃপ্তি হয় না।[১৬৮]

হেমন্তর স্ত্রী সুলতার পিতৃপ্রণয় এবং পরিশেষে শ্বশুরপ্রতিম যাদবের প্রতি তার আসক্তির কারণ বিবিধ। প্রথমত, হেমন্ত লিবিডো সংবন্ধনের ফলে পরিণত বয়সেও বালসুলভ আচরণ করে। স্বামীর এই বালস্বভাব সুলতাকে অতৃপ্ত রাখে। লিবিডোর প্রত্যাবর্তন এবং বাল্যে তার সংবন্ধনের ফলে সুলতার মধ্যে পিতৃ-আকর্ষণ তীব্র ও তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। মানিকের ভাষায় :

> বাবাকে সুলতা বড়ো ভালোবাসিত। সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত পিতার স্নেহের মূল্যে নিজের সমস্ত জীবনটা সে বিলাইয়া দিয়াছে, গাঢ় সুমিষ্ট মধুর তলে তার যেন আকণ্ঠ সমাধি। তুলিয়া আনা সত্ত্বেও মধুপাত্রে নিমজ্জিত মক্ষিকার মতো এখনও সে মধুর বন্ধন সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। এবং তারই ফলে অনড় অচল স্থবির তাহার জীবন, অচেনা অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে তাই একা বাঁচিয়া থাকা।
>
> বাবাকে মনে পড়িলে এই বৃন্তচ্যুতির অনুভূতি সুলতার অসহ্য হইয়া ওঠে। মনে হয়, জীবনে পাড়ি জমাইবার জন্য ছোটো একটি ডিঙিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া জাহাজ নিয়া পিতা তাহার চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন — এ ডিঙি সামনেও আগায় না ডুবিতেও চায় না, এ পারের তীরের কাছে অল্প ঢেউয়ে টলমল করে। বাস্তবিক, জীবন এখানে এমন অগভীর যে খেয়া ডিঙি চড়ার বালিতে ঠেকিয়া গিয়াছে বলিয়াই সুলতা সন্দেহ করে।[১৬৯]

---

১৬৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকালের জটার জট, *সরীসৃপ*, মানিক রচনাবলি, (২য় খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৫১

১৬৯. ঐ, পৃ. ৪৫৩

সুলতার লিবিডো বয়সের সমান্তরালে উপযুক্ত বিষয়াকর্ষণে সমর্থ না হয়ে যখন প্রত্যাগমনে বাধ্য হয়, মনের মধ্যে সুপ্ত ইলেকট্রা কমপেক্সই তখন তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। কিন্তু পিতার মৃত্যুজনিত অনুপস্থিতির ফলে বিবাহিত জীবনে এই পিতৃ-আকর্ষণই পল্লবিত হয় শ্বশুরপ্রতিম যাদবকে আশ্রয় করে। পিতৃস্থানে পিতৃসম যাদবকে বিষয় হিসেবে আকর্ষণ করে এভাবেই অবচেতন মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উপায় খোঁজে সুলতা। অনুপযুক্ত স্বামীর বালখিল্যতার ফলে সুলতার জীবনে অপূর্ণতা, গ্লানি, হতাশা ও নৈঃসঙ্গ্যের যে পীড়ন, যাদবের সাহচর্য সেক্ষেত্রে এক মধুময় সুবাতাস।[১৭০] সুলতার এই মনোবৃত্তি উন্মোচনসূত্রে লেখক বলেন :

> মনোরমার কাছে পৌঁছিবার পূর্বে দেখা হইল যাদবের সঙ্গে।
>
> সুলতার কুঞ্চিত ভ্রু-দুটি সরল হইয়া উঠিল, মুখের ক্লিষ্টভাব মিলাইয়া গেল। তার মনে হইল, আজ সারাদিন সকল কাজের ফাঁকে সকল দুশ্চিন্তার আড়ালে ইহার সঙ্গই সে কামনা করিয়াছে। যে শূন্যতা সারাদিন তাহাকে আজ পীড়ন করিয়াছে, ইহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তাহা ভরাট হইয়া গেল।[১৭১]

অন্যদিকে যাদবের আচরণ ব্যাখ্যায়ও লিবিডো সংবন্ধনের প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে পড়ে। তেইশ বছর পূর্বে প্রথম স্ত্রী শান্তির মৃত্যু হলেও যাদবের কল্পনারাজ্যে আজও সে তরুণী বধূ। যুবতী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের তীব্রতা যাদবের লিবিডো সংবন্ধনের কারণ।[১৭২] সুলতার সঙ্গে যাদবের কিছু ঘটনা ও তাৎপর্যময় উক্তি এখানে স্মরণযোগ্য :

> ক. আমার প্রথম স্ত্রীর ছবি ছোটোবউ। মরবার কয়েক মাস আগে নিজেই তুলেছিলাম ভালো ওঠেনি।
>
> আপনার দু বিয়ে!
>
> যাদব হাসিলেন।
>
> মনোর মা জানেন?

---

১৭০. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫

১৭১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকালের জটার জট, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭

১৭২. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

> জানেন বৈকি! খুব ভালো করেই জানেন।
>
> সুলতা বুকের মধ্যে কেমন ভার বোধ করিতেছিল। চাপা গলায় সে বলিল, খুব ভালো করে জানেন কেন?
>
> হ্যাঁ। শান্তি বেঁচে থাকলে আজ মনোর মার চেয়ে বুড়ো হয়ে যেত, কিন্তু মরে গিয়ে সে আমার মনে নতুন বউ হয়েই বেঁচে আছে। একি মনোর মা টের পায় না বাছা! এই সেদিন আমায় কবিত্ব করে বলছিল, মরে যাওয়ার পর মানুষের বয়স আর বাড়ে না বড়ো আশ্চর্য গো, এ বড়ো অন্যায়।[১৭৩]

খ. যাদব বলিলেন, মনোর মার সংসারের বাইরে আমার স্থান ছোটোবউ। শান্তির সঙ্গে সুখদুঃখের সম্পর্ক যেখানে শেষ হয়েছিল সেইখানে। মনোর মা আমার নাগাল পায় না। আমি তেইশ বছর পিছিয়ে পড়েছি। ওর কী সহজ দুঃখ জীবনে![১৭৪]

এই সংবন্ধনের ফলে প্রথম স্ত্রীর অবর্তমানে যাদবের লিবিডোতাড়না পুত্রবধূসম যুবতী সুলতার মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজে।[১৭৫] এ প্রসঙ্গে শিখা ঘোষের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> সুলতার প্রতি তার আসঙ্গলিপ্সার মূল রয়েছে অনেক গভীরে। মরে গিয়ে যাদবের মনে নতুন বৌ হয়ে বেঁচে থাকা 'শান্তি'র উজ্জ্বলরূপ সুলতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন যাদব।[১৭৬]

মনোরমা চরিত্রে ইডিপাস কমপেক্স মূর্ত হয়ে উঠেছে। সন্তান হারানোর শোকে বিহ্বল মনোরমার পুত্র-সংক্রান্ত উপলব্ধির মধ্যে এর প্রকাশ অতি সুস্পষ্ট। মৃত সন্তানের মধ্যে মনোরমা খুঁজে স্বামীর প্রতিচ্ছবি :

---

১৭৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকালের জটার জট, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬০

১৭৪. ঐ, পৃ. ৪৬০

১৭৫. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

১৭৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১২

খোকা তো শুধু আমার ছেলে হয়ে আসেনি। ওর মধ্যে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম, সাথী পেয়েছিলাম, প্রেমিক পেয়েছিলাম। বিয়ের পর উনি যেমন নিরাশ্রয় প্রেম নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন তেমনিভাবে তাকাতে শিখেছিল। খোকা কাঁদলে আমার মনে হত আমাকে জয় করবার চেষ্টায় উনি আবার মুখর হয়ে উঠেছেন। খোকার হাত গালে ঠেকলে ওঁর প্রথম দিনের স্পর্শ আমার মনে পড়ে যেত, রোমাঞ্চ হয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়ত ভাই।

সুলতা নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার মনে হইল এমনিভাবেই সকলে নিজের আনন্দ ও বেদনাকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক মনে করিয়া থাকে বটে। সে ছাড়া আর কোনো নারী যে কোনোকালে সন্তানকে স্বামীর প্রতিনিধি করিয়া ভালোবাসার অরাজক রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিয়াছে মনোরমা তাহা ভাবিতেও পারে না।[১৭৭]

এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

সদ্য পুত্রহারা তরুণী মনোরমার উক্তির মধ্যে লেখক নারীর মগ্নচৈতন্যের এই অদ্ভুত প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ... মাতা-পুত্রের অবচেতন যৌন আকর্ষণের এই তত্ত্ব, যা মূলত ফ্রয়েডের সুপরিচিত Oedipus complex-এর উপর প্রতিষ্ঠিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার অভিনব প্রয়াস পেয়েছেন।[১৭৮]

লিবিডো-সংবন্ধনের এক রূপ সত্য হয়ে উঠেছে সতীশ চরিত্রে। নয় দশ বছর বয়সে মাতৃসম মাসিমা সরমার যুবতী রূপদর্শন সতীশের মনে এমন অমোচনীয় প্রভাব ফেলে যে, ঐ রূপের দীপ্তি ও আচ্ছন্নতা থেকে সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। বউদি সুলতার সঙ্গে কথোপকথনের সময় সতীশের এই মগ্নতা ও আচ্ছন্নতা প্রকাশিত হয়েছে :

---

১৭৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকালের জটার জট, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯

১৭৮. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

মাসিমা যখন প্রথম এখানে আসেন, আমার বয়স ছিল নয় কি দশ। সেই বয়সে আমি যে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম এখনও মনে আছে। সারাদিন ওর আশেপাশে ঘুরতাম।

সুলতা বলিল, তা সত্যি। মাকে এখনও জগদ্ধাত্রীর মতো দেখায়। মোটা হয়ে পড়েছেন নইলে —

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, ওইটুকু মোটা না হলে ওকে মানাত না বউদি।[১৭৯]

সরমার প্রতি সতীশের এই রূপবিভোরতার স্থায়িত্বই তার লিবিডো-সংবন্ধনের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে সরমার পৌঢ়ত্বের বিগতযৌবনও সতীশের কাছে সমানভাবেই আরাধ্য থাকে; সরমার চোখে জল দেখলে সতীশ সহানুভূতিতে এমন বিচলিত হয় — আত্মসংবরণ করাই তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সরমার মেয়ে সুমিত্রার বক্ষ প্রদর্শন, অনুরাগবশত, তার সামনে নগ্ন হলেও সতীশের আবেগ কম্পিত হয় না, বরং সুমিত্রাকে তার মেয়ের মতো মনে হয়; তরুণী সুমিত্রার সৌন্দর্য ও সরমার বয়সের ভারে স্থূল দেহের কাছে ম্লান হয়ে যায়।[১৮০]

এ গল্প সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দের কিছু অভিমত স্মরণ করা যাক। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে লেখকের যৌনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর ভাষায়, 'ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকতা অপেক্ষা ইহার হাস্যকর অসংগতির দিকটাই বেশি ফুটিয়াছে।'[১৮১] সরোজমোহন মিত্র এ গল্পে কতগুলো বিকারগ্রস্ত মানুষের ছবি খুঁজে পেয়েছেন; যারা কেউ সুস্থ নয় সুখী নয়। তিনি আরো বলেছেন :

> Rambling thoughts on sex are made to weave in this story a rather curious design of light and shade against the background of inscrutable human psychology.[১৮২]

---

১৭৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকালের জটার জট, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫৭

১৮০. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬

১৮১. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৭

১৮২. *Manik Bandyopadhyay*, New Delhi, 1974 P. 30

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন :

> মহাকালের জটার জট একটি অসুস্থ চরিত্রশালা। সুমিত্রা, সুচিত্রা, পঞ্চু, সতীশ, সুলতা সবাই বিকারগ্রস্ত। সুচিত্রার উন্মাদদশাও অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ। যারা স্বাভাবিক তারাও সুস্থ নয়।[১৮৩]

সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন :

> ... অবচেতন-অচেতনের মনোভূমিতে লুক্কায়িত থাকে জীবনের গোপন আদিম প্রবৃত্তির এমন সব অন্ধকার বাসনামূর্তি — প্রকৃতিতে যা অত্যন্ত হিংস্র বীভৎস ও কদাকার। সভ্যতার প্রাগ্রসরতার আলো সেই অন্ধকারকে স্পর্শ করতে পারে নি বলে ওইসবের প্রকাশে আমরা আঁতকে উঠি। মহাকালের জটার জট গল্পে মানিক মানুষের নিভৃত মনের নিষিদ্ধ কামনাগুচ্ছকেই তার বৈচিত্র্য ও জটিলতাসমেত রূপময় করে তুলেছেন।[১৮৪]

এ গল্পটি সম্পর্কে রহমান হাবিবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> মানুষকে প্রবলতম অনুরাগে অনুভব করলে; তা নারীই করুক পুরুষকে বা পুরুষ নারীকে – সে অনুরাগস্মৃতির অম্লানতা মানবের মনে অনিবার্য শক্তিমত্ততায় জেগে থাকে – মানবসম্পর্কের সে বহুরৈখিকতার স্বরূপই এ গল্পে বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।[১৮৫]

এ গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব সম্পর্কে আনন্দ ঘোষ হাজরা বলেছেন :

> 'মহাকালের জটার জট' গল্পটিও আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হলেও, গল্পটিতে দুটি বা তিনটি উপন্যাসের সুন্দর সম্ভাবনা থাকলেও, অসংলগ্নতা ও বিশিষ্টতাকে চমৎকারভাবে ধরে রেখেছে ফ্রয়েডীয় মনোভঙ্গির সূক্ষ্মতারের বুনন, যাতে

---

১৮৩. মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা, নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১২০-১২১

১৮৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

১৮৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক মনোবিশেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাস্বর। এই বুননই 'মহাকালের জটার জট'।[১৮৬]

'মহাকালের জটার জট' গল্প পড়ে নবীন সমালোচক সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর মনে হয়েছে যে, কোনো মনোচিকিৎসক বা সাইকিয়াটিস্টের প্রতীক্ষা ঘরে যত রকম সম্ভব মানসিক জটিলতা সব যেন একত্র করা হয়েছে।[১৮৭]

'সরীসৃপ' গল্পগ্রন্থের 'বিষাক্ত প্রেম' গল্পেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। পারস্পরিক সার্থসিদ্ধির গোপন অভিলাষে গড়ে ওঠা একটি সম্পর্কের প্রণয়াভিনয় এ গল্পে মানবীয় পরিণতি লাভ করেছে।[১৮৮] এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্য ও সরলা। প্রথমজনের পেশা চৌর্যবৃত্তি দ্বিতীয়জনের পেশা গণিকাবৃত্তি। সত্য সরলার সঞ্চিত টাকা ও গয়না হাতিয়ে নেয়ার গোপন চেষ্টায় তৎপর। অন্যদিকে সত্যের উপার্জন, তার সমুদয় অর্থসম্পদ আত্মসাতের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয় সরলা। দুজনই গোপন দুরভিসন্ধি মাথায় রেখে পরম নিষ্ঠায় চাতুর্য ও ছলনা দিয়ে পরস্পরের কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করে। তাদের সম্পদ আহরণের এসব কুৎসিত প্রয়াস ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের এরস্ (Eros) বা জীবনমুখী শক্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে — আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (Self Preservation) এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি (Reproduction)। আমরা যত রকম কাজই করি না কেন, তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়। ফ্রয়েডের মতে : মনের স্তর তিনটি — Id, Ego এবং Super ego। Id অন্ধ, বন্য, পাশব কামনা-বাসনা জাগায়। Id-এর কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই। সে কেবল তার দাবি পূরণের জন্য প্রবল উর্ধ্বচাপ দেয়। এটিই libido। এটি নিমজ্জমান রয়েছে মানুষের অবচেতন মনে। Id-এর তাড়না অত্যন্ত প্রবল এবং সাধারণত অপ্রতিরোধ্য। Id কোন

---

১৮৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১৮৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও চল্লিশের দশকে বাংলার মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা, ঐ, পৃ. ২৩৫-২৩৬

১৮৮. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

নৈতিকতা বা সামাজিক অনুশাসনের ধার ধারে না। Ego বাস্তবসম্মতভাবে কৌশলে Id-এর ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করে। Super Ego, Ego-র কাজের সমালোচনা করে এবং Ego-র কাজ সমাজসম্মত বা নীতিসম্মত না হলে Super Ego তার মধ্যে অপরাধবোধ বা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। তখন Ego ভয় পায় এবং উদ্বেগ অনুভব করে। বহির্জগত তাকে ভয় দেখালে তাকে বলা হয় বাস্তব উৎকণ্ঠা, Super Ego ভয় দেখালে তাকে বলা হয় নৈতিক উৎকণ্ঠা এবং Id তাকে ভয় দেখালে বলা স্নায়ুবিক উৎকণ্ঠা। Ego-র কাজ Id বা Super ego-র কাজের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। Ego কে তিন মনিবের কাজ করতে হয় — বহির্জগত বা বাস্তবতা, Id এবং Super Ego- এই তিন মনিবকে একই সঙ্গে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। তাই বাধ্য হয়ে Ego কে অনেক সময় বিচক্ষণ কূটনীতিবিদের মতো অসৎ পথ অবলম্বন করতে হয়। সুখভোগনীতি এবং বাস্তবনীতি এ দুয়ের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব থেকেই অবদমনের জন্ম।[১৮৯]

সত্য ও সরলার পেশা যত কদর্যই হোক না কেন, তাদের এসব কর্ম এরস্ চালিত। তাদের দুজনের প্রেমাভিনয় তথা ভণ্ডামি তাদের Ego-র তাড়না থেকে উদ্ভূত। সরলার Super ego-র নিম্নচাপ না থাকলেও সত্যের মনের অভ্যন্তরে Super Ego দুর্বলভাবে সক্রিয়। লেখক বলেন :

> সরলা আরো গদগদ হয়ে বলে, ইস্!
>
> শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয়নি, তবু কী যেন কামড়ায়। কামড়ার অবশ্য সেই সাপের মতো, যে সাপ কোনো অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।[১৯০]

গল্পের শেষে সত্য যখন মদের সাথে বিষ মিশিয়ে সরলাকে পান করায় তখন বিষক্রিয়ায় সরলা ছটফট করে, গোঙায়, মুখে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম করে তখন সত্য বিচলিত হয়ে পড়ে। সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন :

---

১৮৯. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-৩০

১৯০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষাক্ত প্রেম, *সরীসৃপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮০

> ঠিক তখন সত্যের মনে দ্বন্দ্ব ও বিবেক জাগ্রত হয়। চূড়ান্ত ওই মুহূর্তটিতে নাটকীয়ভাবে সত্যের মনে সঞ্চারিত হয় একই সঙ্গে সহানুভূতি ও ভয়। বিষক্রিয়ায় সরলার যদি মৃত্যু ঘটে— এই আশঙ্কায় সরলার প্রতি এক মমতাপূর্ণ আবেগ যেমন সত্য অনুভব করে, তেমনি খুনী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার আতঙ্কেও সে ভোগে।[১৯১]

অবশ্য আমাদের ধারণা, সত্যের মনে সহানুভূতির চাইতে বেশি জাগে ভয়। বস্তুত, খুনী হিসাবে ধরা পড়ার ভয়ে সে সরলার অঙ্গে গয়না পরিয়ে দেয়, তার টাকাগুলো যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে, আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সরলার সেবা শুরু করে। সরলার প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগ অনুভব করলে সে পরের বার বিষ প্রয়োগ না করে অন্য প্রক্রিয়ায় সরলার সর্বস্ব হাতিয়ে নেয়ার চিন্তা করত না। সত্যের মানসিক অবস্থা রূপায়ণ করতে গিয়ে লেখক স্পষ্ট করেই বলেছেন :

> সত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হল না। যাক কী আর করা যায়, চুরি করার জন্য খুনি হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্য ব্যবস্থা করবে - আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে? যতদিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটম্বুর![১৯২]

উপর্যুক্ত আভ্যন্তর সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে বলা যায়, সত্যের Super Ego খুব বেশি জাগ্রত হয় নি; তার মধ্যে নৈতিক উৎকণ্ঠাও খুব বেশি জাগ্রত হয় নি। বহির্জগৎ তাকে ভয় দেখিয়েছে তাই সে বাস্তব উৎকণ্ঠায় ভুগেছে। অদূর ভবিষ্যতে তার পরিকল্পনা নতুন কোন নিরাপদ উপায়ে সফল হবে এই আশা বুকে চেপে সে অবদমন করেছে। এ গল্প সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

---

১৯১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

১৯২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষাক্ত প্রেম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২

> 'বিষাক্ত প্রেম' –এ লেখক গণিকাসক্ত যুবকের স্বার্থ কলুষিত প্রেমাভিনয়ের মধ্যে এক উচ্চতর প্রবৃত্তির অতর্কিত স্ফুরণ দেখাইয়াছেন। সত্য সরলার অলংকারচুরির উদ্দেশ্যে একদিন তাহাকে বিষপ্রয়োগে অচেতন করিয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির মুহূর্তে হয় বিবেকের দংশন না হয় সত্য ভালবাসার আকস্মিক উচ্ছ্বাস আত্মরক্ষার ছদ্মবেশে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। সে সরলার গহনা চুরি না করিয়া সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিয়াছে ও নিজেকে বুঝাইয়াছে যে, ফাঁসি হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহার এই আকস্মিক পরিবর্তন। বিষের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক অমৃতধারা উছলিয়া উঠিয়াছে।[১৯৩]

নিতাই বসু বলেছেন :

> সরলার গোপনসঞ্চিত গহনার লোভে তাকে বিষ খাইয়ে অচৈতন্য করে গহনা নিয়ে পালাবার সুযোগ পেলেও সত্য পালাতে পারলো না, তার চেয়ে বরঞ্চ 'কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস' করে তার মনের এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখন সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না, 'সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটম্বুর।'[১৯৪]

বিষাক্ত প্রেমের বিষময়তা কেবল সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায় – এমন নয়, বরং সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই তা বিদ্যমান। রহমান হাবিব এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন :

> সমাজের নিচু অবস্থানের এ ধরনের মানুষদের মধ্যে ছলনা, ধূর্ততা, প্রলোভনবৃত্তি, কুটিলতা, শঠতা, প্রতারণা ও চাতুর্য প্রবলভাবে কাজ করে। কিন্তু সত্য ও সরলা উভয়ের এ পরিকল্পনা ধরা পড়ে গেলে দুজনেই মানসিক সংকটে দ্বিধাজীর্ণ হতে থাকে। কুটিলতার ছলাকলা বিস্তারের উভয়ের এ প্রাণান্ত প্রচেষ্টার সজাগতায় উভয়েই অবিশ্বাস, সন্দেহ ও শ্রদ্ধাহীনতার দোলাচলে আবর্তিত হয়। পারস্পরিক স্বার্থোদ্ধারের কৌশলের ক্ষেত্রে শুধু এ ধরনের নিচু শ্রেণীর মধ্যেই যে শঠতা ও

---

১৯৩. জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১৯৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

> ধূর্ততার পালাবৃত্তি চলতে থাকে, তা-ই নয়; বরং অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও কুটিলতার জটাজালের আবহ সৃষ্টি হয়, স্বার্থবৃত্তি চরিতার্থতার ক্ষেত্রে।[১৯৫]

মানুষের অন্ধকার মনের কোণের স্যাঁতস্যাঁতে অলিগলিতে যে পাশব কামনা-বাসনার ঘিনঘিনে সরীসৃপের বাস, মনের গহন কোণে আলোকসম্পাত করে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে আস্থাশীল মানিক সে জীবনসত্যকেই 'সরীসৃপ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সরীসৃপ' গল্পে মূর্ত করে তুলেছেন। এ গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্র — চারু, বনমালী ও পরী — একান্তভাবেই ফ্রয়েডীয় চরিত্র। মানব মন সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্ব দ্বারা এই তিনটি চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়।

চারুর দীর্ঘকালীন অবদমনের কথা সবার আগে উলেখ করতে হয়। চারুর শ্বশুর রামতারণ ছিলেন নারীচরিত্রে ঘোর সন্দেহপরায়ণ, তাই তিনি প্রতি শনিবার যখন বাগানবাড়িতে আমোদ-প্রমোদ করতে যেতেন, তখন তার বন্ধু ও মোসাহেবের পনেরো বছরের কিশোর ছেলে বনমালীকে পুত্রবধূর পাহারায় রেখে যেতেন। চারুর বয়স তখন সতেরো। সৈয়দ আজিজুল হক লক্ষ করেছেন :

> চারুর প্রতি বনমালীর আসক্তি সৃষ্টির মূলে এই নিয়মিত সান্নিধ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে বনমালীর আগ্রহকে প্রশ্রয়দানের পরিবর্তে তার মনের উত্তাপকে কেবল বাড়িয়ে দিয়ে তা উপভোগের এক সুচতুর নির্মম মানসিকতায় আচ্ছন্ন ছিল চারু।[১৯৬]

আধপাগল স্বামী নিয়ে দাম্পত্যজীবনে চারু যে অসুখী ছিলো তা বলাই বাহুল্য। তবু এক ধরনের আশ্চর্য সংযম, কাঠিন্য, আভিজাত্য ও প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ তাকে পরিচালিত করেছে বলে আগ্রহী বনমালীকে সে কোনোদিন 'সুযোগ' দেয় নি। তার Id প্রবলভাবেই বনমালীর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করলেও Super ego-র নিম্নচাপে সে সংযত থেকেছে। বলা যায় : সামাজিক উৎকণ্ঠা তাদের মধ্যে অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল।

---

১৯৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৯৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

অতীতচিত্রণরীতিতে মানিক বনমালী ও চারুর স্মৃতিগুচ্ছ রূপায়ণ করেছেন চারুর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে :

> ক. মনে হইত তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড়ো যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোন আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তার নৈকট্যকে, তার নির্বাক আবেদনকে, তার দুচোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তার হিসাব হয় না।
>
> তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত!
>
> তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সেই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিল, এরকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।[১৯৭]
>
> খ. এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী একরকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত![১৯৮]

তেইশ বছর পরে স্মৃতিচারণ করে নিজের সংযমের জন্য চারুর বরং একধরনের অনুশোচনা জাগে। তার মনে হয়, সেদিন বনমালীকে প্রশ্রয় দিলে আজ তার এ দুর্দশা হতো না। ছোট বোন পরীর অতিমাত্রায় বনমালী-আসক্তি সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না। বর্ষণস্নাত এক নিশুতিরাতে বনমালী-পরীর দেহমিলনের দৃশ্য দেখে ঘৃণা ও ঈর্ষায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে চারু। তার মনে Id-এর তাড়না প্রথমে প্রবল হয়ে উঠলেও পরিবর্তিত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তার মনে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় Ego-র নির্দেশনা :

> পা হইতে মাথা অবধি চারু একটি তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া

---

১৯৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, *সরীসৃপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩

১৯৮. ঐ, পৃ. ৫০৩

ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কী বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়নঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনই ভেজাইয়া দিল।[১৯৯]

চারু প্রথম জীবনে Id-এ তাড়না Super ego-র প্রভাবে অবদমিত করলেও গল্পের শেষভাগে আমরা যে চারুকে দেখি তার কোন Super ego নেই — একান্তভাবেই সে Id চালিত :

বনমালীর নিকট পরীর অশালীন আত্মসমর্পণে চারুর মনে জন্ম নেয় দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া, একদিকে নিজ বোনের কাছে পরাজয়ের আশঙ্কায় তার প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা, অন্যদিকে নিজের উন্নত অভিরুচি আহত হওয়ায় এক প্রকার জ্বালাবোধ। আর এর সঙ্গে নিজের অস্তিত্বরক্ষার সংকট যুক্ত হয়ে চারুকে Borderline situation-এ দাঁড় করায় যে নিজ বোনের জীবননাশের মতো নৃশংসকর্মে ব্রতী হওয়ায়ও তার আর কোনো মানসিক বাধা থাকে না।[২০০]

ঘটনাচক্রে পরীকে কলেরা-আক্রান্ত করে মারতে গিয়ে শত সতর্কতার পরেও চারু নিজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

পরীর প্রতি বনমালীর যে লিবিডোতাড়না, তার মূলে চারুর প্রতি তার অবদমিত কামনা-বাসনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সদ্যবিধবা, যৌবনবতী পরীর মধ্যে বনমালী খুঁজে পায়

১৯৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১-৫০২
২০০. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

যৌবনবয়সী চারুকে। পুত্রকে স্তনদানরত অবস্থায় পরীকে দেখে বনমালীর মনোবিচলন মূর্ত করে তুলেছেন লেখক :

> এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সংগত; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনোদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোটো বোন। আজ বনমালী লক্ষ করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।
>
> তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে পরী?
>
> ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, কী লেগে থাকবে? কিছু না।
>
> তুই পাউডার মেখেছিস?
>
> পরী জোরে নিশ্বাস নিয়া বলিল, মেখেছিই তো, একশোবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন?[২০১]

গল্পের মধ্য পর্যায়ে যখন বনমালীকে আয়ত্ত করার প্রয়াসে পরী অতি সহজেই নিজ যৌবনকে বিকিয়ে দিতে শুরু করে, তখন দ্রুত বনমালীর মনে পরীর প্রতি বিরাগ জন্ম নেয়। এই বিরাগের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, লিবিডো সংবন্ধনের ফলে বনমালী মূলত চারুর প্রতি আসক্ত, পরীর সাথে তার দেহগত আসক্তি তাই দীর্ঘায়িত হয় না। দ্বিতীয়ত, আবেগহীন অভ্যাসের ফলে পরী খুব দ্রুতই বনমালীর কাছে আবেদনহীন হয়ে পড়ে। চারু ও পরীর প্রতি বনমালীর ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> চারু তার প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহ মন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে নিয়ে খেলা করিত; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তার প্রেমকে বাঁচাইয়া

---

২০১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৯

> রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।
>
> পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাকখাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া নিতে পারিল না।[২০২]

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তথা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষ সবকিছুই করতে পারে। ফ্রয়েড জীবনপ্রেরণার এই প্রয়াসের নাম দিয়েছেন এরস্ (Eros)। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু তার উজ্জ্বল নিদর্শন। পরীও এক্ষেত্রে একটি সার্থক নিদর্শন হতে পারে। কৃষ্ণা বসু বলেছেন : "যে বোধটি এই সমাজের মানুষকে সবচেয়ে বেশি চালিত তাড়িত এবং নিয়ন্ত্রিত করে তা হল নিরাপত্তা-বোধের জন্য ব্যাকুলতা।"[২০৩] সদ্য বিধবা, সহায়-সম্বলহীন পরী তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বড়ো বোন চারুর কাছে যখন আশ্রয় নিতে আসে, বাড়ি ঘর সহায় সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাওয়া চারুকেই তখন বনমালীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হতে হচ্ছে। সৌন্দর্যদীপ্ত যৌবন ছাড়া আর কোন সম্পদ তার নেই। পরী তার একমাত্র সম্পদ দিয়ে বনমালীকে তাই আয়ত্ত করার চেষ্টায় তৎপর হয় :

> পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন।
>
> রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপিচুপি ঘরে আসে।
>
> বলে, কী চাই বলুন।

---

২০২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮

২০৩. *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, পা কামড়াচ্ছে-কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না। পরী বলে, কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানিনে?

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয়; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তনের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।[২০৪]

লিবিডোর সংবন্ধন এবং আবেগহীন অভ্যাসের কারণে বনমালী যখন পরীর প্রতি আগ্রহহীন হয়ে পড়ে, তখন পরীর উন্মত্ততা ধীরে ধীরে রূপ নেয় বিকারগ্রস্ততায়। খণ্ড খণ্ড চিত্রে লেখক বর্ণনা করেন :

ক. পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নিচে জুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, শোধ নিস, শোধ নিস; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস।[২০৫]

খ. এদিকে, বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব?

---

২০৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১

২০৫. ঐ, পৃ. ৫০৮

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে হেসে খেলে দিন কাটাবে? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকবে? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে? পায়ে ধরে যে দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব?

এর মধ্যে শেষ কল্পনাদুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।[২০৬]

গল্পের শেষ পর্যায়ে পরীর বিকারগ্রস্ততা চরমে ওঠে। এ পর্যায়ে তার কর্মকাণ্ড পুরোপুরি মনোরোগীর মতো। লেখকের বর্ণনা :

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিতা কুক্কুরীর মতো অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।[২০৭]

'সরীসৃপ' গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন :

---

২০৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০
২০৭. ঐ, পৃ. ৫১২

> বনমালীকে আয়ত্ত করার জন্য দুই বিধবা বোন চারু এবং পরীর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে — সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার কদর্য কুটিলতার দ্বিতীয় নিদর্শন আছে কিনা সন্দেহ। সরীসৃপ যেন নরকের কাহিনী।২০৮

সরোজমোহন মিত্র লক্ষ করেছেন :

> আমাদের সমাজও সভ্যতার কৃত্রিম অন্তরালে কত বিষাক্ত কুটিলতা সরীসৃপের মত বিরাজমান এ গল্পে তা দেখান হয়েছে।২০৯

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন :

> 'সরীসৃপ' গল্পে এই একই সমস্যা আরও ভয়াবহ বিকৃত যৌনচেতনার চিত্র উন্মোচিত করেছে। বনমালীর কাছ থেকে 'বৈষয়িক সুবিধা' আদায়ের লোভে তার উপর যৌন প্রভাব বিস্তারের জন্য মধ্যবয়স্কা চারু ও তার সদ্যোবিধবা তরুণী ভগ্নী পরীর মধ্যেকার নির্লজ্জ কুৎসিত প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণে লেখক গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক, সন্দেহ নেই।২১০

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন :

> মনে হয় বাগানঅলা তিনতলা বাড়িটা নরক। চারু, পরী আর বনমালী সেই নরকের কীট। মানুষ কতো নীচে নামতে পারে, বোধ করি এই তিনজনে তারই প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে। সংসারে কদর্যতা ও কুটিলতা কতো ভয়ংকর হতে পারে, তারই পরিচয়স্থল এই বাড়ি।২১১

সরোজমোহন মিত্রের উপলব্ধি :

> 'সরীসৃপ' গল্পে সভ্যতার মসৃণ আস্তরণের অন্তরালে এই বিকৃত জীবনযাত্রাই রূপায়িত হইয়াছে।২১২

---

২০৮. *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১৫৪

২০৯. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

২১০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী,*দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

২১১. *কালের পুত্তলিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০

২১২. *ছোটগল্পের বিচিত্র কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১

নিতাই বসুর অভিমত সমগ্রতাসন্ধানী :

> 'সরীসৃপে'র চারু ও পরী বনমালীর সংসার তথা তার ওপর একাধিপত্য বিস্তারের উদগ্র বাসনায় নির্লজ্জ লালসার জঘন্যতম প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।[২১৩]

রহমান হাবিব লক্ষ করেছেন :

> সম্ভোগের পর স্খলিত চরিত্র বনমালী একটি স্থির-দৃঢ়তায় পরীকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ভোগবাদী মানুষের মানবী-সম্পর্কের স্বরূপ সাধারণত এরকমই হয়। চারুর রূপ ও যৌবনের প্রতি বনমালী তৃষ্ণার্ত ছিল; কিন্তু চারুর কাছ থেকে সে সাড়া পায় নি।[২১৪]

আনন্দ ঘোষ হাজরা লক্ষ করেছেন, ফ্রয়েডীয় অবচেতনের সূক্ষ্ম যৌনতাবোধের প্রবাহ 'সরীসৃপ' গল্পটিকে জটিল করে তুলেছে।[২১৫]

---

২১৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২১৪. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব : শেষ পর্যায়

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি, ১৯৪০ সালের পরবর্তী সময়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থগুলোতে ফ্রয়েডীয় প্রভাব প্রবল ও তীব্র নয়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সহরতলী' (প্রথম খণ্ড) উপন্যাস। এ উপন্যাসে মার্কসবাদে মানিকের আগ্রহ সুস্পষ্ট ও প্রবল। মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে তাঁর লেখায় ফ্রয়েডীয় প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। এ কারণেই ১৯৪০ সালের আগে লেখা গল্পগুলোতে ফ্রয়েডের যে তীব্র ও প্রবল প্রভাব লক্ষযোগ্য ১৯৪০ সালের পরবর্তী সময়ে লেখা মানিকের গল্পে ফ্রয়েডের সে রকম তীব্র ও প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায় না। তবে এ পর্যায়ে মানিকের গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এ পর্যায়কে অস্তায়মান পর্ব বলা যেতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পর্যায়ে লেখা গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'বৌ' (১৯৪০), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬) এবং 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬)। এসব গল্পগ্রন্থের যে সব গল্পে ফ্রয়েডের প্রভাব রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হলো।

'বৌ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যিকের বৌ' গল্পে সাহিত্যিক সূর্যকান্ত ও তার স্ত্রী অমলার দাম্পত্যসংকট ও তাদের মানসিক ভারসাম্যচ্যুতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার তিনমাস পরে তাদের বিয়ে হয়। এই তিনমাস অমলার কেটেছে কল্পনা ও ভাবালুতায়। অমলা কল্পনা করেছিল তার দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বর হবেন সাহিত্যের আবেগ-উচ্ছ্বাসময় নায়কদের মতোই প্রণয়কাতর, ভাববিহ্বল, প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ও আত্মভোলা টাইপের মানুষ। বিয়ের পর অমলা লক্ষ করে তার স্বামী কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত অতি সাধারণ একজন মানুষ যার

মধ্যে রহস্য বলে কিছুই নেই। অমলার মনোজগত যেন দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অমলার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক দেখেন :

> জীবনসমুদ্র? অমলা তো একেবারে থতমত খাইয়া গেল। এ যে গুমোটের দিঘি! এ কী শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষ! ভাব কই, তীব্রতা কই, উচ্ছ্বাস কই? অন্যমনস্কতা, ছেলেমানুষি, খাপছাড়া চালচলন; রহস্যময় প্রকৃতির ছোটোবড়ো অভিব্যক্তি এসব কোথায় গেল? মানুষের মধ্যে সে যে একজন অত্যাশ্চর্য মানুষ — দিনে-রাত্রে কখনো একটিবারও এ পরিচয় সে দেয় না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বরং যতটুকু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্রগত মৌলিকতা থাকে, তাও যেন তার নাই। তার অসাধারণত্ব যেন এই যে সাধারণ মানুষের চেয়েও সে সাধারণ। গম্ভীর নয়, বেশি কথাও বলে না। বেশভূষার দিকে বাড়াবাড়ি নজর নাই, অবহেলাও করে না। সুখসুবিধা যতখানি পাওয়ার কথা না পাইলে কারণ জানিতে চায়, বেশি পাইলে খুশি হয়, অতিরিক্ত উদারতাও দেখায় না, স্বার্থপরের মতো ব্যবহারও করে না। ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায়, রাগ হইলে রাগে, হাসি পাইলে হাসে, ব্যথা পাইলে ব্যথিত হয়, — এই কী অমলার কল্পনার সেই আত্মভোলা রহস্যময় মানুষ?[১]

নববধূ অমলার প্রণয়কাতরতা ও আবেগ উচ্ছ্বাসকে সূর্যকান্তের মনে হয় 'ছ্যাবলামি'। তার নিরাবেগ কাঠিন্যের দেয়ালে বাধা পেয়ে খান খান হয়ে পড়ে অমলার স্বপ্নের ঝাড়বাতিগুলো। এরকম অনেক দৃশ্যই এ গল্পে আছে, যেমন :

> এমনকি অমলা নিজেই যদি একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস আরম্ভ করিয়া দেয়, সৃষ্টি করিয়া লইতে চায় একটি মোহকরী কাব্যময় পরিবেষ্টনী, সূর্যকান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এসব ছ্যাবলামি শিখলে কোথায়?
>
> রাগের মাথায় অমলা বলে, তোমার কাছ থেকে শিখেছি, তোমার বই থেকে।

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিকের বৌ, *বৌ*, *মানিক রচনাবলি*, (৩য় খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, ৩৭৩

> সূর্যকান্ত বলে, তোমাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম, বিয়ের আগে, মনে হয়েছিল তুমি বুঝি খুব সাদাসিধে সরল — এসব পাকামি জানো না। তুমি যা শিখেছ অমল, আমার কোনো বইয়ে তা নেই।যদি কখনো লিখে থাকি, ঠাট্টা করে খোঁচা দিয়ে লিখেছি ; এ রকম কবিত্ব যারা করে তাদের যে মাথার ব্যারাম থাকে না তাই দেখাবার জন্য।[২]

অমলার প্রতিক্রিয়াটি হয় সংগত কারণেই মর্মান্তিক :

> অমলা স্তব্ধ হইয়া যায়। রাগে অভিমানে প্রথমে তার মনে হয় এর চেয়ে মরিয়া যাওয়াও ভালো। ভালোবাসার কিছু বোঝে না সে? বেশ, চুলোয় যাক ভালোবাসা! সে বুঝিতে চায় না। সে কী চায় তা তো সূর্যকান্ত বোঝে? হোক এসব তার ছ্যাবলামি, কী দোষ আছে এতে, কী ক্ষতি আছে? তার সঙ্গে এই ছ্যাবলামিতে সূর্যকান্ত একটু যোগ দিলে কি বাড়ির ছাদটা ধসিয়া পড়িবে, না পুলিশে ধরিয়া তাদের জেলে পুরিবে? ক্ষতি তো কিছু নাই, বরং লাভ আছে অনেক — এই সব মনান্তর ও মনঃকষ্টগুলি ঘটিবে না। অকারণে কেন এ রকম করে সূর্যকান্ত তার সঙ্গে? কী সুখটা তার হয়, বউকে এত কষ্ট দিয়া? অমলার কান্না আসে।[৩]

এ পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠানোই সূর্যকান্ত ভালো মনে করল। তার কাছে মনে হলো বিচ্ছেদটা অমলার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। সূর্যকান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক বলেন, 'বিরহের তাপে ওর প্রেমের অস্বাভাবিকভাবে বীজাণুগুলি একটু নিস্তেজ হইতেও পারে।'[৪] একমাস বাপের বাড়ি কাটিয়ে অমলা যখন স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সূর্যকান্ত কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা স্ত্রীর ভাবপ্রবণতা নিরাময়ের উপায় খোঁজে। স্বামীর এই নতুন রূপ অমলা চিনতে পারে না। তাই তার ভাবাবেগ অমলার মনে কেবল অস্বস্তি ও ভয় জাগায়। সূর্যকান্তর কৃত্রিম

---

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬

৩. ঐ, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

৪. ঐ, পৃ. ৩৭৮

আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রদর্শনের এবং তজ্জনিত অমলার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি ও ক্লান্তির কিছু খণ্ড চিত্র উদ্ধৃত করা হলো :

ক. তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের শেষ কমাসের কল্পনার মতো হইয়া উঠিয়াছে যে সূর্যকান্ত আজ! আঙুল চালাইয়া চালাইয়া চুল এলোমেলো করিয়া দেওয়ায় কী বন্যই আজ তাকে দেখাইতেছে! চোখের চাহনিতে যেন বিপন্নতার সঙ্গে মিশিয়া আছে বিদ্রোহ, কথা বলিবার ভঙ্গিতে যেন শোনা যাইতেছে পরাজিত ক্ষুব্ধ আত্মার নালিশ, বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে হঠাৎ উঠিয়া ভয়ানক কিছু করিবার একটা ভূমিকামাত্র। তাছাড়া, তারই জন্য একমাস সূর্যকান্ত কিছুই লিখিতে পারে নাই! প্রথম দীর্ঘ বিরহ আসিবামাত্র স্বামী তার বুঝিতে পারিয়াছে, কী ভয়ানক ভালোই সে বাসিয়া ফেলিয়াছে তার বউকে! অমলা শিহরিয়া ওঠে, তার রোমাঞ্চ হয়।

গদগদ কণ্ঠে সে বলিল, আমার জন্য? আমার জন্য এক মাস তুমি লিখতে পারনি?

সূর্যকান্ত তার হাত চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে চুড়িগুলি প্রায় কাটিয়া বসিয়া গেল অমলার হাতে। গলা আবেগে কাঁপাইয়া সূর্যকান্ত বলিল, কার জন্য তবে? তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ অমল, আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। কতবার ইচ্ছে হয়েছে ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কেন যাইনি জানো? বিরহের যাতনা কত তীব্র হতে পারে তাই দেখবার জন্য। আমার রামধনু বইয়ের অপর্ণাকে মনে আছে তোমার? ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য সে থেকে থেকে নিজেই বিরহ সৃষ্টি করে নিত। আমিও ভাবছিলাম —[৫]

খ. একটি মুখর হিরো ও প্রায় নির্বাক হিরোইন — শুধু এই দুটি চরিত্র লইয়া নাটকের যেন অভিনয় চলিতে থাকে ঘরে, — রাত দুটা পর্যন্ত। প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই অমলার সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হইয়া আসে, জাগে ভয়, মুখ হয় বিবর্ণ। এ কী

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

ব্যাপার? সত্যসত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে নাকি সূর্যকান্ত? এসব সে কী বলিতেছে, কী করিতেছে? ক্রমে ক্রমে শ্রান্তি বোধ করে অমলা, তার ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমানোর উপায় নাই।[৬]

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সূর্যকান্তর এই খাপছাড়া আচরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "বিষের ওষুধ নাকি বিষ। তবু স্ত্রী প্রকৃতির অস্বাভাবিকতাটুকু স্বাভাবিক করিয়া আনার জন্য সূর্যকান্তের এই অভিনব চিকিৎসাকে সমর্থন করা যায় না।"[৭] দুজনের পারস্পরিক দূরত্ব ধীরে ধীরে এতটাই সূচিত হয় যে অমলা ও সূর্যকান্ত মনোরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে— অমলার মনোরোগ হিস্টিরিয়ায় রূপান্তরিত হয়। ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস দিয়ে অমলাকে সুস্থ করে তোলা সূর্যকান্তের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ সে নিজেই রোগগ্রস্ত। এ পর্যায়ে লেখকের মন্তব্য লক্ষযোগ্য :

> অমলার হৃদয়-মনের অস্বাভাবিক উত্তাপ তো জ্বর নয়। এই অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সূর্যকান্তের সাধারণ বুদ্ধি গুলাইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে বিষে যদিও বিষ ক্ষয় হয়, হিস্টিরিয়া হিস্টিরিয়ায় সারে না— কারণ হিস্টিরিয়া বিষ নয়।[৮]

হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত অমলার বিকারগ্রস্ততার বেশ কিছু খণ্ড চিত্র এ গল্পে তার অসুস্থতাকে মূর্ত করে তুলেছে। এ রকম একটি চিত্র :

> হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া আসে অমলার, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়, হাত-পা ছুঁড়িবার ভঙ্গি দেখিয়া ভয় হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বুঝি খসিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িবে। পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াবে ঠাকুরঝি — বলে, আর ধনুকের মতো বাঁকা হইয়া অমলা হাসে। ব্লাউজের বোতামগুলি পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া

---

৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১

৭. ঐ, পৃ. ৩৮২

৮. ঐ, পৃ. ৩৮২

> রাগে অমলা ব্লাউজটাই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, গায়ে আঁচলটুকু পর্যন্ত রাখিতে চায় না। বড়ো জা চেঁচায়, ছোটো ননদ কাঁদে, দেবর মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালে, ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া পিসি যে কী বলে বোঝা যায় না, বাকি সকলে যা করে অথবা বলে — তার কোনো মানে থাকে না। শেষে সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরে অমলাকে, অমলাও বড়ো জার হাতে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। অতি কষ্টে কামড় ছাড়াইয়া দিবার পর এত জোরে তার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় যে শরীরের আর কোথাও বোধ হয় একটুও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া যায়।[৯]

গল্পের কাহিনীতে অতঃপর বিকারগ্রস্ত সূর্যকান্ত নিজ মনোবিকারের চিকিৎসাকল্পে বেরিয়ে পড়ে দেশ ভ্রমণে।

'সাহিত্যিকের বৌ' গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ফ্রয়েডের মতে, দু আবেগের দ্বন্দ্ব (emotional conflict) সমস্ত মানসিক রোগের কারণ।[১০] অমলা বিয়ের পর স্বামীকে যেভাবে দেখেছিল, বাবার বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্বামীকে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করার কারণেই তার মধ্যে সৃষ্ট দু ধরনের আবেগের দ্বন্দ্ব হয় এবং ফলে সে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পিতৃগৃহে যাবার আগে এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পরে স্ত্রীর আবেগের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রূপ দেখে সূর্যকান্তও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

হিস্টিরিয়া রোগ সম্পর্কে ফ্রয়েড জানিয়েছেন, অসুখী দাম্পত্যজীবনের এক পর্যায়ে নারীরা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়। কামাসক্তিকে যারা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করতে পারে না তারাই

---

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯

১০. সুনীল কুমার সরকার, ফ্রয়েড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০

মানসিক রোগে ভোগে।[১১] বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যৌন ইচ্ছার যখন পরিতৃপ্তি ঘটে না, তখন সে স্নায়ু রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[১২] অমলা ও সূর্যকান্ত যথার্থ অর্থেই তাই ফ্রয়েডীয় চরিত্র।

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> স্বামীর অসহমর্মী অসহযোগ, অপমান এবং একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের দ্বারা অমলার সহানুভূতিহীন যাপিত জীবনের কারণে অমলা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অমলার ভালবাসাময় আকাঙ্ক্ষার সাথে তার স্বামী সূর্যকান্তের দূরবর্তিতা এবং আপন স্বার্থরক্ষার্থে তার পলায়নবৃত্তি– অমলার মনে মানসিক সন্তাপ সৃষ্টি করেছে বলে তার মানসিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।[১৩]

'সাহিত্যিকের বৌ' গল্পের মতো 'বিপত্নীকের বৌ' গল্পেও রমেশ-প্রতিমার দাম্পত্যসংকট এবং প্রতিমার মানসিক ভারসাম্যহীনতার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'বৌ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'বিপত্নীকের বৌ' গল্পে প্রতিমার মনোরোগের কারণ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যাযোগ্য। প্রতিমা একান্ত ভাবেই একটি ফ্রয়েডীয় চরিত্র।

ফ্রয়েডের মতে মানবমনে দু আবেগের দ্বন্দ্ব (emotional conflict) সমস্ত মানসিক রোগের কারণ।[১৪] প্রথম স্ত্রী মানসীর মৃত্যুর পর একত্রিশ বছর বয়সী বিপত্নীক রমেশ অষ্টাদশী কুমারী প্রতিমাকে বিবাহ করে। কুমারী প্রতিমা চেয়েছিল আনকোরা, নতুন একজন বর, কিন্তু দোজবরে রমেশের সঙ্গে সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, যে রমেশ তার প্রাক্তন স্ত্রী মানসীর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। ফলে সঙ্গত কারণেই প্রতিমা যেভাবে তার স্বামীকে কামনা করে সেভাবে সে

---

১১. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১২. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, অরূপরতন বসু (অনু.), কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩০

১৪. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

পায় না। চাওয়া-পাওয়ার এই প্রবল পার্থক্য প্রতিমাকে ক্রমাগত অসুখী করে তোলে, রমেশের আচরণগত ক্রমপরিবর্তন তাকে প্রীত না করে বরং তাকে উৎকণ্ঠিত করে রাখে যা পরবর্তীতে প্রতিমার মনোরোগের তথা বিকারগ্রস্ততার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "মানবমনের চিন্তনক্রিয়া ও ভাবনাসূত্র কত সূক্ষ্ম, জটিল গভীর ও রহস্যময় হতে পারে — প্রতিমার মানসবিশ্লেষণে তা দেখা যায় প্রতিমা-চরিত্রের মনোজাগতিক উন্মোচনকে প্রাধান্য দিয়েই পরিকল্পিত হয়েছে সমগ্র গল্পের কাহিনী।"[১৫]

রমেশ যখন কনে দেখতে গিয়েছিল, তখনি তার প্রতি প্রতিমার প্রবল বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। যে পুরুষটি অন্য একজন নারীর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন কালাতিপাত করেছে তাকে দেখে প্রতিমার কুমারী দেহ কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। লেখকের বর্ণনা :

> দোজবরে শুনিয়া অবধি অদেখা ভাবী বরটির প্রতি প্রতিমার মনে যতখানি বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, রমেশের সুন্দর চেহারা দেখিয়া তা কমিয়া যাওয়াই ছিল উচিত। তা কিন্তু গেল না। বিরুদ্ধভাবটা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। এ পর্যন্ত মনের বিরূপভাবটা ছিল একটি কাল্পনিক ব্যক্তির উপর, অতএব সেটা তেমন জোরালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশকে দেখিবার পর, সে অসাধারণ রূপবান পুরুষ বলিয়াই, আর একটি মেয়ে যে চার-পাঁচবছর ধরিয়া তাকে ভোগ দখল করিয়াছিল, এ ব্যাপারটা প্রতিমার মনে ভয়ানক অশ্লীল হইয়া উঠিল। এর কারণটা জটিল। রমেশের আর কোনো পরিচয় তো সে তখনো পায় নাই, শুধু বাহিরটা দেখিয়াছিল। আগের স্ত্রীর সঙ্গে বাহিরের এই রূপ সংক্রান্ত সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক কল্পনা করা প্রতিমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবী বরের কথা ভাবিতে গেলেই লোকটা তার মনে উদিত হইত দেদীপ্যমান কামনার

---

১৫. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৭৭

> মতো ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এক রমণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। বিতৃষ্ণায় প্রতিমার পবিত্র কুমারী দেহে কাঁটা দিয়া উঠিত।[১৬]

স্বামীর বাড়িতে আসার পর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী প্রতিমার কাছে যখন রমেশ তার প্রাক্তন স্ত্রীর মৃত্যুর বিবরণ দেয় এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার পরিবারে কী রকম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার আনুপূর্বিক দীর্ঘ বর্ণনা করতে থাকে, তখন সঙ্গত কারণেই তা প্রতিমার কাছে হয়ে ওঠে প্রবল অস্বস্তিকর :

> হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে ও যখন মরে গেল, শোকে আমি যেন কী রকম হয়ে গেলাম। বেঁচে থাকতে কখনো ভাবিনি এতখানি আঘাত পাব। সময়ে মনটা সুস্থ হবে ভেবেছিলাম, তাও হল না। কোনো কাজে মন বসে না, মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না, কর্তব্যগুলি না করলে নয় তাই করে যাই, কিন্তু কী যে কষ্ট হয় তা কী বলব। কতদিকে আমার কত রকম দায়িত্ব আছে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে, আর কারো ওপর যে ওসব ভার দেব সে উপায়ও আমার নেই, আমি না দেখলে চারিদিকে অনিষ্ট ঘটবে। অথচ আমার মনের অবস্থা এ রকম যে হাত-পা ছেড়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে বেশি। আগে বাড়িতে সকলের ছিল হাসিখুশির ভাব, এখন আমি মনমরা হয়ে থাকি বলে কেউ আর প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, বাড়িতে কেমন একটা নিরানন্দের ভাব ঘনিয়ে এসেছে। মেজাজটাও গিয়েছে বিগড়ে, কথায় কথায় ধমকে উঠি, সে জন্যও বাড়িসুদ্ধ লোক কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ছেলেটা পর্যন্ত সহজে আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। প্রথমে অত খেয়াল করিনি, তারপর কিছুদিন আগে টের পেলাম আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সুন্দর জীবনটা গড়ে তুলেছিলাম, আমার অবহেলায় তা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। বড়ো অনুতাপ হল। আমার একার শোক আর দশজনের জীবনে ছায়া ফেলবে এ তো উচিত নয়? এমন যদি হত যে সংসারে আমার কোনো

---

১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপত্নীকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০

> কর্তব্য নেই, মনের অবস্থা আমার যেমন হোক কারো তাতে কিছু আসে যায় না, তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তা যখন নয়, শোক দুঃখ ভুলে আবার আমাকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। তাই ভেবে চিন্তে আবার তোমাকে — [১৭]

রমেশের দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কারণ বর্ণনা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর মনে কোনো মায়া সঞ্চার করে না, বরং তার প্রতি জাগে ঘোরতর অশ্রদ্ধা। স্বামীকে তার ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ বলেও মনে হতে থাকে। প্রতিমার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে লেখক প্রতিমার মানসিক অবস্থাটি ফুটিয়ে তোলেন এই বলে :

> এও প্রতিমা বুঝিতে পারে না যে দশজনের মুখ চাহিয়া প্রথমা স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া অশ্রদ্ধার বদলে তার মায়া হওয়া উচিত কেন। আত্মীয়স্বজন, দায়িত্ব, কর্তব্য এইসব যাকে শোক ভুলাইতে পারে নাই, একটি স্ত্রী পাওয়ামাত্র সে আনন্দে ডগমগ হইয়া আবার বাঁচিয়া থাকার স্বাদ পাইতে আরম্ভ করিবে, এ তো শ্রদ্ধা জাগানোর মতো কথা নয়! স্ত্রীর প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করার চেয়ে এ ঢের বেশি মানসিক দুর্বলতার পরিচয়।[১৮]

রমেশের বাড়িতে অনেক লোক, অনেক কাজ, অনেক বৈচিত্র্য। প্রতিমার বুঝতে বাকি থাকে না যে, সকলে চায় নব বিবাহিত বধূটি যাতে সবসময় স্বামীর কাছাকাছি থাকতে পারে। এক বছর আগে মরে গিয়ে যে মানসী আজও এ গৃহের সকল জায়গায় এবং সবার চেতনায় অক্ষয়, অমর হয়ে বিরাজ করছে, তাড়াতাড়ি তাকে দূর করে দিতে হবে। সবাই চায়, হাসি-গল্পে-গানে-বাজনায় প্রতিমা রমেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক, তার ভাঙা বুক জোড়া লেগে দেখা দিক আনন্দ; তার মুখে

---

১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপত্নীকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১

১৮. ঐ, পৃ. ৩৯২

জাগুক প্রাণময়, প্রণয়চঞ্চল অপর্যাপ্ত হাসি। পারিবারিক এই প্রত্যাশায় প্রতিমার মনে জাগে তার তুলনায় নিতান্ত অসুন্দরী, গোলগাল মুখওয়ালা মৃত সতীন মানসীর প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ও ঈর্ষা :

> হাসি প্রতিমার আসে না, মাধুর্য শুকাইয়া ওঠে। এমন ছিল নাকি তার সতীন, এই ক্ষুদ্র পারিবারিক সাম্রাজ্যে এত বড়ো প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী? রমেশ হইতে বাড়ির দাসীটির মন পর্যন্ত এমনভাবে সে জুড়িয়াছিল? এমন অসহ্য বেদনা সে রাখিয়া গিয়াছে যে মুক্তিলাভের জন্য বাড়িসুদ্ধ লোক এতখানি পাগল? সকলে যত ব্যাকুল হইয়া নীরবে তাহাকে প্রার্থনা জানায়, ভুলাও ভুলাও, সে মায়াবিনীকে ভুলাইয়া দেও, প্রতিমার তত মনে পড়ে সতীনকে। কী মন্ত্র না জানি জানিত সেই গোলগাল মুখওলা বউটি![১৯]

বাড়ির সবাই মানসীর সঙ্গে প্রতিমার নানা সাদৃশ্য খুঁজে পায়, তখন ঈর্ষাবিদ্ধ প্রতিমা পলে পলে দগ্ধ হয়। প্রতিমা মুখ ভার করলে বাড়ির লোকজন যেমন তার সঙ্গে মানসীর মিল খুঁজে পায়, তেমনি হাসলেও সবার কাছে দুজনের সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। পিছন দিক থেকে প্রতিমার চলন, তার চিবুক, গলা, কনুই, কোমরের বঙ্কিম ভঙ্গি, আলতাপরা পায়ের গোড়ালি, ভ্রূ আর কানের মাঝখানের অংশটা সবার চোখে মানসীর মতোই লাগে। প্রতিমা যেন মৃতা মানসীরই প্রতিমূর্তি। একদিন প্রতিমার হাত থেকে পান নেবার সময় রমেশ যখন তার আঙুলের সাথে মানসীর আঙুলের প্রবল সাদৃশ্যের কথা উত্থাপন করে তখন রাগে প্রতিমার মন জ্বালা করে ওঠে। স্বামীর কাছে নিজস্ব সত্তায় আবির্ভূত না হতে পারার ফলে মানসীর যে অন্তর্দাহ সে প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> মানসীর কথা বলিতে বলিতে রমেশের গলা ধরিয়া আসে। প্রতিমার অপরিমিত ঈর্ষা হয়। মনে হয়, এ বাড়ির সকলে তার সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিহাস জুড়িয়াছে। মানসীকে ভুলিবার ছলে তাকে আনিয়া মানসীকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার মধ্যে। তার মৌলিকতা অচল এ বাড়িতে, সে মানসীরই নূতন রূপ, — অচিন্ত্য অব্যক্ত দেবতার প্রতিকৃতির মতো সেও সকলের নিরাকার ব্যাপক শোকের জীবন্ত প্রতিমা! মানসীর

---

১৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপত্নীকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২-৩৯৩

সঙ্গে সেসব দিক দিয়াই পৃথক, তবু মিলের তাই অন্ত নাই। ব্যথার পূজা নিবেদন করার জন্য সকলে তাকে মানসীর প্রতিনিধির মতো খাড়া করিয়া দিয়াছে।[২০]

"একদা নববধূর প্রতি রমেশের প্রণয়মুগ্ধতা প্রকাশিত হলে প্রতিমার মনে পুনরায় জাগ্রত হয় প্রথম পর্যায়ের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। রমেশের মন থেকে মানসীর শোক অন্তর্হিত হচ্ছে — প্রথম যেদিন প্রতিমা তা উপলব্ধি করে সেদিন তার ঈর্ষাতুর মনে আনন্দের পরিবর্তে জাগে গভীর বিষাদ।"[২১] রমেশ যখন সত্যসত্যই প্রতিমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন প্রতিমার মনে হয় এসব 'পুরনো অভিনয়, অভ্যস্ত প্রণয়।' তার মনে হয় রমেশ তার প্রাক্তন স্ত্রীকে যেভাবে প্রণয় সম্ভাষণ করত এবং যেভাবে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হতো এ যেন তারই 'পুনরাবৃত্তি আর প্রতিধ্বনি'। রমেশের আদর সোহাগ প্রতিমাকে তাই তৃপ্ত করতে পারে না, বরং সবকিছু তার অশুচি বলে মনে হয়। প্রতিমার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক প্রতিমার এ মানসিকতা প্রকাশ করেছেন নিম্নরূপে :

> স্বর্গীয়া সতীনের বিরুদ্ধে প্রতিমার অকথ্য ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনের সহজলভ্য সুখের পথেও কাঁটা দেয়। মানসীকে একবারে ভুলিয়া যাওয়া রমেশের পক্ষে এখনো সম্ভব নয়, আজও সে অন্যমনে তার কথা ভাবে, কণ্ঠলগ্না প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া আজও সে তারই কণ্ঠবেষ্টন করিতে যায়, যে কোথাও নাই। এক-একদিন রমেশের চুম্বন পর্যন্ত অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, প্রতিমা স্পষ্ট অনুভব করে দড়ি ছিঁড়িবার মতো স্বামীর বাহুবন্ধন হঠাৎ শিথিল হইয়া গেল, নিভিয়া গেল চুম্বনের আবেগ। তা যাক, তাও হয়ত প্রতিমা গ্রাহ্য করিত না। হয়ত এই জন্যই সে স্বামীর মন জয় করিবার তপস্যা তীব্রতম করিয়া তুলিল, একটা মৃতা রমণীর কাছে হার মানিবার অপমান এ বয়সে সহ্য হয় না। কিন্তু জয় করিতেই অনেক বাধা, অনেক লজ্জাকর বেদনাদায়ক অন্তরায়। রমেশকে যখন সে মুগ্ধ করে, অতীতের দিক হইতে তার দৃষ্টি যখন সে ফিরাইয়া আনে নিজের দিকে,

---

২০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপত্নীকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

২১. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

তার প্রণয়াকর্ষণ অসহনীয় হয়ে উঠছে প্রতিমার কাছে — এর মধ্যেই নিহিত প্রতিমার বিকার। স্বামীর এই পরিবর্তিত আচরণের যে ব্যাখ্যা সে মনে মনে নির্ধারণ করে, তাও আদ্যোপান্ত বিকারগ্রস্ততায় ভরা :

ক. প্রতিমা অনুভব করিল, তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলায় দড়ি কাটিবার মতো মানসীর স্মৃতি কমাস আগেও রমেশের যে বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া দিত, জীবন্ত সাপের মতো সেই বাহু দুটি আরো জোরে আজ তাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। রমেশের যে চুম্বন ছিল, শুধু ওষ্ঠের স্পর্শ, আজ তা প্রেমের আবেগে অনির্বচনীয়।

সহসা প্রতিমা কাতর হইয়া বলিল, ছাড়ো ছাড়ো, শিগগির ছাড়ো আমায়!

কী হল? — রমেশ ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

দম আটকে গেল আমার। ছাড়ো।

স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিমা খাট হইতে নামিয়া গেল। ঘরে পর্যন্ত থাকিল না। বিদ্যুতের আলো মানসীর ফটোর কাচে প্রতিফলিত হইয়া চোখে লাগিতেছিল, প্রতিমার মনে হইয়াছিল সে যেন মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

প্রতিমা ছাদে পালাইয়া গেল। ছাদ ছাড়া বউদের আর তো যাওয়ার স্থান নাই। অপরিবর্তনীয় আকাশ ছাদের উপরে, তারার আলো মেশানো অপরিবর্তনীয় রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে। দুঃখে প্রতিমার কান্না আসিতে লাগিল। ভুলিয়া গিয়াছে? এমন মন তার স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে, তার মনোরাজ্যের সেই সর্বময়ী সম্রাজ্ঞীকে?[২৩]

খ. প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারে, শীতের কুয়াশা কাটিবার মতো রমেশের মন হইতে মানসীর শোক কাটিয়া যাইতেছে, তার ঈর্ষাতুর মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্তে গভীর

২৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপত্নীকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮

> বিষাদ ঘনাইয়া আসে। কেমন সে লজ্জা পায়। মনে হয়, নিজের তারুণ্য দিয়া এতকাল একটা অপবিত্র ব্রত পালন করিতেছিল, উদ্‌যাপনের দিন আসিয়াছে।[২৪]

স্বামী সম্পর্কে দ্বিবিধ মানসিকতা তথা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় 'দুই আবেগের দ্বন্দ্ব' একজন মানুষকে কিভাবে ক্রমান্বয়ে অসুখী এবং পরিণামে বিকারগ্রস্ত করে তোলে, এ গল্পে প্রতিমা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিব বলেছেন :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপত্নীকের বৌ' গল্পটির মধ্যে বিপত্নীক রমেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রতিমা রমেশের সংসারে প্রবেশ করলে সে যে মানসিক ও সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হয় – তারই নিপুণ চিত্রায়ণ রয়েছে।[২৫]

প্রসঙ্গত নিতাই বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> 'বিপত্নীকের বৌ' এ রমেশ মৃতা মানসীর স্মৃতিকে অপমান করে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রতিমাকে চুম্বনের মাধ্যমে তার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে, মানসীর প্রতি রমেশের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতিমার প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে।[২৬]

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'আততায়ী' গল্পের প্রথম বাক্যটি হচ্ছে : "স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শাস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহারক আততায়ী।"[২৭] গল্পের শুরুতেই আততায়ীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, তার সবগুলো

---

২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপত্নীকের বৌ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

২৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৬৯

২৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আততায়ী, *সমুদ্রের স্বাদ*, মানিক রচনাবলি, (৪র্থ খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৫৪

প্রবণতা এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দিবাকরের মধ্যে লক্ষণীয়। তাকে এক অকৃত্রিম স্বার্থপর শয়তানের চরিত্র হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এ গল্পে রূপায়িত করেছেন।[২৮]

দিবাকর চরিত্রে Id-এর প্রবল তাড়না, অর্থাৎ তার চরিত্রে Super Ego-র কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সে হয়ে উঠেছে পশুর সমতুল্য। মানুষের অবচেতন মনের বেশির ভাগ জুড়েই থাকে Id-এর পাশব দাবি। Ego বাস্তবতার দিকে লক্ষ রেখে চতুরতার সাথে Id-এর ইচ্ছা পূরণ করে বলে তার ধর্ম ও কৌশল সুচতুর পশুর মতো। কেবল মানুষের মধ্যে মানবতা বা দেবত্ব হচ্ছে Super ego-র দিক নির্দেশনা। মানব মনের উপর Super Ego-র চেয়ে Id ও Ego-র প্রভাব ও কার্যক্ষমতা অনেকাংশে বেশি বলে মানুষকে এক অর্থে উন্নত প্রজাতির পশু বলা যেতে পারে। দিবাকর চরিত্রে Super Ego-র কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় সে হয়ে উঠেছে 'উন্নত প্রজাতির পশু' নয়— বরং মানবসদৃশ পশু বিশেষ। আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুসারে, পিতামাতার সান্নিধ্যবঞ্চিত ব্যক্তিরা হয় দুর্বল মনের, আদর্শশূন্য ও আশ্রয়চ্যুত। সমাজজীবনে ভাসমান ও নোঙরহীন এসব ব্যক্তি নিজ জীবনকে মনে করে অতিশয় মূল্যহীন। পরিণতিতে এদের মনে জন্ম নেয় হিংসা, দ্বেষ, লোভ, স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ক্রমশ তারা হয়ে ওঠে অপরাধী বা দুষ্কৃতিকারী। শৃঙ্খলাচ্যুত নীতি-আদর্শহীন ব্যক্তির বিবেক বা অধিশাস্তা স্বাভাবিক পূণতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এদের জীবন হয়ে ওঠে আক্রমণধর্মী, হিংস্র, বিবেকশূন্য ও অপরাধপ্রবণ। অধিসত্তা বা Super Ego-র অভাবে এরা হয়ে ওঠে স্বার্থপর, নীচ পাশববৃত্তিসমূহের দাস ও আত্মকেন্দ্রিক। অনেক সময়ই এরা আগ্রাসী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয় অথবা পরগাছার মত অন্যের গলগ্রহ হয়ে জীবনযাপন করে। নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য এরা সব রকমের সমাজগর্হিত কাজ, জাল-জুয়াচুরি, চুরি, মিথ্যাচার ও সর্বপ্রকার অনৈতিক কাজ, এমনকি খুন জখম পর্যন্ত করতে পশ্চাৎপদ নয়। এদের মনের ভিতরে কোন প্রকার ভয়, শঙ্কা, উৎকণ্ঠা যেমন নেই, তেমনি নেই

২৮. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

অপরাধবোধ।[২৯] দিবাকর এদেরই একজন। অপরাধপ্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক আচরণ নয় বরং তা মনোরোগের অন্তর্ভুক্ত। দিবাকরও একজন মনোরোগী।

এ গল্পে Id ও Ego চালিত দিবাকরের কর্মকাণ্ড, কৃত্তিবাসের স্ত্রীর সঙ্গে তার লিবিডোতাড়নাজাত আচরণ এবং দিবাকরের প্রতি কৃত্তিবাসের পিসির ইডিপাস কমপ্লেক্স ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্স এ গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে।

দিবাকর-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের হুবহু প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে। গৃহে অগ্নিসংযোগ, আফিম প্রয়োগে প্রতিপালক বন্ধুর পিসিকে হত্যা ও সেইসূত্রে অলংকার ও অর্থলাভ, অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠবন্ধুকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দিয়ে তার সম্পদ ও স্ত্রীকে অপহরণ প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দিবাকর শাস্ত্র-নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নিজেকে প্রকৃত আততায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করে ছেড়েছে।[৩০]

কৃত্তিবাসের নিঃসন্তান পিসির আপন ভাইপো কৃত্তিবাস অপেক্ষা দিবাকরের প্রতি যে অস্বাভাবিক আকর্ষণ, তা ফ্রয়েড বর্ণিত ইডিপাস কমপ্লেক্স ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্সেরই মার্জিত বহির্প্রকাশ। স্মরণীয় যে, আপন ভাইপো কৃত্তিবাসের প্রতি পিসির বিরাগ চাপা পড়ে থাকে নি, কেননা তিনি মেতে উঠেছিলেন 'চড়ুই পাখির মতো কোমল' সুদর্শন দিবাকরকে নিয়ে। গল্পের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এর বেশ কিছু খণ্ডচিত্র :

ক. ঘাড়ে তুলিয়া নিতেছে কেন তাও তাদের মাথায় ঢুকিল না। প্রথম দিকে একবার কথা উঠিয়াছিল দিবাকরের ফিরিয়া যাওয়ার, পিসি তখন বলিয়াছিল, থাক না এখন তাড়াহুড়োর কী আছে! কিছুদিন পরে পিসেমশায় আবার যখন ভাসাভাসাভাবে কথাটা

---

২৯. James C Coleman, *Abnormal Psychology and Modern Life*, Bombay, 1975, P. 384-385

৩০. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

তুলিল, পিসি স্পষ্টই বলিয়া দিল, না, দিবু যাবে না। ওকে তাড়াবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন?

পিসেমশায় আমতা আমতা করিয়া বলিল, তাড়াবার জন্য নয়। ওর বাপ-মা রাগ করতে পারে, তাই বলছিলাম।

পিসি হাসিয়া বলিল, রাগ করবে না ছাই করবে। অ্যাদ্দিনের মধ্যে একটা চিঠি লিখে ছেলের খোঁজ নিলে না, রাগ করবে। বাসু যায় তো যাক, দিবু যাবে না।[৩১]

খ. দিবাকরের আদর পিসির কাছে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মানুষ কী সব সময় মনে রাখিতে পারে মুখপোড়া কানা ছেলেটাই তার দাদার ছেলে আর অন্য ছেলেটা তার কেউ নয় এবং কথাটা মনে রাখিয়া পরের যে ছেলেটাকে দেখিয়া বাৎসল্য উথলিয়া ওঠে তার বদলে সর্বদা আদর করিতে পারে দাদার ছেলেকে? সুতরাং পিসির কোন দোষ নাই।[৩২]

গ. দিবাকর এখন বড়ো হইয়াছে, মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে, এখন আর তাকে দেখিলে আগের মতো ততটা মনে হয় না যে, কাদের বাড়ির সে হারানো ছেলে, এখুনি বুঝি মুখে আঙুল দিয়া মা-র জন্য কাঁদিয়া ফেলিবে। আজকাল আর তেমনভাবে পিসির বুকে বাৎসল্য উথলাইয়া উঠে না। কেবল ব্রণের দাগ বা গোঁফদাড়ির চিহ্নহীন তার বালকের মতো কোমল তেলতেলা মুখ আর বড়ো বড়ো চোখের দুশ্চিন্তাভরা দৃষ্টি দেখিয়া প্রত্যেকবার অভ্যস্ত মমতাটা জোরে নাড়া খায়।

দিবাকর কিছুই বলিল না, শুধু আহত বিস্ময়ে পিসির দিকে চাহিয়া রহিল, যে দৃষ্টি দেখিয়া পিসির সাধ হইতে লাগিল তার বাদামি রঙের গালে একটা চুমা খাইয়া কানে কানে বলে ষাট ষাট সোনা আমার! তবে রোগে ভুগিতে ভুগিতে আরো শুকাইয়া গিয়া

---

৩১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আততায়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬

৩২. ঐ, পৃ. ৩৫৭

পিসির মেজাজটা আজকাল একটু খিটিখিটে হইয়া উঠিয়াছে কি না, তাই সাধটা দমন করিয়া আবার বলিল, ওকে পাঠিয়ে দিলি, নিজে তুই গেলি না। মা না তোর খুব কাঁদে তোর জন্য? মাকে কাঁদিয়ে তুই পড়ে আছিস আমার কাছে, এতই তুই ভালোবাসিস আমাকে!

দিবাকর এবারো কিছু বলিল না। বেশিক্ষণ পিসির উত্তেজনা সহ্য হয় না, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঝিমঝিম করে। এবার তাই হার মানিয়া পিসি দিবাকরের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, দুহাতে তাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পিসি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, আমি কি জানি না তুই কেন আছিস আমার কাছে! আমার জন্য তোর এক ফোঁটা মায়া নেই। তোকে চিনতে কি আমার বাকি আছে রে মুখপোড়া ছেলে!

পিসি একটু শান্ত হইলে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, একবার বাড়ি যাব নাকি পিসি?

পিসি মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহু।

যাই না একবারটি? দুদিনের জন্য?

না। একেবারে আমার চিতায় আগুন দিয়ে যাস।[৩৩]

পিসিমা বহুবছর দিবাকরকে চোখের আড়াল করে নি, অথচ সেই পিসিকেই দিবাকর পরোক্ষভাবে হত্যা করে। অতিরিক্ত আফিম খেয়ে পিসির মৃত্যুর পর দেখা যায়, দিবাকরের ভবিষ্যৎ স্ত্রীর জন্য তিনি তার সব গয়নাগুলো রেখে গেছেন এবং দিবাকরের পড়ার খরচের কথা বলে এখানে ওখানে বেশ কিছু টাকা রেখে গেছেন। পিসির এই 'অতি মমতা' ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তার বিকারগ্রস্ততারই পরিচয় বহন করে।

৩৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আততায়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮

কৃত্তিবাস ও পিসি দিবাকরকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও দিবাকরের মনে কারো জন্যই কোনো রকম মায়া মমতার অস্তিত্ব ছিলো না। মেস জীবনের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে কৃত্তিবাস ছোট গলিতে ছোট একটি বাসায় দুবছর কাটিয়ে দেয়। দুজন ডাক্তার হবার পর বড় রাস্তার ধারে বড় একটি বাড়ি তারা ভাড়া করে। বাড়ির সদরকে পরিণত করা হয় চিকিৎসাকেন্দ্রে। বাড়ির আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত ওষুধ, অস্ত্রচিকিৎসার জন্য সরঞ্জামাদি এবং চক্ষু চিকিৎসার দামি দামি যন্ত্রপাতি কিনতে গিয়ে দিবাকরের হাতের টাকা ফুরিয়ে যায়। একদিন সসংকোচে কৃত্তিবাস টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে দিবাকর সুকৌশলে তা এড়িয়ে যায়, অথচ তার কাছে রয়েছে পিসির দেয়া গয়না ও সঞ্চিত সমস্ত টাকা যা থেকে একটি টাকাও সে কখনো খরচ করে নি। জমি বিক্রি করতে কৃত্তিবাস দেশের বাড়ি চলে গেলে স্বার্থপর, পরগাছাসদৃশ দিবাকরের মনে জাগে নৈঃসঙ্গচেতনা :

> সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে কৃত্তিবাস চলিয়া গেল দেশে এবং তাহার সাময়িক অন্তর্ধানে জীবনে এই প্রথমবার বিশ্বজগৎ দিবাকরের কাছে হইয়া গেল ফাঁকা। কারো জন্য অবশ্য মন কেমন করে না, বাড়ি গিয়া কৃত্তিবাস মরিয়াছে না বাঁচিয়া আছে জানিতে কিছুমাত্র আগ্রহ জাগে না, শুধু মনে হয় সমস্ত পৃথিবী যেন তাকে ত্যাগ করিয়াছে, তার কেউ নাই।[৩৪]

মাস তিনেক পরে কৃত্তিবাস ফিরে আসে তার অনেকদিন আগে বিবাহ করা 'বড়োসড়ো সুশ্রী বউটিকে' সঙ্গে নিয়ে। কৃত্তিবাসের স্ত্রীর চোখেই প্রথম ধরা পড়ে দুই বন্ধুর অস্বাভাবিক জীবন যাপন, বিশেষ করে দিবাকরের আচরণ তাকে অবাক করে। মহামায়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দিবাকর প্রসঙ্গে লেখক বলেছে :

> আরম্ভ করিয়াছে সেখানে উঠিয়া গিয়াছিল। একপাশে প্রতিমার মতো দাঁড়াইয়া সে অবাক হইয়া দিবাকরকে লক্ষ করিতে লাগিল। শ্বশুর নয়, ভাসুর নয়, দেবর নয়, দূরসম্পর্কের আত্মীয় পর্যন্ত নয়, শুধু তার স্বামীর বন্ধু, তবু সেই যেন সব। ব্যবস্থা

---

৩৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আততায়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০

> করিতেছে সে, হুকুম দিতেছে সে, দোষ ধরিতেছে সে, চাকর ঠাকুরকে ধমক দিতেছে সে। সে যেন এ বাড়ির আশ্রিত নয়, তার বাড়িতেই যেন সস্ত্রীক বেড়াইতে আসিয়াছে তার বন্ধু।[৩৫]

দিবাকর সম্পর্কে স্ত্রীর কটূক্তি, বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না ; ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সূচিত হয় দাম্পত্যদূরত্ব। লেখকের বর্ণনা :

> হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, যাই বল, তোমার ব্যাপারট্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না বাপু। তোমার বাড়িঘর, খেতে পরতে দিচ্ছ তুমি, তোমার টাকা নিয়ে বাবুয়ানা করে বেড়াচ্ছে, আর ওর ভয়ে তুমি নিজে যেন চোর হয়ে আছ তোমার নিজের বাড়িতে!
>
> শুনিয়া কৃত্তিবাস চোখ বড়ো করিয়া খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ভয়ে ভয়ে বলিল, কী যে বল তুমি! ভয় করব কেন, ছেলেবেলার বন্ধু তো, মনে কষ্ট লাগবে বলে একটু সামলেসুমলে চলি।
>
> মহামায়া বলিল, ভদ্রলোককে বলে দেও না এবার, তোমার ঘাড় না ভেঙে কোথাও থাকুন গিয়ে?
>
> কৃত্তিবাস বিবর্ণ মুখে বলিল, ছি, তাই কি বলা যায়।
>
> আর একদিন বলিবে ভাবিয়া, প্রথম দিন কথাটা তুলিয়াই বেশি কিছু বলা ভালো নয় ভাবিয়া, তখনকার মতো মহামায়া চুপ করিয়া গেল। চেষ্টা করিয়া কৃত্তিবাসের বিবর্ণ মুখে মুগ্ধমনের ভোঁতা জ্যোতিও ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু অনেকদিন পরে ফিরিয়া পাওয়া স্বামীর সোহাগে যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ স্বাদ অনেক দিনের বঞ্চিতা ও অবহেলিতা স্ত্রী পায়, গত দুমাস যে স্বাদ পাইয়া মহামায়ার রাত্রিগুলি ভাবাবেগে উদবেল হইয়া

---

৩৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আততায়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

> উঠিয়াছে, আজ যেন সেটা কোনোমতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার স্বামীর ঘাড় ভাঙে বলিয়া দিবাকরের উপর রাগ হওয়ার বদলে ঘাড় ভাঙিতে দেয় বলিয়া কৃত্তিবাসের বিরুদ্ধেই একটা অসহায় ক্ষোভ সারাক্ষণ মনের মধ্যে গুমরাইতে লাগিল।[৩৬]

বাবার হাতে বেধড়ক মার খেয়ে কৃত্তিবাস ছোটবেলায় এক চোখ হারিয়েছিল। দ্বিতীয় চোখে সাময়িক অসুবিধা হওয়ায় চোখের ডাক্তার দিবাকর চিকিৎসার নামে তার চোখে অপারেশন করার ছলে প্রকারান্তরে তাকে পুরোপুরি অন্ধ বানিয়ে দেয়। অন্ধ হওয়ার পর সমস্ত সম্পত্তির একক মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার জীবন কাটে পরম অনাদরে, অবহেলায়। কাহিনীর এই শেষ পর্যায়ে মহামায়া ও দিবাকর পরস্পরের প্রতি লিবিডোতাড়িতো হয়ে পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করতে থাকে। দৈবাৎ একদিন তাদের নিভৃত আদিম সান্নিধ্য ধরা পড়ে যায় কৃত্তিবাসের কাছে। লেখক বর্ণনা করেন :

> তারপর একদিন সকালে নিচের ঘরের অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া ঝিমানোর বদলে উপরে নিজের শোয়ার ঘরের অন্ধকারে আরাম করিয়া শুইয়া শুইয়া ঝিমানোর সাধ জাগায় অন্ধ কৃত্তিবাস হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যেই ঘরের দরজার কাছে গিয়াছে, দুটি কানে যেন তার পুরুষ ও নারী কণ্ঠের ফিসফিসানির বজ্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়া গেল। খানিকক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল বজ্রাহতের মতোই, তারপর ফিরিয়া গেল নিচে। পা ফসকাইয়া সিঁড়ি দিয়ে গড়াইতে গড়াইতে নিচে পড়িয়া গেল, তবু সে থামিল না।[৩৭]

দিবাকর চরিত্রটি সম্পর্কে সৈয়দ আজিজুল হক মন্তব্য করেছেন :

---

৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আততায়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

৩৭. ঐ, পৃ. ৩৬২

> মানবমন-বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানের এসব আবিষ্কারের দিকে দৃষ্টি দিলে দিবাকরের স্কুল-পালানো স্বভাব থেকে শুরু করে একান্ত বন্ধুর স্ত্রী-অপহরণ পর্যন্ত সকল অস্বাভাবিক আচরণ ও অপরাধপ্রবণতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এসব অপকর্মে দ্বন্দ্বহীন শীতল মস্তিষ্কের উৎসবিন্দু সম্পর্কেও আমরা হয়ে উঠি সজাগ ও সচেতন। গৃহগত বিরূপ পরিবেশে, ছিন্নমূল জীবনবৈশিষ্ট্য, পরগাছাবৃত্তি প্রভৃতি দিবাকর-চরিত্রের বিবেকশূন্য মনোগঠনে সহায়ক উপাদান।[৩৮]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্প সম্পর্কে বলেছেন :

> সমাজের অন্তরচারী ক্রূরতা ও হিংস্রতার উন্মোচনে 'আততায়ী' গল্পটি প্রায় চরম রূপ ধরেছে। গল্পের আরম্ভেই লেখক শাস্ত্রমতে আততায়ীর সংজ্ঞা দিয়ে তারপর নির্ভুল নিষ্ঠুরতায় বন্ধুত্বের স্বরূপ দেখিয়েছেন। কেমন করে এক বন্ধু অপর বন্ধুর সর্বনাশ করে, তাকে অন্ধ করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকেও আয়ত্ত করেছে, শীতল মস্তিষ্কে নরহত্যা করবার ভঙ্গিতে সে কাহিনী বর্ণনা করেছেন লেখক।[৩৯]

রহমান হাবিবের মন্তব্য সমগ্রতাসন্ধানী :

> কৃত্তিবাসের অর্থসম্পত্তি ও তার পিসির অর্থসম্পদ পাবার লুব্ধতায় দিবাকর যেভাবে তার বন্ধু কৃত্তিবাসকে অন্ধ করে ও তার স্ত্রীকে অপহরণ করে এবং কৃত্তিবাসের পিসিকে হত্যা করে – এতে দিবাকরের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের স্বার্থপরতা চরিতার্থ করার করুণতম অমানবিকতা-নৃশংসতার পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানবঅস্তিত্বসত্তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতার যে অন্তঃস্থিত নেতিবাচকতা অবচেতনভাবে কার্যকর থাকে –

---

৩৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

৩৯. *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১৫৩

> মানব ও সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কের সে স্বরূপই 'আততায়ী' গল্পটিতে প্রতিপাদিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪০]

নিতাই বসু লক্ষ করেছেন :

> 'আততায়ী'র নায়ক দিবাকর-এর মতো সমাজ বিগর্হিত পন্থা অনুসরণ করে স্বামীর অসুস্থতা ও অন্ধত্বের সুযোগে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বলিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন নয়।[৪১]

আনন্দ ঘোষ হাজরা এ গল্পে পিসির ব্যবহারে বাৎসল্যের চেয়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলই অধিক প্রকট বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪২]

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'বিবেক' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র ঘনশ্যামের বিবেকহীনতাকেই মূলত মুখ্য করে তুলেছেন। ফ্রয়েডের মতে, মানবমনের তিনটি স্তরের— Id, Ego ও Super Ego — মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় স্তর হচ্ছে Ego। Id তার মধ্যে নির্বিচারে কামনা-বাসনা-লোভ-লালসা জাগ্রত করে, অন্যদিকে নীতিবোধ দ্বারা পরিপুষ্ট, মানবতাবোধে দীপ্ত Super Ego মনে সামাজিক উৎকণ্ঠা জাগিয়ে ঐসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে সর্বদা বিরত রাখার জন্য সক্রিয় থাকে। কিন্তু Id এর ঊর্ধ্বচাপ ও Super Ego-র নিম্নচাপে মানুষ শেষ পর্যন্ত যা করে তা মূলত Ego-রই কারসাজি। Ego বন্য কামনা জাগায়, Ego বাস্তবসম্মতভাবে কৌশলে Id -র ইচ্ছাই সাধারণত পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়। অধিকাংশ

---

৪০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৪১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৪২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০

ক্ষেত্রেই Super ego-র পরামর্শ এড়াতে Ego বিচক্ষণ কূটনীতিবিদদের মতো অসৎ পথ অবলম্বন করে।[৪৩] 'বিবেক' গল্পের ঘনশ্যাম একান্তভাবেই Ego চালিত চরিত্র।

ঘনশ্যামের স্ত্রী মণিমালা গুরুতর অসুস্থ। ঘরে ছোট-বড়ো মিলিয়ে বেশ কয়েকটি সন্তান, অথচ চাকরিচ্যুত ঘনশ্যামের সঞ্চিত কোনো টাকাপয়সা নেই। সংসার যেখানে অচল সেখানে মণিমালার চিকিৎসা খরচ যোগাতে অসমর্থ ঘনশ্যাম সংগত কারণেই বিপন্নবোধ করে। শেষরাতে মণিমালা মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলে স্ত্রীর শিয়রে বসে থাকা ঘনশ্যাম যদিও বড়ো ছেলে সন্তুকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলে, কিন্তু সে জানে ডাক্তারের ফি দেবার সামর্থ্য তার নেই। ডাক্তার বাড়িতে আনলে একেবারে শেষের দিকে বিদায়ের সময় তাকে টাকা দেওয়ার প্রথা — এটুকুই ভরসা ঘনশ্যামের। রোগী দেখার পর ডাক্তারের সামনে দুটি হাত জোড় করে পরদিন সকালবেলা তার ফি পাঠিয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা যে আঁটে, তার মূলে রয়েছে তার Ego-র পরামর্শ। এ প্রসঙ্গে ঘনশ্যামের মনোবিশ্লেষণ :

> ডাক্তারকে সে ঠকাইতে চায় না, ডাক্তারের প্রাপ্য সে দু-চারদিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবে, মণিমালা মরুক অথবা বাঁচুক। তবু, গোড়ায় কিছু না বলিয়া রোগিণীকে দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে ব্যবস্থা আদায় করার হিসাবে একটু প্রবঞ্চনা আছে বৈকি। এসব হিসাবে গলদ থাকিয়া যায়।[৪৪]

ঘুমন্ত মণিমালার দুহাতের রুলি দুটি শেষ পর্যন্ত সে যে খোলে না, সেটিও Ego-র পরামর্শে :

> মণিমালার একটি হাত তুলিয়া সে নাড়ি পরীক্ষার চেষ্টা করিল। দুহাতে দুটি রুলি এখনো তার আছে। সজ্ঞানে এ রুলি সে কিছুতে খুলিতে দেয় নাই। কাল সন্ধ্যায় জ্ঞান প্রায় ছিল না, তখন একবার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চোখ কপালে তুলিয়া যন্ত্রণায়

৪৩. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-৩০

৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেক, *সমুদ্রের স্বাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

> মুখ বিকৃত করিয়া মণিমালাকে খাবি খাওয়ার উপক্রম করিতে দেখিয়া সাহস হয় নাই। এখন অনায়াসে খুলিয়া নেওয়া যায়। সে টেরও পাইবে না। সকালেই ডাক্তারকে টাকা দেওয়া চলিবে, ওষুধপত্র আনা যাইবে। কিন্তু লাভ কি কিছু হইবে শেষ পর্যন্ত? সেইটাই ভাবনার বিষয়। রুলি-বেচা পয়সায় কেনা ওষুধ খাইয়া জ্ঞান হইলে হাত খালি দেখিয়া মণিমালা যদি হার্টফেল করে![৪৫]

দিনের বেলা ধনীবন্ধু অশ্বিনীর কাছে অর্থ সাহায্যের আশায় সে যায়। অশ্বিনীর মস্তবাড়ির বাহারে গেট পার হওয়ার সময় নিজেকে ঘনশ্যামের দাসানুদাস, কীটানুকীটের চেয়ে তুচ্ছ বলে মনে হয়। সারাক্ষণ মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করে যে, ধনহীনতার মতো পাপ আর নেই। অশ্বিনীর নির্জন বসার ঘরে সে একটি সোনার ঘড়ি দেখে লোভ সামলাতে পারে না। এই ঘড়ি শেষ পর্যন্ত সে পকেটস্থ করে Ego-র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। ঘড়িটা দেখে তার যে চুরির প্রবৃত্তি জেগেছিল, সেটা Id এর তাড়না, আর সে যে দ্বিধা করেছিল, তা তার দুর্বল Super ego-র দুর্বল প্রভাবজাত। কুটিল Ego-র সমর্থনেই সে শেষ পর্যন্ত কাজটি করে। ঘড়ি চুরি করার সময় বিচলিত ঘনশ্যামের মনোবিশ্লেষণ করেছেন লেখক এভাবে :

> ঘরে ঢুকিয়াই ঘনশ্যাম সাধারণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল ঘরে কেউ নাই। সোনার ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ার পর আরেকবার বিশেষভাবে সে বুঝিতে পারিল ঘর খালি। উনানে বসানো কেটলিতে যেমন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ শুরু হয় এবং খানিক পরে আওয়াজ কমিয়া জল ফুটিতে থাকে, ঘনশ্যামের মাথাটা তেমন খানিকক্ষণ শব্দিত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া চিন্তায় টগবগ করিয়া উঠিল। হৃৎপিণ্ড পাঁজরে আছাড় খাইতে শুরু করিয়াছে। গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হাত পা কাঁপিতেছে ঘনশ্যামের। নির্জন ঘরে টেবিল হইতে তুলিয়া একটা ঘড়ি পকেটে রাখা এত কঠিন! কিন্তু দেরি করা বিপজ্জনক। ঘড়িটা যদি তাকে নিতেই হয়, অবিলম্বে নেওয়াই

---

৪৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেক, *সমুদ্রের স্বাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

বুদ্ধিমানের কাজ। দেরি করিতে করিতে হয়ত শেষ পর্যন্ত সে যখন ঘড়িটা তুলিয়া পকেটে ভরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কেহ ঘরে ঢুকিয়া সব দেখিয়া ফেলিবে। কেউ না দেখিলে তার কোনো ভয় নাই। সদ্‌বংশজাত শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সে, সকলে তাকে নিরীহ ভালো মানুষ বলিয়া জানে, যেমন হোক অশ্বিনীর সে বন্ধু। তাকে সন্দেহ করার কথা কে ভাবিবে! ঘড়ি সহজেই হারাইয়া যায়। চাকর ঠাকুর চুরি করে, সন্ন্যাসী ভিখারি চুরি করে। শেষবার ঘড়ি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছিল মনে পড়িয়াও যেন মনে পড়িতে চায় না মানুষের। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি কোথায় ছিল, কে নিয়াছে, কে বলিতে পারিবে!

তারপর ঘড়িটা অবশ্য এক সময় ঘনশ্যামের পকেটে চলিয়া গেল। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাতপায়ের কাঁপুনি থামিয়া তখন নিজেকে তার অসুস্থ, দুর্বল মনে হইতেছে। হাঁটু দুটি যেন অবশ হইয়া গিয়াছে পেটের ভিতর কিসে জোরে টানিয়া ধরিয়াছে আর সেই টানে মুখের চামড়া পর্যন্ত শিরশির করিতেছে।[৪৬]

সাহায্য সহযোগিতার আশায় ঘনশ্যামকে হয়তো অনেকবারই ধনী বন্ধু অশ্বিনীর দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অশ্বিনী তাকে যথার্থ বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছে, অথবা তার সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়েছে, এমন প্রমাণ এ গল্পে মেলে না। অশ্বিনী সবসময়ই তাকে বন্ধু নয় বরং অনুকম্পালোভী ভিখারী শ্রেণীর একজন বলেই বিবেচনা করেছে। ঘনশ্যামের সমস্যা সে সহানুভূতি দিয়ে না হোক, মনোযোগ দিয়েও শোনে নি, এমন কি ঘনশ্যামকে প্রকাশ্যে অপমান করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। গল্পের আভ্যন্তরে সে সাক্ষ্যই মেলে :

ক. মেঘ-গম্ভীর মুখে হাঁসফাস করিতেছে। ঘনশ্যামের কথাগুলি সে শুনিল কি না বুঝা গেল না। চিরদিন এমনিভাবে সে তার কথা শোনে, খানিক তফাতে বসাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া ঘনশ্যামকে দিয়া সে দুঃখ দুর্দশার কাহিনী আবৃত্তি করায়। নিজে কাগজ পড়ে,

---

৪৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেক, *সমুদ্রের স্বাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫

লোকজনের সঙ্গে কথা কয়, মাঝে মাঝে আচমকা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়াও যায়। ঘনশ্যাম থামিয়া গেলে তার দিকে তাকায়। হাকিম যেভাবে কাঠগড়ায় ছ্যাঁচড়া চোর আসামির দিকে তাকায় তেমনিভাবে। জিজ্ঞাসা করে, কী বলছিলে? ঘনশ্যামকে আবার বলিতে হয়।

আজ পাঁচ মিনিটও গেল না, নীরবে ড্রয়ার খুলিয়া পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া ঘনশ্যামের দিকে ছুড়িয়া দিল। ডাকিল, পশু!

পশুপতি আসিয়া দাঁড়াইলে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়কাচা সাবান আছে?

আছে বাবু।

এই বাবুকে একখণ্ড সাবান এনে দাও। জামাকাপড়টা বাড়িতে নিজেই একটু কষ্ট করে কেচে নিও ঘনশ্যাম। গরিব বলে কী নোংরা থাকতে হবে?[৪৭]

খ. পঁচিশ টাকা ধার চাহিলে এ পর্যন্ত অশ্বিনী তাকে অন্তত পনেরোটা টাকা দিয়াছে, তার নিচে কোনোদিন নামে নাই। এ অপমানটাই ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হইতে লাগিল। মণিমালাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচটি টাকা দেয়, কী অমার্জিত অসভ্যতা অশ্বিনীর, কী স্পর্ধা! পথে নামিয়া ট্রাম রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ঘনশ্যাম প্রথম টের পায়, তার রাগ হইয়াছে। ট্রামে উঠিয়া বাড়ির দিকে অর্ধেক আগাইয়া যাওয়ার পর সে বুঝিতে পারে, অশ্বিনীর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা সত্যই জ্বালা করিতেছে। এ বিদ্বেষ ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিবে। হয়ত আজ সারাটা দিন, হয়ত কাল পর্যন্ত।[৪৮]

ঘনশ্যাম বাড়ি ফিরে দেখে তার স্যাঁতসেঁতে ও অন্ধকার বৈঠকখানায় তার সমগোত্রীয় বন্ধু শ্রীনিবাস চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুঁজে আছে। শ্রীনিবাসেরও চাকরি নেই মাসখানেক, তার ছেলেও

৪৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেক, *সমুদ্রের স্বাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

৪৮. ঐ, পৃ. ৩৬৬

মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত। ছেলের চিকিৎসার খরচ যোগাতে শেষ সম্বল স্ত্রীর বালা দুটি বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এসেছে। সে টাকা থেকে শ্রীনিবাস ঘনশ্যামকে দশটি টাকা দিয়েছে মণিমালাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য। তবু অসতর্কতাবশত শ্রীনিবাসের ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ চুরি করতে ঘনশ্যামের কোন দ্বিধা হয় না। মনের অভ্যন্তরে ঘনশ্যাম বিবেকের দংশন তথা Super ego-র নিম্নচাপ অনুভব না করলেও তার লোভী, সুযোগসন্ধানী, কূটকৌশলী Ego এক ধরনের শিহরণ অনুভব করে। অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করা আর শ্রীনিবাসের মানিব্যাগ চুরি করা ঘটনা দুটিকে ঘনশ্যাম বিবেচনা করে দুটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখকের বর্ণনা :

> শ্রীনিবাস চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যামের সর্বাঙ্গে একবার শিহরণ বলিয়া গেল। ঝাঁকুনি লাগার মতো জোরে। শ্রীনিবাস যদি কোনো কারণে গা ঘেঁষিয়া আসিত, কোনোরকমে যদি পেটের কাছে তার কোনো অঙ্গ ঠেকিয়া যাইত। তাড়াতাড়িতে শার্টের নিচে কোঁচার সঙ্গে ব্যাগটা বেশি গুঁজিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরিয়া খোঁজার সময় আলগা হইয়া যদি ব্যাগটা পড়িয়া যাইত! পেট ফুলাইয়া ব্যাগটা শক্ত করিয়া আটকাইতেও তার সাহস হইতেছিল না, বেশি উঁচু হইয়া উঠিলে যদি চেখে পড়ে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি আলগাভাবে শার্টের পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ধরিয়া চা খাইয়াছে, লোকের সঙ্গে দেখা করিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ংকর আতঙ্ক তো একবারও হয় নাই। সেখানেই ভয় ছিল বেশি। তার ব্যাগ-লুকানোকে শ্রীনিবাস নিছক তামাশা ছাড়া আর কিছু মনে করিত না। এখনো যদি ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস তাই মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু কোনো রকমে তার পকেটে ঘড়িটার অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী তো ও রকম কিছু মনে করিত না। সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় তাকে চোর ভাবিয়া বসিত। ভাবিলে এখন তার আতঙ্ক হয়। সেখানে কী নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল! ঘড়ির ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল পাতলা শার্টের পকেটটা। তখন

> সে খেয়ালও করে নাই। অশ্বিনী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, তোমার পকেটে কী ঘনশ্যাম![৪৯]

ঘনশ্যামের মনোজগতে চলে Ego-র যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির আলোড়ন। সুচতুর Ego তাকে বোঝায় : শ্রীনিবাস তাকে চোর ভাববে না। শ্রীনিবাসের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে উপকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। অপর দিকে অশ্বিনী তাকে সন্দেহ করবে। অশ্বিনী যদি তাকে চোর ভেবে বসে, তাহলে ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের কোনো সম্ভাবনা আর থাকবে না। এই দুশ্চিন্তা এক দিকে যেমন তাকে তাড়িত করে, অন্যদিকে তেমনি তার অপমানের কথা ভেবে মনে হয় : অশ্বিনী তাকে চোর জানলেই বা তার ক্ষতি কী। মনোবিশ্লেষণ সূত্রে লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন ঘনশ্যামের দোলাচল বৃত্তি :

> এই ভাবনাটাই মনের মধ্যে অবিরত পাক খাইতে থাকে। শরীরটা কেমন অস্থির অস্থির করে ঘনশ্যামের। সন্দেহ যদি অশ্বিনীর হয়, ভাসা ভাসা ভিত্তিহীন কাল্পনিক সন্দেহ, তার তাতে কী আসিয়া যায়, ঘনশ্যাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এতদিন সে যে অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করে নাই, কোনো সন্দেহ তার সম্বন্ধে জাগে নাই অশ্বিনীর, কী এমন খাতিরটা সে তাকে করিয়াছে? শেষরাত্রে মণিমালার নাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল শুনিয়া পাঁচটি টাকা সে তাকে দিয়েছে, একতাড়া দশ টাকার নোটের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঁচটি টাকার একটি নোট ছুঁড়িয়া দিয়াছে। আর দিয়াছে একখানা কাপড় কাচা সাবান। চাকরকে দিয়া আনাইয়া দিয়াছে। সন্দেহ ছোটো কথা, অশ্বিনী তাকে চোর বলিয়া জানিলেই বা তার ক্ষতি কী?[৫০]

---

৪৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেক, *সমুদ্রের স্বাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

৫০. ঐ, পৃ. ৩৬৯

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঘনশ্যাম বাড়ির সামনে গাড়ি দাড়ানোর শব্দে তাই চমকে ওঠে। তার মনে হয়, অশ্বিনী পুলিশ নিয়ে এসেছে। পরে দেখা গেল নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে দেখতে এসেছেন। ডাক্তারের কাছ থেকে ঘনশ্যাম জানতে পারে মণিমালা আর বাঁচবে না। এ পর্যায়ে ঘনশ্যামের মনে পাপচেতনা জাগে। তার মনে হয়, ঘনশ্যাম অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করেছিল বলেই মণিমালা চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। গল্পের শেষে আমরা দেখি ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসের মানিব্যাগ থেকে খুচরা পয়সাসমেত নোটগুলি রেখে মানিব্যাগ রাস্তায় ফেলে দিলেও অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি যথাস্থানে গিয়ে রেখে আসে।

গল্পের শেষ পর্যায়ে পাঠক মনে একটি প্রশ্ন প্রবল হয়ে ওঠে, ঘনশ্যাম ধনী বন্ধু অশ্বিনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দিলেও দরিদ্র বন্ধু শ্রীনিবাসের টাকা ফিরিয়ে দেয় না কেন? অশ্বিনীর কাছে ঘড়ির যে প্রয়োজন শ্রীনিবাসের কাছে তার টাকাগুলোর প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি। ঘরে অসুস্থ মরণাপন্ন ছেলে, এদিকে সমস্ত সম্পদ বন্ধক দিয়ে আনা টাকা কটি হারিয়ে শ্রীনিবাস নিশ্চয়ই ভয়াবহ বিপদে পতিত। মণিমালাকে বাঁচানো না যাক, শ্রীনিবাসের ছেলেকে বাঁচানোর পথ তো খোলা ছিল। ঘনশ্যাম কেন সে পথে গেল না? অশ্বিনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে ঘনশ্যামের Super Ego-র কোন প্রেরণা আছে কিনা সেটিও ভেবে দেখার বিষয়। ঘনশ্যাম একান্তভাবেই Ego চালিত মানুষ। তার বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন Ego তাকে বুঝিয়েছিল, শ্রীনিবাসের টাকা ফেরত দিলে তার কোন লাভ নেই, কিন্তু অশ্বিনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দিলে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা আছে। তাই সে শ্রীনিবাসের টাকা ফেরত না দিলেও অশ্বিনীর ঘড়ি চুপিচুপি গিয়ে রেখে আসে। Super Ego-র অনুপ্রেরণা সে অনুভব করে নি, করলে শ্রীনিবাসের টাকাও সে ফেরত দিত। Ego চালিত ঘনশ্যাম তার নগদ ও ভবিষ্যৎ লাভকেই বড়ো করে দেখেছে।

এ গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু অভিমত স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন :

> ধনী অশ্বিনীর অবজ্ঞা পেয়েও তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার আগ্রহ, তাই ঘনশ্যাম চুরির ঘড়িটি ফেরৎ দিল; গরীব শ্রীনিবাসের প্রতি, কৃতজ্ঞতা, তার পুত্রের জন্য মমতা সবই ঘনশ্যামের বিবেকের এলাকার বাইরে।[৫১]

সৈয়দ আজিজুল হক লক্ষ করেছেন :

> অর্থাৎ মানবিকতার প্রশ্ন নয়, চৌর্যবৃত্তি ন্যায় কি অন্যায় সেই নীতিবোধ নয় — আসলে ঘনশ্যামের প্রাথমিকভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে কে তাকে চোর ভাবতে পারে কে পারে না — এই বাহ্যিক বিষয়টি।[৫২]

এ বিষয়ে রহমান হাবিবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ঘনশ্যামের মতই মধ্যবিত্ত তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু পরোপকারী শ্রীনিবাসের স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধকের টাকা, যা ছিল শ্রীনিবাসের হাতের পাঁচ – তার মানিব্যাগ থেকে সে টাকা চুরির পর ঘনশ্যামের মধ্যে বিবেকীতাড়না ও অনুশোচনা কাজ না করার আর্থ-মানসিক কারণ হচ্ছে, সমবিত্তশালীদের চেয়ে বেশি বিত্তশালীদের প্রতি মধ্যবিত্ত মানসিকতা অধিকতর লুব্ধ ও উৎসাহী থাকে; সমসম্পত্তিশালী বা সমশ্রেণীর মানুষদেরকে তারা এক ধরনের অবচেতন অবজ্ঞাভরেই দৃষ্টিপাত করে থাকে। আর্থিক, সামাজিক ও শ্রেণীগত সম্পর্কের টানাপোড়নের স্বরূপ মধ্যবিত্ত ঘনশ্যামের সামাজিক-আর্থিক অবস্থানের সম্পর্কসূত্রে গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সামাজিক সমুন্নতির বাসনায় মধ্যবিত্ত চরিত্র কীভাবে সংকীর্ণচিত্ততা, মনুষ্যত্বহীনতা, আত্মমর্যাদাহীনতা,

---

৫১. *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা*, সম্পা. নারায়ণ চৌধুরী কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৩৩

৫২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

মূল্যবোধহীনতা ও নীচতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে – সমাজ ও মানব সম্পর্কের সে প্রসঙ্গটিই এই গল্পে মানিক দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপাদন করেছেন।[৫৩]

'ভেজাল' গল্পগ্রন্থের 'ভয়ংকর' গল্পে মানবমনে এরস্ (Eros) এর নব উদ্যম, তথা সদর্থক জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতি মানুষের অভিযাত্রা এবং লিবিডোতাড়িত অসুস্থ মনের বিকারগ্রস্ততার চিত্র অঙ্কন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বকেই বাঙ্ময় করে তুলেছেন। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসাদ গৃহভৃত্য। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> ভীরু চোখ তুলে ভূষণের মুখের দিকেও একবার সে তাকাতে পারল না। প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছুই নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত।[৫৪]

প্রসাদের মনে ভূষণ দত্তের স্ত্রী আশা লিবিডোতাড়িত হয়ে তার বিকৃত যৌন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে প্রসাদকে উলঙ্গ করে তার দেহ মন্থন করে। আশার এই বিকৃত মানসিকতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন :

> মানুষ মানুষের সামনে নগ্ন হতে লজ্জিত হয়, কিন্তু মনুষ্যেতের প্রাণীর সামনেই সে নির্দ্বিধায় হতে পারে উলঙ্গ। গৃহে সবল-সুস্থ স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ যে বারবনিতার নিকট গমন করে তার কারণও ওই। অর্থাৎ মনের অচেতন স্তরে যে-আদিম নীতিদুষ্ট আকাঙ্ক্ষাকে সে ধারণ করে তা এমন অমর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই কেবল পরিতৃপ্ত হতে পারে; স্বামী-স্ত্রীর সম্মানজনক সম্পর্কের পরিবেশে যে সব কামনা, প্রসঙ্গ হিসেবে ও, উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ পায় না। আশার মনের গোপন

---

৫৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, *ভেজাল*, মানিক রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩

> অভিলাষও তাই স্বামী ভূষণকে দূরে রেখে প্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত হওয়ার সুযোগ খোঁজে।[৫৫]

লিবিডোতাড়নায় অন্ধ, আবেগহীন অভ্যাসে ক্লান্ত স্বামী ভূষণকে বাদ দিয়ে আশা মেতে থাকে প্রসাদকে নিয়ে। আশার এই বিকৃত কর্মকাণ্ডের কারণ নির্দেশ ও দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেন :

> ভূষণের তুলনায় এ লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্যরকম, এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হল এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায় হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোটো ছেলের মতো, ইচ্ছা-খুশিতে আকাশে তুলে আছড়ানো চলে মাটিতে। তাছাড়া, তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না, ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। ওর বিচারের মূল্য কতটুকু! মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা না-ভাবাকে!
>
> তবে কেমন যেন প্রাণীহীন মানুষ, জড় পদার্থের মতো, সাড়া দিতে জানে না। শুধু বিবর্ণ হয়ে যায়, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দিন তিনেক নেড়েচেড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আশার রোখ চেপে গেল। বিয়ের ব্যবস্থাটা দিল বাতিল করে।
>
> মুচকে হেসে বলল, বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।
>
> সেই থেকে এই রকম আরম্ভ করেছে আশা। এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে ভূষণ যে রাত্রে বাড়ি থাকবে না।[৫৬]

---

৫৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

৫৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪-৪০৫

আশা যখন প্রসাদের সঙ্গে মিলন কামনা করে, তখন দ্বিবিধ কারণে ঐ প্রবৃত্তিকে জয় করা বা আশাকে পরিতৃপ্ত করা প্রসাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রথম কারণ এই যে, পরস্ত্রীর এই দেহগত লালসাকে সে মনে করে অন্যায় ও অবৈধ। এখানে Super Ego তাকে বাধা দেয়। দ্বিতীয়ত, আশা তার প্রভুপত্নী বলে তার নীতিহীন কামনা-বাসনার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনো পথ খোলা থাকে না। এখানে সে Ego চালিত। এই দ্বিবিধ কারণে তার মধ্যে সাময়িক যৌন অক্ষমতা দেখা দেয় যা তাকে ভীতসন্ত্রস্ত ও বিব্রত করে। আশাকে দেখলে তাই প্রসাদের ভয় জাগে, বিতৃষ্ণা জাগে :

ক. আশাকে ইশারায় ডাকতে দেখে আর একবার বুকটা তার কেঁপে গেল।

জাম পেড়ে এনো আমার জন্যে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।

মরণ তোমার আজ্ঞে হুজুর! — আশা গা-ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, বউঠান বলতে পার না?[৫৭]

খ. চেরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দুটি ঘষা শ্বেত পাথরের মতো অনুজ্জ্বল দাঁত সবসময়েই চোখে পড়ে, কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আর একটি দাঁতে খেলে যায় সোনালি ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মতো প্রকাণ্ড চ্যাপটা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা-ধরা জোয়ারের মতো অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থমথম করছে। প্রসাদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশা এই রকম শুরু করলে শরীরটা তার শক্ত হয়ে যায়।[৫৮]

---

৫৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩

৫৮. ঐ, পৃ. ৪০৪

সুস্থ যৌন জীবনাকাঙ্ক্ষায় বিয়ে করার কথা ভাবে প্রসাদ । এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> শখ হয়েছিল, বিয়ে করবে। কাকে বিয়ে করতে দেখে, কার কাছে নববধূকে শয্যাপার্শ্বে পাওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে অথবা কার সুখশান্তি-ভরা দাম্পত্য জীবনকে হিংসা করে ইচ্ছাটা তার জেগেছিল বলা যায় না। রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরু লাজুক কিশোরী একটি বউকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন। কমবয়সী, কুমারী, বোকাটে ধরনের এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির যে কোনো মেয়েই বা কে খুঁজে দিচ্ছে! জানাশোনার মধ্যে নিজের জন্য নিজেকেই তার একটি পাত্রী ঠিক করতে হল। মেয়ের বাপ গরিব, মেয়েটি চলনসই, সুতরাং সুলভ। তিনদিনের চেষ্টায় অনেক ভণিতার পর মেয়ের বাপের কাছে ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে পারল। মেয়ের বাপ কৃতার্থ হয়ে বলল, সে তো আমাদের ভাগ্যি।[৫৯]

কিন্তু আশার বিরোধিতার কারণে প্রসাদের আর বিয়ে করা হয় না।

ফ্রয়েডের মতে, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (self-preservation) এবং বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি (reproduction) মানুষকে সামনের দিকে চালিত করে। জীবনমুখী এই দুটি প্রবৃত্তির কর্ণধার যে মানসিক শক্তি, ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন এরস্ (Eros)।[৬০] ঝড়ে আক্রান্ত হলে প্রসাদের Eros জেগে ওঠে। সে যেন নবজন্ম লাভ করে। ঝড় তাকে আমূল বদলে দেয়। যাবতীয় নঞর্থকতার ঊর্ধ্বে সে খুঁজে পায় জীবনের সদর্থকতা। এক কালে যে ঝড়কে সে মৃত্যুর মতো ভয় পেত, সহসাই সে ঝড়কে সে উপেক্ষা করতে শেখে। পরিণামে ঝড়কে সে জয় করে :

> মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনোদিন হয়নি। ক্রুদ্ধা প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কিনা ভেবে কিছুক্ষণ সে

---

৫৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪

৬০. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

> সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না।[৬১]

ঝড়ের পরে যে প্রসাদকে আমরা দেখি, সে যেন এক নতুন প্রসাদ। ভূষণকে সে আর ভয় পায় না। তার নবজন্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে মানিক বলেন :

> তার মধ্যেও মাথাটা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মনে হয়। ধীরে সুস্থে সব যেন সে হিসাব করতে পারছে, বুঝতে পারছে, ভুল হবার ভয় নেই। সে টের পাচ্ছে রুখে ওঠার ভঙ্গিতে সে যদি এখন দু-পা এগিয়ে যায়, ভূষণ আরো ভয় পাবে, আরো সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাবে, আরো নরম গলায় কথা বলবে, হয়ত দু-পা পিছিয়েও যাবে! এত ভীরু ভূষণ? এত সহজে সে ভয় পায়?
>
> কী যে উপভোগ্য মনে হয় এই মুহূর্তগুলি প্রসাদের! শেষ করে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বিকালেও যার কাছ থেকে ছুটে পালাবার জন্য অদম্য প্রেরণা জেগেছিল, অকারণে সাধ করে তাঁর সামনে প্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলার নেই জেনেও কৈফিয়ত দেওয়ার ভান করে বলে, পড়ে গেলে কী করব! গাছ চাপা পড়েছিলাম, মরে যেতাম আর একটু হলে, তখন কারো টাকার কথা খেয়াল থাকে?[৬২]

দ্বিতীয় জন্মে সুস্থ যৌনতা ফিরে পায় প্রসাদ। যে যৌন অক্ষমতা বা শৈথিল্যের কারণে একদা প্রভুপত্নী আশাকে সদা সর্বদা সে ভয় পেত, সেই আশাকেই লিবিডোতাড়িত হয়ে প্রসাদ অবলীলায় জড়িয়ে ধরে :

> প্রসাদ চোখ বুজতে চায়, বুজতে পারে না। পালিয়ে যাবে ভেবে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভূষণকে ভয় দেখিয়ে যে বিদ্রোহী উগ্র আনন্দ তার জেগেছিল, এত সহজে তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে সে আনন্দ তাকে যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেবে

---

৬১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬

৬২. ঐ, পৃ. ৪০৭

> না। মহাপাপ থেকে, অনন্ত নরক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের দেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে সে শুধু দেখতে পায় কোমল মাংসে গড়া অপরূপ কাঁধ, বাহু আর বুক। আশা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র তার ঘামে ভেজা দেহটা সে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।[৬৩]

প্রসাদের আলিঙ্গনে রন্ধনরতা আশাও সায় দেয়। প্রসাদকে নিয়ে সারারাত কাটানোর পরিকল্পনায় সে বিভোর। শৈল্পিক নিরাসক্তিতে মানিক দৃশ্যটিকে রূপায়ণ করেছেন এভাবে :

> বিস্ময় বা উত্তেজনা আশার নেই, মদালস অচপল নারীর মতো সে যেন বহু পরিচিত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করেছে। কতটুকু সময়ই বা প্রসাদের কাটল সেই ব্যাকুলতাহীন নিবিড় আলিঙ্গনে! ভূষণকে যতটুকু সময় ভয় দেখিয়েছিল তার চেয়ে বেশি নয়, সেইটুক সময়ের মধ্যেই প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশা এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা-কপাল কুটে আর্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশবালিশকে আঁকড়ে ধরার মতো তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গমর্ত্য ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃদপিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের ঢিপঢিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে ড্যাপসা রবারের বলের মতো তার দুটি স্তনের চাপে আগুন-ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল। প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, সাফসুফ হয়ে নাওগে। আমার চানের ঘরে ভালো করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বড়ো বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারোটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।[৬৪]

---

৬৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৮

৬৪. ঐ, পৃ. ৪০৮

জীবনকে নতুন করে অনুভব করার পর আশার ঘিনঘিনে বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে নতুন করে গড়বার প্রেরণায় প্রসাদ কাউকেও কিছু না বলে ভূষণের বাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। হারিয়ে যাওয়া সাতশো তেইশ টাকা খুঁজে পাওয়ার আশায় ভূষণের দামি বড়ো টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সে পেনোর মাঠের দিকে এগিয়ে চলে। তার উদ্দেশ্য, হারানো টাকা পাবার পর যে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই ট্রেনেই সে উঠে পড়বে; নয়তো স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে সে যে কোনো দিক থেকে আসা প্রথম ট্রেনের প্রতীক্ষায়। অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো এই প্রসাদ সদর্থক জীবন আকাঙ্ক্ষায় তন্ময়, আশাবাদী। তার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক আমাদের বলেন :

> ভাবতেও প্রসাদের বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কোন ভয়ংকর আবেষ্টনীর মধ্যে সে গিয়ে পড়বে! তবে তার আশা আছে একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের সঙ্গে পরিচয় হলে ভয় তার কেটে যাবে। সাতশো তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে একটা দোকান-টোকান খুলেও সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না? এমন একটি বউ-ও কি তার জুটবে না যে কিশোরী, পূর্ণযৌবনা, কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে-তোলা জমকালো সংসারের গৃহিণী?[৬৫]

এ গল্প সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণযোগ্য :

> 'ভয়ঙ্কর' মানবমনের এক নূতন রকমের প্রতিক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ভয়াবহ ও বীভৎস অভিজ্ঞতার চাপে এক দুর্বলচিত্ত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির মোহ টুটিয়া তাহার মধ্যে কেমন করিয়া অকুণ্ঠিত আত্মনির্ভর ও দৃঢ় উদ্দেশ্যের উন্মেষ হইয়াছে, গল্পটিতে সেই চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।[৬৬]

৬৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভয়ংকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৯

৬৬. জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সম্পা. ভূঁইয়া ইকবাল, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৪৩

রহমান হাবিবের মন্তব্যে শোনা যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রতিধ্বনি :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভয়ঙ্কর' গল্পে পুঁজিপতি ভূষণ দত্ত নয়; বরং তার ব্যক্তিত্বহীন, ভয়গ্রস্ত, বুদ্ধিহীন, দারিদ্রক্লিষ্ট ভৃত্য প্রসাদেরই ভীতিপ্রদতা কেটে গিয়ে কিভাবে সে ভয়হীন, আত্মনির্ভর, নিজস্ব চেতনাশাসিত হিসেবে নিজেকে বিনির্মাণ করেছে, তারই ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।[৬৭]

'ভেজাল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মেয়ে' গল্পে বাবা নীরদ ঘোষালের মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্রাঙ্কণই মানিকের অন্বিষ্ট। সত্যপ্রিয় ঘোষের মতে : 'মেয়ে' গল্পের বিষয়বস্তু পিতাপুত্রীতে আসঙ্গলিপ্সা। ইলেকট্রা কমপেক্স।[৬৮] ফ্রয়েডের মতে, তিন-চার বছর বয়সে শিশুর লিবিডো অন্তর্মুখী প্রবণতা পরিহার করে ওঠে বহির্মুখী। শিশু তখন বহির্জগৎ থেকে কেবল স্নেহ আদরই কামনা করে না, তার অচেতন মনে লিবিডোর অনুভূতিও সক্রিয় হয়। ফলে শিশুদের মধ্যে উপস্থ-উত্তেজনার মাধ্যমে সুখানুভবের প্রেরণা এ সময়ে লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে শিশুপুত্র তার মার প্রতি এবং শিশুকন্যা তার বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফ্রয়েড এরই নাম দিয়েছেন যথাক্রমে ইডিপাস ও ইলেকট্রা কমপেক্স। এ ক্ষেত্রে আরও স্মরণীয় যে, পুত্রকন্যা এই উভয় শিশুই প্রথমে মায়ের প্রতি তাদের লিবিডো পরিচালিত করে। কিন্তু শিশুকন্যা যখন তার জননেন্দ্রিয়ের ভিন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তার মধ্যে এমন উপলব্ধি আসে যে, হয়ত তার মা-ই তার উপস্থছেদন করেছেন। সে-কারণে মায়ের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন শিশুকন্যা বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লিবিডোতাড়িত এই যে আকর্ষণ তাকে কেবল আসঙ্গলিপ্সা বলা যথার্থ নয়। কেননা, মানবমনের লিবিডোতাড়নাকে ফ্রয়েড কেবল যৌনাকর্ষণ বলতে চান নি। তাঁর মতে, সকল প্রকার জীবনাগ্রহ, শক্তি ও প্রেরণার মূলে রয়েছে এই লিবিডো।[৬৯] ফ্রয়েডের ভাষায় :

---

৬৭. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৬৮. *অনুষ্টুপ*, সম্পা. অনিল আচার্য, কলকাতা, শারদীয় সংখ্যা : ১৩৯২, পৃ. ১৪৯

৬৯. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

ক. Among these tendencies the first place is taken with uniform frequency by the child's sexual impulses towards his parents, which are as a rule already differentiated owing to the attraction of the opposite sex — the son being drawn towards his mother and the daughter towards her father.[৭০]

খ. But now the paths of the sexes divide. The boy enters the Oedipus phase; he begins to manipulate his penis, and simultaneously has phantasies of carrying out some sort of activity with it in relation to his mother; ... The girl, after vainly attempting to do the same as the boy, comes to recognize her lack of a penis or rather the inferiority of her clitoris, with permanent effects upon the development of her charecter.[৭১]

বাবা নীরদ ঘোষালের সঙ্গে কন্যা চারুর ইলেকট্রা কমপেক্স এবং স্বামীর সঙ্গে অনুরূপার আবেগহীন অভ্যাসজনিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণা এ গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাবের ইঙ্গিতবাহী।

চারুকে নীরদের মনে হয় অনুরূপারই নতুন সংস্করণ। আবেগহীন অভ্যাসের কারণে অনুরূপার মুখের গড়নে 'প্যাঙাশে' ভাব নীরদ প্রত্যক্ষ করে, মেয়ের মুখখানি সে তুলনায় ছিপছিপে, লাবণ্যময়। নীরদের দৃষ্টিকোণ থেকে চারুর বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

---

৭০. Sigmund Freud, Three Essays on The Theory of Sexuality, tr. and Newly edt. by James Strachey, London, 1962, P. 93

৭১. an Outline of Psychoanalysis, tr. by James Strachey, New York, 1963, P. 29-30

মেয়েটাই প্রথম সন্তান। নাম চারু। অনুরূপার সরু কাঠির মতো দেহ থেকে সে যেন বেরিয়ে এসেছে নতুন একটি সংস্করণের মতো, রোগার বদলে ছিপছিপে হয়ে। মায়ের প্যাঙাশে মুখের গড়নটি শুধু পায়নি, চিবুকের অভাব ঘটে গেছে।[৭২]

ফ্রয়েড কথিত আবেগহীন অভ্যাসের কারণে স্বামী নীরদ এবং স্ত্রী অনুরূপার মধ্যে দাম্পত্যসম্পর্ক নিবিড়, প্রণয়দীপ্ত নয়। এ গল্পে স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত থাকলেও তার প্রতি স্বামী নীরদের আকর্ষণের কোনোরূপ ইঙ্গিত নেই। অপরদিকে স্বামীর প্রতি অনুরূপার বিরাগ, বিতৃষ্ণা, বিরোধ ও বিদ্রোহ সুস্পষ্ট। স্বামীকে কোনোরূপ সেবা-যত্নে সে আগ্রহী নয়, বরং এ কাজে সে কন্যা চারুকেই নিয়োজিত রাখে। এর ভেতর দিয়ে দীর্ঘদিনের দাম্পত্যজীবনে তার আবেগহীন অভ্যাসই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অনুরূপার মনোবিশেষণ সূত্রে লেখক তাই বলেন :

> চারু একটু একটু বড়ো হয়েছে আর অনুরূপা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু একটু করে বাপের সেবার ভার তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। মনের আড়ালে যে বিরোধ ও বিতৃষ্ণা জমেছে অনুরূপার সেটা একদিনের সঞ্চয় নয়, নিজে সে ভালো করে জানেও না যে প্রয়োজন ও অভ্যাস ছাড়া স্বামীর কাছে যাবার তাগিদ সে কখনো অনুভব করে না! মেয়েকে বাপের সেবা শেখানো যে তারই বিদ্রোহের প্রকাশ, এটা কল্পনা করার ক্ষমতাও অনুরূপার নেই। দূরে যাবার, তফাতে থাকার তাগিদ যে অহরহ তার মধ্যে জেগে আছে, অনুরূপা তা জানে না, জানলেও বিশ্বাস করবে না।[৭৩]

বাবার দেখাশুনা তাই চারুকেই করতে হয়। এই সেবাসূত্রেই চারু তার পিতার নৈকট্য লাভ করে। পিতা ও কন্যার দৈনন্দিন সাহচর্যের চিত্র মানিক বেশ বিস্তৃতভাবেই এঁকেছেন :

---

৭২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে, *ভেজাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৭৩. ঐ, পৃ. ৪৩১

ক. বাবার জন্য ছোটোবড়ো কাজগুলি করে যাওয়া চারুর জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে জড়িয়ে গেছে। বড়ো হওয়ার সঙ্গে যা কিছু বেড়েছে চারুর জীবনে বা নতুন এসেছে সব মানিয়ে নেওয়া হয়েছে এই কর্তব্যের সঙ্গে। চারু ভাবে না যে বাবার জন্য দশবার উঠে আসতে হওয়ায় পড়ায় তার ছেদ পড়ল। দশবার উঠে আসার ফাঁকগুলিই তার পড়ার জন্য। সংসারের কাজে মা তাকে প্রায় ডাকেই না, সেটা অবশ্য তাকে পড়া করা আর গান শেখার সুযোগ দিতে। কিন্তু বাবার কাজ আলাদা, সংসারের কাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। চা করা, খাবার করা, ভাত রাঁধা, সংসারের কাজ, ওসব মা করে। চায়ের কাপ, খাবারের রেকাবি, ভাতের থালা বাবার সামনে পৌঁছে দেওয়া তার কাজ। বাবা জল চাইলে মা কলসি থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত করতে পারে, বাবাকে গেলাসটা কিন্তু দিতে হবে তাকেই। বাবার জামা-কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদের হিসাব রাখা, বই-খাতা-কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখা, বিছানা পাতা, চটি এগিয়ে দেওয়া, বাতাস করা, ঘামাচি মারা ইত্যাদি যত কিছু করা দরকার সেগুলি করার জন্য চারু জন্মেছিল পৃথিবীতে।[৭৪]

খ. নীরদকে যেমন ভয় করে, তেমনই ভক্তি করে চারু। প্রতিদিনের চলতি সেবার অতিরিক্ত কোনো সেবা করার সুযোগ পেলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। নীরদের ছোটোখাটো অসুখ হলে সে উদগ্রীব, উৎসুক হয়ে থাকে — যা কিছু করার আছে তারও বেশি কিছু করার সাধ চাপা উচ্ছ্বাসের মতো তার ছোটো বুকটিতে ঠেলে উঠতে চায়। নীরদ চোখ বুজে পড়ে থাকে সামান্য অসুখের ধাক্কায়, চারু তার ভারিক্কি পৌঢ় মুখে ক্ষমতা, শাসন ও মমতায় গড়া মৃদু ভয়ংকর রহস্য দেখে দেখে মনের মধ্যে বিহ্বল হয়ে যায়।[৭৫]

---

৭৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে, *ভেজাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩১

৭৫. ঐ, পৃ. ৪৩১

এ গল্পে গৃহশিক্ষক জগতের আবির্ভাব সুদূরপ্রসারী, অলঙ্ঘনীয় প্রভাব বিস্তার করে। চারুকে পড়ানোর জন্য তাকে রাখা হয়। মা অনুরূপা তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেও বাবা নীরদের রয়েছে তাতে ঘোরতর আপত্তি। জগৎ পড়ায়, চারুর মন পড়ে থাকে অন্দরে। দাঁড়ান, আসছি বলে থেকে থেকে সে উঠে যায় বাবার খুঁটিনাটি সেবা করতে। দিন সাতেক চুপ করে থেকে গৃহশিক্ষক জগৎ যখন এসব কাজের ফলে পড়াশুনার ত্রুটির কথা জানায়, তখন নীরদই কন্যাকে তার সেবা-যত্ন থেকে বিরত রাখে। আর সেই অবসরে যুবক গৃহশিক্ষক জগতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ ঘটে চারুর। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> চারু অগত্যা মনকে সরিয়ে নিল পড়াশোনার দিকে এবং তার ফলে গুরুর প্রতিও একটু মনোযোগ তাকে দিতে হল। প্রথমেই তার খেয়াল হল যে দুবেলা তিনঘণ্টা তা যে পড়ায় তার গোলগাল নিরীহ ভালোমানুষি মুখখানা আর যাই হোক একটি সুনির্দিষ্ট মানুষের মুখ। তারপর সে টের পেল যে লোকটা বই পড়েছে গাদাগাদা। তারও পরে সে নিজে কাছে স্বীকার করল যে লোকটা পড়াতে পারে অতি চমৎকার, পড়ানো শুনতে তার ভালো লাগে।[৭৬]

কেবল জগৎ নয়, সময়ে-অসময়ে নীরদও কন্যাকে পড়ায়। নীরদ পাঠ্য বিষয়বহির্ভূত বাড়তি জ্ঞান এবং জীবনাদর্শ সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞান দান করে— জগৎও কেবল স্কুলের পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে তার জ্ঞানদানকে সীমাবদ্ধ রাখে না। নীরদ ও জগতের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে চারু বুঝতে পারে, জগতের তুলনায় তার বাবার জ্ঞান ভাণ্ডার বড়োই সঙ্কীর্ণ, অনেক বিষয়ই জগতের মতো তার স্পষ্ট ধারণা নেই এবং কোনো বিষয়ই তিনি জগতের মতো সহজ ও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন না। ইলেকট্রা কমপেক্সের কারণে বাবার প্রতি মমতাবশত জগতের প্রতি চারু ক্ষুদ্ধও যেমন হয়, তেমনি জগৎ যখন তার দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের কথা বলে নিজের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেয়, তখন তার প্রতি চারু অনুরাগ বোধ করে। চারুর এ দ্বিবিধ মানসিকতার চিত্র উন্মোচন করেছেন মানিক শৈল্পিক নিরাসক্তিতে :

---

৭৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে, *ভেজাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩

> জগতের বিরুদ্ধে চারুর মনে একটা প্রবল নালিশ জাগে। সে যেন তার বাবাকে অপদস্থ করছে, অবজ্ঞা করছে। সময় সময় মনের রাগ সে সামলাতে পারে না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে, আপনার চেয়ে বাবা ঢের বেশি জানেন। কত পড়েছেন বাবা!
>
> জানেন বৈকি। আমি আর কতটুকু জানি বল? বই কেনার পয়সা নেই, চেয়ে চিন্তে ধার করে পড়তে হয়, কত কষ্টে যে আমি লেখাপড়া শিখেছি, তুমি ভাবতেও পারবে না চারু।
>
> তা ঠিক। রাগ উবে গিয়ে চারুর মন সমবেদনায় ভরে যায়। সে ভাবে, জানুকগে জগৎ তার বাবার চেয়ে অনেক বেশি, আর তো কিছুই নেই ওর তার বাবার মতো! চাকরি নেই, পয়সা নেই, বাড়িঘর নেই, আপনার লোক নেই, কিছুই নেই![৭৭]

ইতোমধ্যে জগৎ ভালোভাবে পাস করে এবং দুশো টাকা বেতনের চাকরি শুরু করে। চারুর সম্মতিক্রমে একদিন যখন জগৎ স্বয়ং নীরদের কাছে বিবাহ প্রস্তাব করে, তখন নীরদ ঘোষাল তাতে শুধু অসম্মতিই জানায় না, উপরন্তু জগৎকে তার গৃহে পুনরায় প্রবেশও নিষিদ্ধ করে। নীরদ ও জগতের কথোপকথন, কন্যার সম্মতি আছে বুঝতে পেরে নীরদের মনোবিশেষণ করেছেন মানিক নিরাসক্তভাবে :

> মাথা নিচু করে সে বলল, এতদিন আপনাকে বলবার মুখ ছিল না, বলতে সাহস পাইনি। আজ একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। কথাটা শুনে নীরদ চমকে গেল— তুমি! তোমার মধ্যে এসব আছে তা তো জানতাম না বাপু!
>
> জগৎ আশ্চর্য হয়ে বলল, আজ্ঞে, দুশো টাকায় স্টার্ট পেয়েছি —
>
> আমার তাতে কী? আমি চারুকে পড়াব— এখন বিয়ে দেব না।
>
> আজ্ঞে ও আর পড়তে চায় না।

---

৭৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে, *ভেজাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩

> তার মেয়ে চারু, জগৎ আজ তাকে জানাতে এসেছে, চারু পড়তে চায় না! রাগে নীরদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করে। নিজের জানা ও বোঝা অখণ্ড যুক্তিতর্ক রীতিনীতি যদি মিথ্যা হয়ে যায়, জগতের কথাই যদি সত্য হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত! চারুর মতামত না জেনেই কি জগৎ তার কাছে এ প্রস্তাব করার সাহস পেয়েছে?[৭৮]

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক মন্তব্য করেছেন :

> চারুর যুবকপ্রণয়ের তথ্য উদ্ঘাটনের পর নীরদ ঘোষালের পিতৃহৃদয় যে ক্ষতবিক্ষত হয়, তার কারণ কন্যার ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা নয়। বরং তার পরিবর্তে কোনো যুবকের প্রতি স্নেহময়ী কন্যার অনুরাগ ভালোবাসা ও সাহচর্যলাভের আকাঙ্ক্ষা সংযুক্ত হওয়ায় এক ধরনের ঈর্ষা, স্পষ্টতই, নীরদ ঘোষালের চিত্তে ঝড়ের সূচনা করে। কন্যার যুবক আগ্রহ পরিবর্তনের পরবর্তী প্রচেষ্টায়ই আমরা তার পরিচয় পাই।[৭৯]

নীরদের মনোবিশ্লেষণ সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ পর্যায়ে উপস্থাপন করেছেন তার যুবতী কন্যার মন জয় করার হাস্যকর সব প্রয়াস এবং অতঃপর বিফল হয়ে তার নিরাশাক্লিষ্ট মানসপট :

> জগৎকে তাড়িয়ে দিয়ে নীরদ একেবারে চুপ করে গেল। চারুকে কিছুই বলল না। ধমক হোক, উপদেশ হোক কিছু একটা শুনবার জন্য মেয়ে যে তার উৎসুক হয়ে আছে, বারংবার সেটা টের পেতে লাগল নীরদ। বুঝতে তার বাকি রইল না যে একবার কথাটা তুললেই চারু তার মনের কথা জানিয়ে দেবে এবং জানাবার জন্য সে ছটফট করছে। তবু মনটা তার প্রতিদিন বিগড়ে যেতে লাগল মেয়ের মুখে তার মার মুখের প্যাঙাশেপনার আবির্ভাবের সূচনা দেখে। তবু নীরদ হাল যেন ছাড়তে পারল না। মেয়েকে আরো বেশি কাছে রেখে, তাকে পড়িয়ে, গল্প শুনিয়ে, বেড়াতে নিয়ে

---

৭৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে, *ভেজাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪

৭৯. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

> গিয়ে, সিনেমা দেখিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল আগের অবস্থায়। কিন্তু কোনোদিক দিয়েই নাগাল সে যেন আর পেল না মেয়ের।
>
> সর্বদা কী যেন ভাবে তার মেয়ে, কোথায় যেন পড়ে থাকে তার মন। তার কাছে থেকেও কোথায় সে যেন থাকে, যেখানে তার যাওয়ার ক্ষমতা নেই।[৮০]

মাস তিনেক পরে জগৎ আবার ফিরে আসে এবং চারুকে বিয়ে করার জন্য পুনরায় চাপাচাপি করে। সে বলে "আপনি যদি ওকে পড়াতে চান, পড়াবেন যতদূর খুশি। আমি আপত্তি করব না। কথাটি বলব না।"[৮১] কিন্তু স্ত্রী অনুরূপা যখন খবর দেয় চারু আর স্কুলে যাবে না; এক শর্তেই সে পড়াশুনা করতে পারে যদি তাকে জগতের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। জগতের প্রতি কন্যা চারুর এই প্রবল আগ্রহের কথা শুনে পিতা নীরদের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। যে নীরদ একদা মেয়েকে এম.এ পর্যন্ত পড়াবে বলে বদ্ধ পরিকর ছিলো, সেই নীরদই অফিস কামাই করে স্কুলে গিয়ে চারুর নাম কাটিয়ে আসে। গল্পের শেষে দেখা যায় নীরদ আবার আগের মতো মদ খেয়ে বেশি রাতে বাড়ি ফিরছে। মদ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মদে আসক্তির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সৈয়দ আজিজুল হক বলেছেন :

> ... লিবিডোর এই ব্যাপকার্থক কথা মনে রাখলে, আমরা নীরদ ঘোষালের আসক্তিত্যাগের মাধ্যমে মনোগত শক্তি ও উদ্যামের এবং পুনরায় আসক্তির নিকট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দুর্বলতা ও হতাশার বহিঃপ্রকাশকে একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যায় আলোকিত করতে সমর্থ হবো। স্মরণীয় যে, এই সবকিছুর মূলে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা হিসেবে ক্রিয়াশীল পিতার প্রতি চারুর আগ্রহ ও আগ্রহহীনতা।[৮২]

---

৮০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪

৮১. ঐ, পৃ. ৪৩৪

৮২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

'মেয়ে' গল্প সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নকে পুরোপুরি সঠিক বলে বিবেচনা করা যায় না। তিনি বলেছেন :

> বাপ ও মেয়ের সম্পর্কবৈশিষ্ট্যটি ভাল করিয়া ফুটে নাই — মেয়ের সেবা-শুশ্রূষা ও বাপের শুভানুধ্যায়ী স্নেহের পিছনে কোমলতার পরিবর্তে এক প্রচ্ছন্ন জবরদস্তি ও একগুঁয়েমির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ... কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঈঙ্গিতগুলি উদ্দেশ্যের সূত্রগ্রথিত হইয়া সুসংবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই।[৮৩]

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সকল নির্দেশনা বিবেচনা না করেই হয়তো শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবা-মেয়ের সম্পর্কবৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অপরিস্ফুটন ও উদ্দেশ্যহীনতা প্রত্যক্ষ করেছেন — এমন অনুমান করেছেন একজন সমালোচক।[৮৪] এ গল্প সম্পর্কে নিতাই বসুর মন্তব্য সমগ্রতাসন্ধানী :

> যুবতী মেয়ের চিত্তচাঞ্চল্য যুবক গৃহশিক্ষকের উপর যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার চেয়ে যথেষ্ট আলোড়ন এনেছে তার পিতার চরিত্রে। স্নেহের একাধিপত্যে ফাটল সৃষ্টি হওয়ায় চারুর পিতা যে পুনশ্চ মদ খেতে শুরু করলো, তা তার অবচেতন মনের একটা সুপ্ত প্রবৃত্তির প্রচণ্ড প্রতিরোধকল্পে। মেয়ের উপর পিতার দুর্বলতার স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে ফ্রয়েড যে উক্তি করেছেন, সেই ধরনের complex অতি পরিমিত ও সংযত চিত্রণই এই গল্পের মূল উপজীব্য।[৮৫]

প্রসঙ্গত, রহমান হাবিবের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> কন্যা চারুর প্রতি পিতা নীরদের অবচেতনের সে উদ্যমী সম্পর্ক উপর্যুক্ত প্রাগৈতিহাসিক মানবমানবীসম্পর্কের অবচেতন প্রবাহকেই নির্দেশ করে। জগতের প্রতি

---

৮৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৩১

৮৪. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

৮৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

কন্যা চারুর প্রণয়সম্পর্কে পিতা নীরদের ঈর্ষার জাগৃতিও মানবসম্পর্কের অবচেতনের গোপনানুভবকেই নির্দেশিত করে। তবে কামজ ভাবনা ও কার্যক্রমের নৈতিক ও শুদ্ধতম রূপের মধ্যেই ইতিবাচক শুভ মূল্যবোধ ও প্রশান্তি এবং স্রষ্টা - সান্নিধ্যের অপরূপতা অন্তর্গত থাকে বলে আমি মনে করি।[৮৬]

'হলুদ পোড়া' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'ধাক্কা' গল্পে সুন্দরী বিধবা গৃহপরিচারিকা সুমতির সঙ্গে গৃহকর্তা ডাক্তার অক্ষয় ও তার বাড়িতে আশ্রিত কম্পাউণ্ডার নন্দর ত্রিভুজ প্রণয়ের দ্বন্দ্ব-সংকট রূপায়িত হয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী অলকার মৃত্যুর পর সুমতির প্রতি অক্ষয়ের আকর্ষণের মধ্যে, নন্দ ও সুমতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আবেগ-অনুরাগ-আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভেতর এবং নন্দর বোন সীতার জীবনতৃষ্ণাজনিত আবেগের বশে পছন্দের যুবকের সঙ্গে পলায়ন — ইত্যাদি সকল কর্মকাণ্ডের মূলেই ফ্রয়েডকথিত লিবিডোর তাড়না লক্ষণীয়। উপরন্তু, স্বামী অক্ষয় এবং তার স্ত্রী অলকার দুর্বিষহ দাম্পত্যজীবনে ফ্রয়েডকথিত আবেগহীন অভ্যাসই পরিলক্ষিত হয়। সব মিলিয়ে দেখতে গেলে 'ধাক্কা' গল্পে প্রবলভাবে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যাবে।

আবেগহীন অভ্যাসের কারণে অক্ষয় ও অলকার দাম্পত্যজীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অলকা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তার অর্ধাঙ্গ অবশ। রুগ্ণা স্ত্রীর সেবা করা ও তার শিশুপুত্রের দেখাশুনা করার জন্য দুবছর আগে সুমতিকে বাড়িতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুমতি তেইশ বছরের সুন্দরী যুবতী। তার আছে রুচি ও ব্যক্তিত্ববোধ। নিজের যোগ্যতায় দুই বছরেই সে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়িতে অনিবার্য অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বামীসোহাগবঞ্চিত অলকার হীনমন্যতা, গৃহপরিচারিকা সুমতির প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা, স্বামীর বহির্বিষয়ক ব্যস্ততাকে অবহেলা বিবেচনা ইত্যাদি কারণে তাদের দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। লেখক অঙ্কিত এরকম কিছু খণ্ডচিত্র :

---

৮৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

ক. অলকার হইয়াছে পক্ষঘাত। অর্ধাঙ্গ অবশ।

দিবারাত্রি বিছানায় শুইয়া থাকে, কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে, বিড়বিড় করিয়া নিজেই অদৃষ্ট-দেবতাকে শাপে আর প্রতি রাত্রে শ্রান্ত স্বামীর সঙ্গে কলহ করে।

বলে, তুমি? তুমি ছাইয়ের ডাক্তার, কচুর ডাক্তার।

তুমি নির্লজ্জ। স্ত্রী যার এক বছরের বেশি বিছানায় পড়ে, কোন লজ্জায় সে পরের চিকিৎসা করতে যায় শুনি!

উপসংহারটা করুণ![৮৭]

খ. তা অক্ষয় এমনই বটে — নির্বিকার, নিস্পৃহ। কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গৃহে শয্যাগত স্ত্রীর আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন বোঝা, বাহিরে কেবল রুগ্ণ ও আহত মানুষের সাহচর্য এবং মরণের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার ক্ষুব্ধ স্তিমিত বিষাদ — সবই যেন তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ। সুপ্রাপ্য বলিয়াই বেদনা যেন মূল্য হারাইয়াছে।

দিনটা এক প্রকার বাহিরেই কাটে।[৮৮]

গ. নাওয়া-খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য দুঘণ্টার বেশিসময় অক্ষয় পায় না। বাহিরে রোগী ডাকাডাকি করে, টেলিফোনের যন্ত্রটা বারবার শব্দিত হইয়া উঠে, তিনটা না বাজিতেই আবার সে বাহির হইয়া যায়। ফেরে রাত্রি আটটা-নটায়।

তখনো কিন্তু সে নিজেকে বিশ্রামের অবকাশ দেয় না। পড়ার ঘরে বসিয়া মোটা মোটা ডাক্তারি বই পড়িতে আরম্ভ করে। সুমতির মনে হয়, শোবার ঘরে ঢুকিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছার কাছে তাহার শ্রান্তি হার মানিয়েছে।[৮৯]

---

৮৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, *হলুদ পোড়া*, মানিক রচনাবলি, (৪র্থ খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫০৬

৮৮. ঐ, পৃ. ৫০৭

৮৯. ঐ, পৃ. ৫০৭

ঘ. অলকা এদিকে নিত্যকার কলহ ও কান্নার জন্য থাকে ব্যাকুল হইয়া, বেচারির জীবনে এখন এইটুকুই বৈচিত্র্য; অক্ষয় ফিরিয়াছে টের পাইলেই এমন কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেয় যে ও ঘরে উঠিয়া না গিয়া অক্ষয়ের আর উপায় থাকে না।

অলকা বলে, ও ঘরে এত কী মধু? এ ঘরে বসে পড়ো। ... দেখো গো, গালে আমার একটা ব্রণ উঠেছে। বড়ো ব্যথা।

চটচটে ঘামে ভেজা অলকার গাল — কে যেন আঠা মাখাইয়া রাখিয়াছে। অক্ষয় আদর করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুই গালে একটি ব্রণও সে খুঁজিয়া পায় না, সস্নেহে বলে, ইস, বড্ড ঘেমেছ যে!

জীবন্ত পত্নীর শবের মতো শীতল ক্লেদাক্ত স্পর্শ আঙুল বাহিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের মনে ধাক্কা দেয় কিনা কে জানে! বোধ হয় দেয় না। শব ঘাঁটা অক্ষয়ের বহুদিনের অভ্যাস।[৯০]

ঙ. অলকা সহসা ক্ষেপিয়া যায়।

বকে মরছি, শুনছ না যে? কেনইবা শুনবে, আমি মরলেই যে তোমার হাড়ে বাতাস লাগে।

অক্ষয় মুখ তুলিয়া নিদ্রাতুর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বলে, আহা অলক, এমন করে রাগ কোরো না, কিছু না জেনেশুনে। তোমার কথা শুনছি বৈকি, শুনছি।

ছাই শুনছ! পড়া তোমার পালাবে না গো, আমি কিন্তু পালাব। আমি চিতায় উঠি তারপরই না হয় ওসব ছাইপাঁশ পোড়ো? কদিন বাকি আর!

অক্ষয় শান্তকণ্ঠে বলে, দেখ দিকি তুমি কী সব বলছ! এসব বই ছাইপাঁশ মোটেই নয় অলক, সব তোমার অসুখের বই। তোমায় সারিয়ে তুলতে হবে না?[৯১]

---

৯০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৭

৯১. ঐ, পৃ. ৫০৮

অক্ষয়-অলকার এই বীভৎস দাম্পত্যজীবন সুমতির ভালো লাগে না। নন্দের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অথচ শান্ত জীবন তাকে আকৃষ্ট করে। প্রতীকী পরিচর্যায় মানিক সুমতির মনোবিশেষণ করেন :

> কিন্তু সুমতি ঘুমায় না। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া খোলা বারান্দায় দাঁড়ায়। দেখিতে পায়, নিচে অন্ধকার উঠানে নন্দর ঘরের জানালা দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে।
>
> সুমতির ইচ্ছা হয় ওই আলোয় কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ওই আলোর দিকে চাহিয়া না থাকিয়া ওই আলোয় দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেখে।[৯২]

নন্দের প্রতি সুমতির আকর্ষণ তাই দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। খুব ভোরে সে যখন সকলের ঘুমের আড়ালে খাবার ও পানি পৌঁছে দেওয়ার জন্য নন্দের ঘরে ঢোকে, তখন সে এই কর্তব্য পালনের ভেতর 'গোপন অভিসারের আমেজ' অনুভব করে। সুমতির এই অনুভব একেবারে দ্বন্দ্বহীন নয়। তার মনে হয়, বজ্রের মতো কঠোর ফুলের মতো কোমল ছেলেমানুষি স্বভাবের প্রবল আবেগপ্রবণ, অভিমানী লোকটির মধ্যে প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি অনুরাগিণী নারীমাত্রেরই সাধারণ অনুভব — এতে নন্দর প্রতি তার প্রচ্ছন্ন ভালোবাসারই প্রমাণ। মাত্র ষাট টাকা যার বেতন, সেই নন্দকেই মাসে পঞ্চাশ টাকা তার ভগ্নিপতি কেদার মুখুজ্যেকে মানিঅর্ডার করে পাঠাতে হয়। নন্দর মদ্যপ পিতা তার কন্যা সীতাকে নিজ নেশার বন্ধু কেদার মুখুজ্যের নিকট অর্পণ করায় ভুলের যে বীজ রোপিত হয়, তার প্রায়শ্চিত্তই নন্দ ও সীতার জীবনকে করে বিষাদময়, সুস্থ বিকাশের অনুপযোগী। মদ্যপ ও বৃদ্ধ স্বামীর যন্ত্রণাকর সংসর্গ থেকে বোনকে মুক্ত রাখার প্রক্রিয়ায় নন্দকে তার মাসিক বেতনের প্রায় পুরো অর্থই ব্যয় করতে হয়। এক সাহেবের প্রকাণ্ড ওষুধের দোকানে একশো দশ টাকা বেতনের চাকরির প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে কেবল সুমতির জন্য। সেখানে চাকরি করতে গেলে তিন বেলা সুমতির সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না, তাই। নন্দর ছেলেমানুষি ও অকপটতা সুমতির যেমন ভালো লাগে, তেমনি তার

---

৯২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮

অনভিজাত্য, অসংযমী কথা, হ্যাংলামি সুমতির কাছে অস্বস্তিকর ঠেকে। সুমতি ও নন্দর সম্পর্কের মধ্যে দোদুল্যমানতা তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অলকার মৃত্যুর পর অক্ষয় নতুন ভাবে সুমতিকে আবিষ্কার করে। সুমতির প্রতি তার লিবিডোতাড়িত আচরণ তার কর্মকাণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। এমনি একদিনের ঘটনা :

> অলকা যে বাঁচিল না, মরিয়াও স্বামীর দুফোঁটা চোখের জলের তর্পণ পাইল না, এ জন্য স্বয়ং ভগবানও হয়ত একদিন সুমতিরই বিচার করিবেন।
>
> এমনি সব কটু চিন্তায় সুমতি ব্যাপৃত ছিল, ও ঘর হইতে অক্ষয় তাহাকে আহ্বান করিল। অনুযোগ করিয়া বলিল, একা একা দুপুরটা যে কাটে না সুমতি!
>
> সুমতি মৃদুস্বরে বলিল, খোকাকে রেখে যাব?
>
> খোকার সঙ্গে একতরফা আলাপ করব কতক্ষণ? তাছাড়া দুপুরবেলা আর রাত্রিটা তোমার কোল দখল করে থাকা ওর অভ্যাস, আমার কাছে কাঁদবে।
>
> সুমতি নতমুখে বলিল, কিন্তু দুপুরে একটু না শুয়ে যে আমি পারব না। কাল একাদশী করেছি।
>
> অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া বলিল ও, আচ্ছা, তবে তুমি যাও সুমতি, শোবে যাও। কাল তোমার একাদশী গেছে জানতাম না। তুমি বুঝি নির্জলা একাদশী কর?[৯৩]

এদিকে সুমতির প্রণয় আকাঙ্ক্ষায় নন্দ ব্যাকুল, উন্মনা হয়ে ওঠে। তার খাপছাড়া কর্মকাণ্ডের মধ্যে কেবল তার ছেলেমানুষিই প্রকাশ পায় না, ক্ষেত্র বিশেষে তা সংযম ও সম্ভ্রমের সীমা ছাড়িয়া যায়। এমনি একদিনের ঘটনা :

---

৯৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৫

চলে যাও যে? আমায় ঘুম পাড়িয়ে যাও। আমার আনন্দে বৈচিত্র্য দিয়ে যাও ভালো চাও তো, নইলে রাতারাতি হার্টফেল করব।

সুমতি উদ্ধতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যে জবাব সে দিতে চাহিয়াছিল নন্দর মুখ দেখিয়া তাহা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শান্তকণ্ঠেই বলিল, কী করতে হবে বলুন।

নন্দ আঙুল বাড়াইয়া বিছানাটা দেখাইয়া বলিল, বালিশ সরিয়ে বিছানায় বোসো, তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি শোব। ব্যাস, আর কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেয়ো।[৯৪]

অবদমিত লিবিডোতাড়নায় চিরদিনের সংযমী অক্ষয়ও একদিন অসংযতভাবেই সুমতির কাছে প্রণয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে যাতে প্রচ্ছন্ন ছিলো নন্দর প্রতি ঈর্ষা। লেখকের বর্ণনা :

উপরে উঠিয়া বারান্দায় পা দিতেই অক্ষয় খপ করিয়া সুমতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

তুমি নন্দর ঘরে ছিলে?

দুর্বিনীত প্রশ্ন। সুমতি মৃদুস্বরে বলিল, ছিলাম।

কেন ছিলে?

নন্দবাবুর ভগ্নীপতি মারা গেছে খবর এসেছে, খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই —

অক্ষয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল, কিছু মনে কোরো না সুমতি।

সুমতি অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

অক্ষয় কৈফিয়ত দিল : মনটা ভালো নেই সুমতি। খোকা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল আর তুমি ওদিকে গল্পে মেতে আছ ভেবে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল।

---

৯৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭-১৮

সুমতি বলিল, খোকা কেঁদেছিল? কই শুনিনি তো।

কেঁদেছিল বৈকি। আমি কি তোমায় মিথ্যে বলছি সুমতি?[৯৫]

অক্ষয়ের চেয়ে নন্দকে সুমতির পছন্দ করার যুক্তির মধ্যে একজন সমালোচক মানিকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সমালোচকের নিরীক্ষণ :

> স্ত্রী বিয়োগজনিত অক্ষয়ের শূন্যতায় সমব্যথী হওয়ার পরিবর্তে দুর্দশাগ্রস্ত বোনের জন্য নন্দের দুঃখের প্রতিই সুমতির সহমর্মিতা তাই অধিক প্রবল। অক্ষয়ের অর্থ প্রতিপত্তি ও রুচিশীলতার পরিবর্তে নন্দের দারিদ্র্য ও দুঃখকেই যে সুমতি প্রণয়াবেগে বরণ করে, তা মানিকের বিশেষ জীবনদৃষ্টিরও ফল। বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি একপ্রকার স্বভাবসুলভ মমতা ও পক্ষপাত মানিকের সমগ্র সাহিত্য জুড়ে যে বিদ্যমান, সুমতির এমন আচরণের ব্যাখ্যা তার মধ্যেও অনেকটা নিহিত।[৯৬]

সঙ্গত কারণেই সুমতি নন্দকে ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী হিসেবে মনোনীত করে। গল্পের শেষ পর্যায়ে ঈর্ষাবশত সামান্য অছিলায় অক্ষয় যখন নন্দকে চাকরিচ্যুত ও আশ্রয়হীন করে, এবং সুমতিও অক্ষয়ের গৃহত্যাগ করে নন্দের সহযাত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন পাঠক অনুভব করে 'ধাক্কা' গল্পের প্রবল ধাক্কাটা । লেখকের কাহিনীবয়ন :

> সুমতি মৃদুস্বরে বলিল, না, বিদায় নিতে আসিনি। আপনার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। সকালে লজ্জা করবে, এখনই বেরিয়ে পড়ি চলুন।
>
> রাতদুপুরে তাহার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে নন্দর চমক লাগার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্তে তাহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।
>
> সে হয় না সুমতি।

---

৯৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৮

৯৬. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

সুমতি বিহ্বলের মতো বলিল, হয় না?

নন্দ মাথা নাড়িল, না। এত বড়ো অনুচিত কাজে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। কী জানো, আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাছাড়া, আমার সময় নেই।

ভয় পাইয়াছে! সময় নাই! সুমতি আগাইয়া গিয়া নন্দর চৌকিতে বসিয়া পড়িল। সম্বৎসর সাধনা করিয়া নন্দর আজ সিদ্ধিলাভের সময় নাই।[৯৭]

নন্দ কেন হঠাৎ করে সুমতিকে প্রত্যাখ্যান করে সে প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হকের অভিমত :

নন্দের প্রত্যাখ্যানে কোনো বিরাগ নেই, আছে অক্ষমতা, আছে প্রাপ্তির আনন্দ অপেক্ষা হারানোর দুঃখের আধিক্য। সুমতিকে পেলে নন্দের জীবন ধন্য হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু সীতা-অপহরণের আঘাতে নন্দের হৃদয় এমন সুতীব্র দুঃখ ও শূন্যতার হাহাকারে আচ্ছন্ন যে, জীবনের সর্ববৃহৎ প্রাপ্তির আনন্দও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। সুমতিকে প্রত্যাখ্যান তাই কোনো সুচিন্তার ফল নয়; সহজ আনন্দহীন আবেগেরই পরিণতি।[৯৮]

কেবল অক্ষয়, নন্দ ও সুমতিই নয় নন্দর ছোট বোন সীতাও একান্তভাবেই ফ্রয়েডীয় চরিত্র। বৃদ্ধস্বামীর অপমৃত্যুর পর দীর্ঘ দিনের গোপন প্রেমিকের সঙ্গে সীতার নিরুদ্দেশ যাত্রা তার লিবিডোতাড়নারই প্রকাশ। গল্পের অভ্যন্তর সেই সাক্ষ্যই দেয় :

ছেলেমানুষ তো, তোমার চেয়ে অনেক ছোটো — ভালোমন্দ বোঝে না। ছেলেটাকেও আমি চিনি সুমতি, কচি মেয়ে ভোলাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কতকাল ধরে সীতার মন ভাঙছিল কে জানে।[৯৯]

---

৯৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২০

৯৮. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৩

৯৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাক্কা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিব বলেছেন :

> ডাক্তার অক্ষয় সুমতির প্রতি নন্দর প্রণয়বোধে ঈর্ষাক্রান্ত হয়ে নন্দকে চাকুরিচ্যুত করলে সুমতিও অক্ষয়ের চাকুরিকে প্রত্যাখ্যান করে। এতে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অক্ষয়ের চেয়ে নন্দর প্রতিই সুমতির পক্ষপাত লক্ষ করি।[১০০]

'আজ কাল পরশুর গল্প' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'যাকে ঘুস দিতে হয়' গল্পেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ গল্পের স্বামী-স্ত্রী মাখন ও সুশীলা একান্তভাবেই Id তাড়িত, Ego চালিত এবং ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, পৌঢ় ব্যভিচারী দাস সাহেব প্রবলভাবে লিবিডোতাড়িত মানুষ। অর্থাধিক্যে এবং অর্থের প্রতি প্রবল বাসনায় মানুষ যে পশুর চেয়েও কদর্য স্তরে নামতে পারে, এ গল্পটি তারই পরিচয় বহন করে।

মাখন ছিল দরিদ্রের সন্তান। একশো টাকা মাসিক বেতনে সে চাকরি করত। তার স্ত্রী সুশীলার সচ্ছল জীবনাকাঙ্ক্ষা মাখনকে ব্যবসামনস্ক করে। যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারি, গুপ্তব্যবসার যখন প্রবল বিস্তার, তখন জনৈক দাস সাহেবকে ঘুষ দিয়ে মাখন সরকারি ঠিকাদারি লাভ করে। ঠিকাদারি করে যুদ্ধের বাজারে মাত্র তিন বছরের মধ্যে মাখন লক্ষাধিক টাকার মালিক হয়ে বসে। আমরা আগেই বলেছি মাখন ও সুশীলা একান্তভাবেই Id তাড়িত, Ego চালিত চরিত্র। তাই লাখপতি হওয়ার পরেও তাদের টাকার নেশা কাটে না। সীমাহীন প্রলোভনে তাদের জীবন হয়ে ওঠে সদা অস্থির ও চঞ্চল। হিতাহিত জ্ঞান তাদের আগেই লোপ পেয়েছিল। অসৎ পথে অতিদ্রুত আরো ধনী হওয়ার লোভে ও নেশায় তারা বিভোর। টাকার জন্য প্রয়োজনে করতে পারে না এমন কোনো কাজ তাদের বিবেচনায় নেই।

---

১০০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

নারীলোলুপ প্রৌঢ় দাস সাহেবের চোখ পড়ে যৌবনবতী, সুন্দরী সুশীলার দিকে। পাশাপাশি গাড়িতে বসে লিবিডোতাড়নায় অস্থির হয়ে ওঠেন দাস সাহেব। সুশীলা দাস সাহেবের প্রবৃত্তিতাড়নার এই চিত্রটি আগেও দেখেছে — এই স্মৃতি রোমন্থন করেও সুশীলা থাকে স্থির, অচঞ্চল। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

ক. দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলাফিরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাস সাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামি মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল।[১০১]

খ. সুশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। যে রকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে। ওঁর কাছে আমাকে নেহাত কচিই দেখায়।[১০২]

দাস সাহেবের মন-মেজাজ-রুচিবোধ যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত মূল্যবোধ দ্বারা শাসিত। মাখনের স্ত্রী সুশীলার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় থাকা সত্ত্বেও মাখনের কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাসার কারণ সম্পর্কে দাস সাহেবের জীবনোপলব্ধি ও জীবনোভিজ্ঞতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন স্কেচের মতো করে :

আপনার স্ত্রী?

আজ্ঞে।

---

১০১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে ঘুষ দিতে হয়, *আজ কাল পরশুর গল্প*, মানিক রচনাবলি, (৫ম খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩১১

১০২. ঐ, পৃ. ৩১১

> দাস সাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে — বাড়ির স্ত্রী বাড়িতেই থাকে।[১০৩]

লিবিডোতাড়নায় অস্থির দাস সাহেব চলতি পথেই নিজের গাড়ি থেকে নেমে মাখনের গাড়িতে ওঠেন, সুশীলার সান্নিধ্যই তার কাম্য। মাখনের অস্বস্তি হয় কিন্তু সে বাধা দিতে পারে না। Super Ego-র নৈতিক উৎকণ্ঠায় এ পর্যায়ে মাখন বিপন্নবোধ করে :

> আপনার স্ত্রী সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেননি?
>
> এই যে দিচ্ছি। শুনছ, ইনি আমাদের মি. দাস।
>
> পরনের বেনারসির রঙের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো! বউয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাস সাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ শুরু হয়েছিল মাখনের মনে অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ি চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না — অন্তত যাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বারবার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতেও পারত না।[১০৪]

গাড়িতে উঠে দাস সাহেব যখন তার বাসায় চা পানে আমন্ত্রণের সঙ্গে সোয়া লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্টের কথা ওঠান এবং বিশেষ করে জানান যে এ উপলক্ষ্যেই তিনি মাখনকে খুঁজছিলেন — তখন লোভে মাখনের দু চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, সুশীলার নিশ্বাস আটকে যায়। এ পর্যায়ে মাখন

---

১০৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে ঘুষ দিতে হয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১

১০৪. ঐ, পৃ. ৩১১

ও সুশীলা আবার Id তাড়িত হয়ে পড়ে। তাই একটু আগেও গাড়িতে উঠে বসতে দেখে দাস সাহেবের প্রতি তার যে বিরাগ ছিলো, মুহূর্তেই তা অন্তর্হিত হয়। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মানিক এভাবে :

> দাস বলে, চা খেয়েছেন?
>
> সুশীলা বলে, না।
>
> আসুন না আমার ওখানে, চা-টা খাওয়া যাবে।
>
> মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, সেই কন্ট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।
>
> মাখনের দু চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিশ্বাস আটকে যায়। আজ কদিন ধরে মাখন এই কন্ট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল — প্রকাণ্ড কন্ট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে। দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘনঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের দহরম মহরম দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা এক রকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায়! এই দরকারে তাকে দাস খুঁজছিল।[১০৫]

চা খাওয়ার এক পর্যায়ে দাস সাহেব সুশীলার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফন্দি আঁটেন। মাখনকে তিনি কাগজপত্র নিয়ে তখনি হাওয়ার্ড সাহেবের সাথে কথা বলার জন্য এবং কাগজপত্রে তার দুটো সই নিয়ে আসার জন্যে বলেন এবং এই অবসরে সুশীলার সঙ্গে 'গল্প' করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, যা মূলত তার এক ধরনের অছিলা। মাখনের অনুপস্থিতিতে সুশীলাকে ভোগ

---

১০৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে ঘুষ দিতে হয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১-৩১২

করাই লিবিডোতাড়িত দাস সাহেবের মনোগত অভিপ্রায়। এ পর্যায়ে সুশীলা ও মাখনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন লেখক এভাবে :

> সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরই মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে — অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ।[১০৬]

ঘটনার এ পর্যায়ে মাখন ও সুশীলার Super Ego স্বল্প সময়ের জন্য নিম্নচাপ দিলেও শেষ পর্যন্ত তাদের Ego চালিত অর্থলোভ তথা বিষয়বুদ্ধিই জয় লাভ করে। স্ত্রীর সম্ভ্রমহানির কথা বুঝতে পেরেও মাখন দাস সাহেবের প্রস্তাবে সায় দেয়। সুশীলাও সব বুঝতে পারে। তবু সে কোনো রূপ অনীহা প্রকাশ করে না। এ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সুচতুর Ego-র নির্দেশনা মেনে নিয়ে 'যেন কিছুই হয় নি', 'এটা কিছুই নয়' ভাব দেখিয়ে কৃত্রিমভাবে ভঙ্গিসর্বস্ব কথা বলে :

> তারপর মাখন বলে, তুমি চা-টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।
>
> সুশীলা ঢোক গিলে বলে, দেরি কোরো না।
>
> না, যাব আর আসব।
>
> গাড়ি রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে জোরসে চালাও! জোরসে![১০৭]

সুশীলার ঢোক গেলা এবং মাখনের জোরে গাড়ি চালানোর নির্দেশ তাদের মানসিক বিচলনতার বহিঃপ্রকাশ। Ego চালিত হয়ে তারা দুজন যে দুটি কাজ করতে যাচ্ছে, তাতে তাদের Super ego-র সমর্থন নেই। তাই সুশীলা ঢোক গেলে এবং মাখন ড্রাইভারকে জোরে গাড়ি চালাতে বলে। Ego চালিত মানুষের মনেও কখনো কখনো Super Ego-র চাপ আসে বৈকি। বলা বাহুল্য যে,

---

১০৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে ঘুষ দিতে হয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২

১০৭. ঐ, পৃ. ৩১২

মাখন-সুশীলা টাইপের মানুষের জীবনে Super Ego র এই নিম্নচাপ নিতান্ত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী।

এ গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু মন্তব্য বিবেচনাযোগ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন :

> যুদ্ধকালীন লোভবিকৃত মধ্যবিত্ত এবং দাস সাহেব শ্রেণীর উচ্চচর চরিত্রের exposition এ গল্পটি বীভৎস বাস্তবতার ফটোগ্রাফিক নিদর্শন। মাখনের মানসিক অধঃপতনের মধ্যেই গল্পের আসল ট্রাজেডী সন্নিহিত।[১০৮]

ভূদেব চৌধুরীর উত্থাপিত প্রশ্নটি নির্মম বাস্তবতার দিকেই ঈঙ্গিত দান করে :

> ... গ্লানিকর শিরোনাম ও অন্তিম বাক্যটি — দুয়ে মিলে মাঝের অকুণ্ঠিত সহজ সাধারণ তথ্যবর্ণনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে জন্তু - গ্রাস-কবলিত মানুষের নিরুপায় আত্মহননের ছবিটিকে প্রতীকী অবয়বেই মূর্ত করে কী তোলে না?[১০৯]

সরোজমোহন মিত্র লক্ষ করেছেন :

> 'যাকে ঘুস দিতে হয়' গল্পের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ ধনিকসমাজের ব্যভিচারী রূপ এক শ্বাপদমূর্তি লাভ করেছে। ধনী হওয়ার বাসনা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। সেখানে ন্যায়নীতি, ভদ্রতা, শালীনতা, চক্ষুলজ্জা কিছুই থাকে না। ... মানিক নির্মমভাবে ঘুষের জগতের একটি বাস্তব ছবি অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন।[১১০]

---

১০৮. *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

১০৯. *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৭৮

১১০. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৮৯, পৃ. ১৫৯

গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্যও প্রাসঙ্গিক :

> 'যাকে ঘুস দিতে হয়' গল্পে নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাখনের ধনী হওয়ার নেপথ্য কাহিনীতে আছে এক চরম নীতিভ্রষ্ট কদর্য সামাজিক পরিবেশ। এই সমাজ পরিবেশে দ্রুত সম্পদ লাভের জন্য গোপনে চরম মূল্য দিতে হয় মানুষকে তা কেবল আর্থিক উৎকোচ নয়, নিজের স্ত্রীকে সমর্পণ করতে হয় দাস সাহেবের মতো লালসাগ্রস্ত ব্যভিচারী মানুষের হাতে।[১১১]

রহমান হাবিব বলেছেন :

> বিত্তশালী মি. দাস মানুষকে অর্থের মোহে ফেলে নিজে নারী সম্ভোগের সুখে নিমজ্জিত হয়। অর্থগৃধ্নুতার প্ররোচনায় মানব ও মানবী সম্পর্ক যে কত অবক্ষরিত পঙ্কিলতায় পর্যবসিত হতে পারে – মানব সম্পর্কের সে নেতিবাচকতাই এই গল্পে রূপ লাভ করেছে।[১১২]

'আজ কাল পরশুর গল্প' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'নেড়ী' গল্পে যদিও দুর্ভিক্ষের নির্মম বাস্তবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তবু এ গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ফ্রয়েডের মতে, মানবমনে জীবনমুখী এক প্রবল শক্তি রয়েছে, যার নাম তিনি দিয়েছেন এরস্- (Eros)। মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (self preservation) তার প্রধান অনুপ্রেরণা। যে কোনো মূল্যে, যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ যে প্রথম নিজে বেঁচে থাকার কথা ভাবে, তা এরস্-এরই প্রকাশ।[১১৩] প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে এরস্ এর তাগিদেই মানুষের নীতিধর্ম, মূল্যবোধ, বিপর্যস্ত হয়ে যায়; মানুষের হৃদয়বৃত্তি, তার আবেগ অনুভূতি হয়ে যায় ভোঁতা ও নির্জীব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেড়ী' গল্পে

---

১১১. গোপিকানাথ রায়চেথধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৫

১১২. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১১৩. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত. পৃ. ১৫

রয়েছে মূল্যবোধের এমনই মমতাহীন বিপর্যয়ের নির্মম চিত্র। সবার আগে নিজ জীবন রক্ষার তাগিদটি মানুষের কাছে কী রকম প্রবল হয়ে উঠতে পারে, এ গল্পে তা-ই দেখানো হয়েছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ। পেটের জ্বালায় যখন বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি কাঁদতে থাকে, তখন গগন মাইতির স্ত্রী তারা হয় তাদের থাপড়ে দেয় নয় নির্বিকার বসে থাকে। তার মাথার চুলে উকুন যে বংশ বিস্তার করেছে তাদের জ্বালাতেই সে অস্থির — ছেলেমেয়ের ক্ষুধাজনিত কান্না দূরে থাক, জগতের কোনো কিছুই তখন তার কাছে মুখ্য নয়। বাস্তবতার এই নির্মম চিত্রটি মানিক অঙ্কন করেছেন শৈল্পিক নিরাসক্তিতে :

> নড়নচড়ন বন্ধ করে নিথর হয়ে বসে থাকে। তারপর আবার হাত উঠে যায় মাথায়, জট ছাড়াতে, চুলকোতে আর উকুন মারতে। চুলের অরণ্য থেকে উকুন খুঁজে এনে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে পুট করে মারবার মুহূর্তটিতে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় তারার কাছে। শরীর বেশ খানিকটা শুকিয়েছে, নোলায় জল কম। তবু জিভে দিব্যি আওয়াজ হয় উস্‌স্ — উকুন মারার পুট শব্দের সঙ্গে।[১১৪]

এমন সময় পাঁচনিখে থেকে তারার আঠারো বছর বয়সী মেয়ে মনা বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। মনার ছেলেটি হারিয়ে গেছে, কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে মনা ধুঁকতে ধুঁকতে আসে। জানা গেল তার স্বামী মরবার পর তাকে ফেলে তার শাশুড়ি অন্য ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। শাশুড়ির এই পালিয়ে গিয়ে দায় এড়ানো এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে মনার পিতৃগৃহে আগমন সবই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত। বিধবা মেয়ের আগমন উপলক্ষ্যে তারার মরা কান্নাটা তাই জমজমাট হয়ে ওঠে। বাস্তববাদী লেখক মানিক আমাদের জানাতে ভোলেন না যে, তার এই জমজমাট মরাকান্না জমজমাট হলো উকুনে পরিপূর্ণ তার চুলের জন্য — কন্যাশোকে নয়। শোকার্ত হওয়ার ক্ষমতা তার ছিলো না, অনুভূতিও হয়ে উঠেছিল ভোঁতা :

---

১১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নেড়ী, *আজ কাল পরশুর গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

> প্রথম মরা কান্নাটা কিন্তু তার বড়োই জমজমাট হল এই চুলের জন্য। পাঁচনিখে থেকে মেয়ে মনা এল বিধবা হয়ে, ছেলে হারিয়ে কচি মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে। তার স্বামী মরবার পর শাশুড়ি আর এক ছেলেকে নিয়ে তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তারা চুল ছিঁড়তে লাগল এলোপাতাড়ি চুলেরই যন্ত্রণায়, কিন্তু তার শোকের প্রচণ্ডতা দেখে সবাই হয়ে গেল হতভম্ব। এমন শোকার্ত হবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল খানিকটা, দেহে শক্তিও ছিল না অতখানি।[১১৫]

তারার কোলের ছেলেটিও ছোট। মনা তার মেয়েটাকে মার কোলে তুলে দিয়ে তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে বলে। না খেতে পেয়ে পেয়ে মনার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। তারারও একই দশা। তাই সে চালের হাঁড়ি ঝেড়ে একটু ধুলো মেশানো গুঁড়ো বের করে তাই ফুটিয়ে খাইয়ে দেয় নাতনিকে। তিনদিন পরে তারার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মারা যায়। মৃত ছেলেমেয়েদের জন্য তারার কান্নাটা হয় অনেক নিস্তেজ। লেখকের ভাষায় :

> তিনদিন পরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের জন্য তাদের কান্নাটা হয় অনেক নিস্তেজ। ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছিল। ওষুধের অভাবে যে তারা মরল ঠিক তা নয়, আসলে মরল খেতে না পেয়ে রোগটাকে উপলক্ষ করে। থেমে থেমে তারা সুর করে কাঁদল সারাদিন।[১১৬]

অতঃপর কাঠের স্বল্পতার জন্য ভাইবোন দুটিকে আধপোড়া অবস্থায় খালের পানিতে ভূতোর ভাসিয়ে দেয়া, ফেরার পথে হৃদয় পণ্ডিতের ছাগল ছানা গলা টিপে মেরে অতঃপর গামছায় জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা, বিনা তেলে বিনা মশলায় কেবল লবণ আর হলুদ দিয়ে মনার সেই ছাগল ছানার মাংসরন্ধন, বিধবাদের রীতি-নীতির কথা ভুলে গিয়ে মনার সেই মাংস খানিকটা ভক্ষণ এবং

---

১১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নেড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭

১১৬. ঐ, পৃ. ৩১৮

তাই নিয়ে ভাই ভূতোর সঙ্গে তার হাতাহাতি-কামড়াকামড়ি সবই যেমন দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত জনপদের বহির্বাস্তবতা নির্মাণ করেছে, তেমনি সেগুলো মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম তথা মমতাশূন্য, নীতিবিবর্জিত কর্মকাণ্ডেরই নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বেঁচে থাকার সংগ্রাম মানুষকে কীভাবে বদলে দেয়, 'নেড়ী' গল্পে হৃদয় পণ্ডিত তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। হৃদয় পণ্ডিত আগে ছিলো স্কুল মাস্টার। স্কুল উঠে যাওয়ায় সে এখন গ্রামের ধনাঢ্য জোতদার পূর্ণ ঘোষালের বাড়িতে নিযুক্ত হিসাবরক্ষক। স্কুল মাস্টার হৃদয়ের সহসা পরিবর্তনের চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক দারিদ্র্যের তথাকথিত মহান আদর্শের অন্তঃসারশূন্যতাই তুলে ধরেছেন :

> স্বামী মরল কবে? ছমাস পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে থেকে হৃদয় পণ্ডিতের চেহারা, তাকানি, কথার ভঙ্গি সব অদ্ভুত রকম বদলে গেছে; স্কুলটা না উঠে গেলে কী হত বলা যায় না। চিরকাল যে মহান দারিদ্র্যের আদর্শের শোষণে থেঁতো এবং ভোঁতা হয়ে নির্বিরোধ ভালো মানুষ সেজে ছিল, তাই হয়ত সে থাকত শেষ পর্যন্ত। পূর্ণ ঘোষালের সঙ্গে মিশে ঝড়তি পড়তি উপায়ে টাকা কুড়োতে শিখে হঠাৎ সে মানুষ হয়ে উঠল 'ভালো'টুকুর খোলস ছেড়ে।[১১৭]

বস্তুত হৃদয় পণ্ডিতের এই পরিবর্তন তার অন্তরশায়িত এরস্ এরই বিচিত্র প্রকাশ।

কূটকৌশলী হৃদয় পণ্ডিত পরামর্শ দেওয়ার অছিলায় গগন মাইতিকে ভিটে বন্ধক রেখে ছেলে ভূতোকে নিয়ে সদরে রোজগার করতে যাওয়ার কুপরামর্শ দেয়। গগন মাইতি এবং তার ছেলে ভূতোকে রোজগেরে করে তোলা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের শেষ সম্বল ভিটেখানা হাতিয়ে নেওয়াই হৃদয় পণ্ডিতের মূল অভিপ্রায়।

---

১১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নেড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

এ গল্পে নির্মেদ বয়ানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর ফুটিয়ে তুলেছেন দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত জনপদের বহির্বাস্তবতা এবং বেঁচে থাকার অদম্য প্রেরণায় মানুষের নির্মমতার বাস্তবসম্মত টুকরো টুকরো কিছু ছবি :

ক. দিনভর পরামর্শ চলল। ভিটে বেচবে না বাঁধা দেবে, গগন আর ভূতো দুই জনেই যাবে না একজন যাবে, অথবা বাড়িসুদ্ধ যাবে সকলেই। এবং গেলে কোথায় যাবে।

উকুনের কামড় তারা আর তেমন অনুভব করে না, বোধশক্তি আরো ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় কোনো পরামর্শই সে দিতে পারে না।[১১৮]

খ. ভূতোকে আর দেখতে পাওয়া যায় না পরদিন। হৃদয় পণ্ডিতের কাছে পথের সন্ধান পেয়ে সে একাই সরে পড়েছে।

গগন বলে, একা তোমাদের নিয়ে যাই কোথা? নিজে গিয়ে দেখি যদি কিছু হয়।

বাড়ি বাঁধা রেখে পনেরো বিশদিনের খোরাক দিয়ে গগন চলে যায়। ফিরে না আসুক পনেরো বিশদিনের মধ্যে খবর একটা পাঠাবে আর রোজগারের কিছু অংশ।[১১৯]

গ. খোরাক ফুরিয়ে যায়। সময় কাটে একটা মাস। গগনের কোনো সংবাদ মেলে না। শোক দুঃখ ও দৈহিক যন্ত্রণাবোধ আবার ঝিমিয়ে আসে দুজনের। মনার মেয়েটা মরে যায় দুধের অভাবে কাঁড়া-চাল খাওয়া পেটের অসুখে। তারার কোলের ছেলেটাও মরে একই ভাবে। তারপর একে একে, এবেলা একজন আর ওবেলা একজন করে, আরো একটা ছেলে ও মেয়ে মারা যায় তারার। থাকে দুটি — মরো-মরো অবস্থায়। দশটির মধ্যে

---

১১৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নেড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

১১৯. ঐ, পৃ. ৩১৯

> তারার চারটি সন্তান মরেছিল — এ দেশে ও রকম মরতে হয় খুব স্বাভাবিক নিয়মে — আর চারটি মরে দুর্ভিক্ষে।[১২০]

একদা শিক্ষক হৃদয় পণ্ডিত গল্পের এ পর্যায়ে মেয়ে মানুষের দালালে অবতীর্ণ হয়। সুখে থাকার, মাছ দুধ খাওয়ার, শাড়ি গয়নার প্রলোভন দিয়ে মনাকে সুকৌশলে মায়ের কাছ থেকে পৃথক করে নারী ব্যবসায়ীদের কাছে সে বিক্রি করে দেয়। মাকে ত্যাগ করে এমন ভাগ্যান্বেষণে যেতে মেয়ের মধ্যেও কোনরূপ আপত্তি দেখা যায় না। মেয়ের খোঁজে হৃদয় পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে তারই দাওয়ায় অবশিষ্ট সন্তানদ্বয়কে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রেখে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় তারা। গল্পশেষে উন্মাদগ্রস্ত তারাকে আমরা আবিষ্কার করি হাসপাতালে।

এ গল্পে ভূতোর অন্তর্ধান, রোজগারের আশায় গগনের গৃহত্যাগ, হৃদয়ের ভিটে দখলের লালসা, নারী ব্যবসায়ীদের কাছে মনাকে বিক্রি করে দেয়া, মনার পতিতাবৃত্তি এবং মরণাপন্ন দুই ছেলেকে ফেলে রেখে তারার নিরুদ্দেশ যাত্রা — সবই মূলত তাদের নিজ নিজ জীবনসংগ্রামের প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। দুর্ভিক্ষের সময় নিজ নিজ জীবন রক্ষার আদিম তাগিদে — Self-preservation এর তাগিদেই তারা সবাই এসব নির্মম-নীতিহীন-স্বার্থপর কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হয়েছে। সৈয়দ আজিজুল হকের মূল্যায়ন :

> অস্তিত্বের সংকট কিভাবে আপনজনকে পরস্পরের কাছ থেকে নির্মমভাবে বিচ্ছিন্ন করে — সমগ্র সংসারকে বুভুক্ষু ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে চলে যায় উপার্জনক্ষম পিতাপুত্র, বিধবা পুত্রবধূকে রেখে চলে যায় শাশুড়ি, মাকে রেখে কন্যা এবং সন্তানকে রেখে মা — তারই চিত্তস্পর্শী চিত্র এ-গল্পে আমরা পাই। একজন শিক্ষক চাকরি হারিয়ে জোতদারের কর্মচারীতে পরিণত হওয়ার পর কিভাবে শোষকচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নিজজীবনে অঙ্গীকার করে, তার বাস্তবসম্মত বিবরণেও এ-গল্প হয়ে উঠেছে

---

১২০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নেড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

> তাৎপর্যমণ্ডিত। মন্বন্তরের দুর্ভাগ্যজনক পীড়ন একজন শিক্ষককে রূপান্তরিত করে নারী ব্যবসার দালালে এবং অন্যের বাসভূমি অন্যায়ভাবে দখলের ব্যাপারে কৌশলী প্রতারকে — এই রূঢ় ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার পরিস্ফুটনই নিঃসন্দেহে এ-গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।[১২১]

'নেড়ী' গল্প সম্পর্কে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের উপলব্ধি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন : এ গল্পে যুগপৎ উচ্চারিত প্রতিরোধ এবং বিক্ষোভ, সেই সঙ্গে উচ্চবর্গ ভদ্রলোক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীলতা; উচ্চবর্গ ভদ্রলোকদের এলিট 'সংস্কৃতি' এবং 'সভ্যভব্য' আচরণ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা; মানুষের নির্মম বিকৃতি সম্বন্ধে বিশেষণের দূরস্পর্শিতা।[১২২]

'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রাণ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত জনপদে মানুষের বেঁচে থাকার আদিম সংগ্রামকে রূপায়িত করেছেন। 'নেড়ী' গল্পের চরিত্রগুলোর মতো এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অটল এরস্ (Eros) শাসিত চরিত্র। দুটি গল্পের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, 'নেড়ী' গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে Id যেখানে একক প্রাধান্যবিস্তার করেছে super ego-র কোনরূপ নিম্নচাপ ছাড়াই, 'প্রাণ' গল্পে সেখানে স্বামী অটল ও স্ত্রী মালতীর মধ্যে Id তাড়না, Egoর অনুপ্রেরণা দেখালেও Super Ego-র নিম্নচাপে তারা শেষ পর্যন্ত শুদ্ধসত্তায় উন্নীত হয়েছে। অটলের মনে Id, Ego ও Super Ego র স্তরবহুল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এরস্ তাড়িত হয়ে তার আদিম জীবনাকাঙ্ক্ষা, এবং তার স্ত্রীর মনে Super Ego জনিত নৈতিক উৎকণ্ঠার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এ গল্পে ফ্রয়েডীয় জীবনসত্যকেই মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি।

---

১২১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮

১২২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতি, *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৮

'প্রাণ' গল্পে লেখক একদা কৃষক অটলের মূল্যবোধের মমতাহীন বিপর্যয়ের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। ক্ষুধার জ্বালা তার বিবেক ও অনুভূতির জগতকে এমন অসাড় করে দিয়েছে যে, খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্যসংগ্রহের উপায় অন্বেষণ ছাড়া সকল প্রকার শুভাশুভ বা সুন্দর-অসুন্দরের বোধ তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, মানুষের মনে এরস্ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যখন জাগ্রত হয়, তখন তার মূল্যবোধ ভোঁতা হয়ে যায়। অটলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। নিজ স্ত্রী মালতীর সম্ভ্রমবিক্রির বিনিময়ে সে বেঁচে থাকার যে পরিকল্পনা করেছে, তার পেছনে দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত জনপদে মানুষের যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামই প্রকাশ পায়। এ গল্পে আমরা দেখি, কৃষক অটল দুর্ভিক্ষের আক্রমণে নিঃস্ব হয়ে শহরে গিয়ে ভাঙা পোড়োবাড়ির এক কোণে আশ্রয় নেয় এবং সরকারি লঙ্গরখানার ওপর নির্ভর করে কোনো ভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তার স্ত্রী মালতীর প্রতি সরকারি ত্রাণ কর্মকর্তার দুর্বলতা প্রকাশিত হলে অটল তার সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মালতী এতে আগ্রহী নয়; ফলে তার প্রতি অটলের ক্ষোভ ও ক্রোধ তীব্র হয়ে ওঠে। Ego চালিত অটলের কাছে মালতীর এই সতীপনা অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য মনে হয়। সরকারি ত্রাণ কর্মকর্তার সঙ্গে স্ত্রীকে আলোচনার জন্য পাঠিয়ে সে নানা কথা ভাবে। Ego চালিত অটলের মনোবিশেষণ করতে গিয়ে লেখক বলেন :

ক. ক্লেশকর একটা অনুভূতি পাক দিতে থাকে অটলের মধ্যে তার একঘেয়ে একটানা চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে। মালতীকে আজ সে খুন করবে, নিশ্চয় খুন করবে, যদি — হ্যাঁ, অবশ্য যদি কাজ সে হাসিল করে না আসে। দেরি হোক মালতীর, দেরি হওয়া তার আশ্চর্য নয়, তাতে কিছু এসে যায় না। সে জন্য অটলের রাগ বা জ্বালা নয়। মালতী ফিরে এসে যদি জানায় আজও বাবুর সাথে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে আসতে পারেনি, লজ্জায় ভয়ে পারেনি, তা হলে অটল ফেটে যাবে রাগে : মালতীকে টের পাইয়ে দেবে তার রাগ কী জিনিস, তার অবাধ্য হওয়ার ফল কী। সে অবশ্য পরের কথা। সব ঠিকঠাক করেই হয়ত আসবে মালতী। দেরি হয়ত হচ্ছে সেই জন্যই। বাবু তো আবার মান্যিগন্যি মানুষ, সুযোগ সুবিধা আড়াল না পেলে মালতীর সাথে কথাই বা বলবে কী করে, লোকে দেখলে বলবে কী! মালতীও হয়ত হাঁ করে আছে সুযোগের

> জন্য, মেয়ে মানুষ তো। তবে, শকুনটার নজর যখন পড়েছে মালতীর ওপর, মালতীর কথায় রাজি সে হয়ে যাবে। খুশি হয়েই রাজি হবে, বেশি রকম আগ্রহের সঙ্গে কথাটা যতবার ভাবে অটল ততবারই মনে মনে ছ্যাছ্যা করে। জনপ্রাণী থাকলে মালতী যাবে না, তার ভয় হবে লজ্জা করবে, এতে খাঁটি গেঁয়ো ভীরু লাজুক বউ বলে মালতীর দাম বাড়বে ব্যাটার কাছে। কী বোকাই সে বনবে অটলের বুদ্ধিতে — সে আর মালতী দু জনেই।[১২৩]

খ. কতকাল ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে এসেছে, উপোস করে দিন কাটাচ্ছে কী অবস্থায় লজ্জা ঘেন্না বরবাদ করে, আজও সে আছে ভীরু লাজুক গেঁয়ো বউ! চোখের সামনে কতলোকের কত বউকে কী হয়ে যেতে দেখল অটল, নিজের বউ বলে যেন বাদ পড়েছে মালতী। মালতী অবশ্য বলে যে আজও সে সতী আছে। পেটের দায়ে ছাড়াছাড়ি হোক তাদের সকালে দুপুরে, ফিরতে কোনো কোনো দিন রাত হয়ে যাক যেদিন যেমন কাজ জোটে সারতে, তাই বলে সে অসতী হবে কেন, মুখপোড়া বজ্জাত।[১২৪]

স্ত্রীর দেহের বিনিময়ে জীবিকানির্বাহের এই প্রয়াসকে প্রতিবেশীরা ধিক্কার দিলেও অটল এ ব্যাপারে নির্বিকার ও লক্ষ্য সাধনে দ্বিধাহীন। তার বিকারগ্রস্ত মন এমন নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, প্রতিবেশীদের ঘৃণাকে হিংসার প্রকাশ বলে তার মনে হয়। প্রতিবেশী রাধা যখন তাকে 'বেহায়া বাঁদর' বলে লজ্জা দিতে চায়, অটল তখন লজ্জা পায় না বরং তাদের উপবাসের স্মৃতি তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। লেখকের গল্পবয়ন :

> ওদের হাসি টিটকারির মানে ছিল সোজা। ওরা টের পেয়েছে, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর দিকে। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চালা আর নর্দমার মাঝের ফাঁকা

---

১২৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ, *পরিস্থিতি*, মানিক রচনাবলি, (৫ম খণ্ড), ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৪২

১২৪. ঐ, পৃ. ৩৪২

> জায়গাটুকুতে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অটল টানছিল কাল সন্ধ্যায় স্টেশনে কুড়ানো আধপোড়া চুরুটটা। সেই থেকে একটা অসহ্য অনুভূতি কেবলই পাক দিয়ে উঠেছে অটলের মধ্যে : মালতী যেন এসেই গিয়েছে সব কিছু ভেস্তে দিয়ে। মালতীর দিকে নজর পড়েছে বাবুর! মালতী এনে দিচ্ছে আর ঘরে বসে সে রাজভোগ খাচ্ছে! ওরা কি জানে কাল থেকে একটু খিচুড়িও সে খায়নি — একটু দেরি হওয়ায় তারা পায়নি খিচুড়ি। কোথাও কিছু জোটেনি কাল তাদের, কাজে যায়নি মালতী, তার চাপড় খেয়েও যায়নি। এক বেলা পেট ভরল না, বাবুর নজর পড়েছে মালতীর ওপর।[১২৫]

অবশেষে মালতী ফেরে। অনেক কিছু দিয়েছে বাবু থলি ভর্তি করে। চাল, ডাল, তরকারি — আলু, বেগুন, শিম আর আস্ত একটা বাঁধাকপি। শালপাতায় জড়ানো খানিকটা মাংস। মিকচারের শিশি ভরা সোনালি সরষের তেল। পুরনো একখানা পরিচ্ছন্ন ধুতি আর একটা সাবান। এত সম্পদ অভিভূত অটল যখন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মালতী। Super Ego মালতীর মনে নৈতিক উৎকণ্ঠা জাগায় বলেই তার এই ভীতি। মিনতি করে অটলকে সে তাই বলে, "ভরে ফেলো — ঢেকে ফেলো।"

স্বামীর অসৎ পরামর্শে নিতান্ত বাধ্য হয়ে যদিও মালতী ত্রাণ কর্মকর্তা বাবুটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে, কিন্তু এসব কাজে তার অন্তরের সায় নেই। মালতী চরিত্রের মধ্যে লেখক Super Ego র প্রভাবই বেশি দেখিয়েছেন। বিপন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মালতী যদিও স্বামীর আদেশ দায় ঠেকে পালন করে, তবু Super Ego র নৈতিক উৎকণ্ঠা তাকে বিচলিত করে। স্ত্রীকে তাই অটলের বদলে যাওয়া নতুন মানুষ বলে মনে হয়। অটলের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক বর্ণনা করেন :

---

১২৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩

> কদিন থেকে মালতীর এমনই ধরনধারণ ধাঁধার মতো লাগছে তার কাছে। কদিন থেকে? বাবু যেদিন লোক মারফত ওকে বিশেষ টিকিট পাইয়ে দিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দুধ খাইয়েছে, শিশু আর প্রসূতিদের বরাদ্দ দুধ, সেদিন কি তার পরদিন থেকে। বেশ তিরিক্ষে কাঠখোট্টা হয়ে উঠছিল মালতী গেরস্ত ঘরের বউ মানুষের হায়াটায়া সব ভুলে গিয়ে, মতি রাধা এদের সঙ্গে পালা দিয়ে চালাকচতুর হয়ে উঠেছিল একটু বেশি আদায় করার ফন্দিফিকিরে, কথা বলতে শিখছিল চটাং চটাং। মতি রাধাদের সঙ্গে খেঁকি কুকুরের মতো সমানে সে ঝগড়া চালিয়েছে, মুখে তুবড়ি ছুটিয়েছে নতুন শেখা নোংরা কথার! বাবু কদিন দুধ আর খাবার খাওয়াবার পর থেকে কেমন যেন সে ঝিমিয়ে মিইয়ে গেছে, শান্ত ভালো মানুষ হয়ে গেছে। ঘর ছাড়ার পর ঘরের কথা গাঁয়ের কথা অটল কোনোদিন শোনেনি ওর মুখে, এই কদিন মাঝে মাঝে কী যেন ভাবতে ভাবতে আনমনে ঘর সংসার আপনজন চেনা মানুষের কথা সে বলে — পুরানো হারানো দিনের কথা। এতকাল পরে হঠাৎ নতুন করে যেন ওর ঘর সংসারের জন্য কষ্ট আরম্ভ হয়েছে।[১২৬]

মালতীর এই পরিবর্তন তার অবচেতন মনে সক্রিয় নৈতিক উৎকণ্ঠারই বিপন্ন প্রকাশ। পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য অটল রাতের বেলা স্ত্রীকে ত্রাণ কর্মকর্তা বাবুটির গৃহে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য যখন তাড়া দেয়, তখন মালতী রাত আরো গভীর হওয়ার অজুহাত দেখায়। এক পর্যায়ে মালতী যখন স্পষ্ট করেই বলে, "আমি যাবনি। ডর লাগছে মোর।" তখন অটল যে রেগে না গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্ত্রীকে রাজি করার চেষ্টা করে এবং নরম গলায় স্ত্রীর সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে, তা তার সুচতুর Ego রই প্রেরণাজাত। লেখকের গল্পবয়ন :

> আমি যাবনি। ডর লাগছে মোর।

---

১২৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

অটল খিঁচে ওঠে না, ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলে না যে পথে-ঘাটে গণ্ডা গণ্ডা পুরুষ নিয়ে যার কারবার, বাবুর মতো ভদ্দরলোকদের কাছে একটা রাত কাটাতে তার ডর লাগছে! হাত বাড়িয়ে সে হাত ধরে মালতীর, ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলে, তোর ডরটা কীসের? একটা রাতও পুরো নয়। বাবু ভদ্দর লোক, লেখাপড়া জানা লোক, গুণ্ডা তো নয়, তোর ডরটা কীসের? একটু না করবি তো এমনই দিন কাটবে মোদের? দুদিন বাদে সেই তো পড়বি দালালের হাতে, হয়ত ক্যাম্পে যাবি, ছিনিমিনি খেলবে তোকে নিয়ে? তার চেয়ে বরং একটা রাত, একটা রাতও পুরো নয়, মদটদ খেয়ে বাবু বেঁহুশ হয়ে ঘুমোলে দোর খুলে দিবি মোকে—

বলতে বলতে বাইরের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চালার আবছা অন্ধকারে হুড়মুড় করে এসে ভিড় করে তাদের গত মাসগুলির বীভৎস অভিজ্ঞতা — ক্ষুধার জ্বালা, আশ্রয়ের অভাব, শীত, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, নোংরামি, মৃত্যু। অটলের গলা কর্কশ হয়ে উঠতে থাকে, খেঁকি কুকুরের আওয়াজের আভাস আসে।

রাতারাতি উধাও হয়ে যাব দুজনে যা পারি বাগিয়ে নিয়ে। সুখে থাকব।বাবুকে বলেছিস তো বাড়িতে লোক থাকলে যাবি না? লজ্জা করবে?

বলেছি। মালতীর গলাও এবার শুকনো।[১২৭]

ত্রাণ কর্মকর্তা বাবুর বাড়ির দিকে যেতে যেতে অন্ধকার রাতে অটলের মনের অন্ধকার দানা বেঁধে ওঠে। তার পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে মালতীকে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের সুযোগে ঐ ব্যক্তির গৃহসম্পদ লুট। কর্মকর্তার গৃহ লুণ্ঠনের পর অটল মালতীকে নিয়ে ওই স্থানত্যাগের পরিকল্পনা আঁটে। তার এসব পরিকল্পনা Ego চালিত। তবে জানাজানির ভয়ে প্রয়োজনে মালতীকে ফেলে সে একাই পালিয়ে যাবে — এরূপ চিন্তার মধ্যে Ego নয় বরং Id ই প্রধান হয়ে ওঠে। অটলের মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

১২৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬

> জীবনে প্রথম চুরির কথা ভেবে অটলের এখন বেশ ভয় করে, কেঁপে উঠে আঁকুপাঁকু করতে থাকে বুকটা। কদিন ধরে সব পরিপাটিরূপে ছক কেটে রেখেছে মনের মধ্যে, ভয়ের কথা মনেও আসেনি। নিজেই চাকর ঠাকুর সরিয়ে দিয়ে বাবু থাকবে একা, মদের নেশায় উপভোগের শ্রান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোবে। জাগেই যদি নেহাত, লোহার এই যে ডান্ডা নিয়েছে অটল কাপড়ের তলে মালতীকে না জানিয়ে, তার এক ঘায়ে আবার বেঁহুশ করে দেবে। কে চুরি করেছে জানাজানির ভয় তো সে করে না, জানাজানি যে হবেই কাজটা কাদের, অটল তা জানে। কাজ হাসিল করে পালাতে পারলেই তার হল। দরকার হয়ত মালতীকে ফেলে একাই নয় সে পালাবে। তবে তার ভয়টা কীসের?[১২৮]

মালতীকে গেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে সে নিজেও বাবুর বাড়ির পেছনে কুয়োর কাছে গরুবাঁধা চালাটার নিচে জবা গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে অপেক্ষা করে। তার অপেক্ষা বাবুকে জৈবিকভাবে পরিতৃপ্ত করে মদ-টদ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে অতঃপর মালতী কখন সদর দরজা খুলে দেবে আর সে বাড়িতে ঢুকে সর্বস্ব হাতিয়ে নেবে। যে স্ত্রীকে সম্ভ্রম লুটিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ং সে বাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেছে, স্ত্রীকে ভেতরে পাঠিয়ে সে স্ত্রীর জন্যই তার মমতা জেগে ওঠে। Id তাড়িত, Ego চালিত অটলের মধ্যে এ পর্যায়ে Super Ego সক্রিয় হয়ে ওঠে। লেখকের বর্ণনায় এরকম কিছু খণ্ডচিত্র :

ক. এগারোটা বাজে। বাবু কি হাত ধরেছে মালতীর? কাপড়ের নিচে লোহার ডাণ্ডাটায় হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে অটলের।[১২৯]

খ. মাথায় যেন আগুন জ্বলতে থাকে অটলের। মালতী ভেতরে গেছে, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজা না ভেঙে বাড়ির মধ্যে তার ঢুকবার উপায় নেই। হাঙ্গামা করলেই

---

১২৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

১২৯. ঐ, পৃ. ৩৪৭

সর্বনাশ। কোনো রকমে যদি সে ঢুকতে পারত বাড়ির মধ্যে এই দণ্ডে। ঢুকেই তা হলে ডাণ্ডাটা বসিয়ে দিত বাবুর মাথায়। সব চুকেবুকে যেত। মালতীও রেহাই পেত। কী ভুলটাই হয়ে গেছে।[১৩০]

গ. একটা জানালার পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বোঝা যায় ভেতরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বাবুর কি আর ঘুমের তাগিদ আছে আজ। কতরাত অবধি ফুর্তি চলবে কে জানে! দাঁতে দাঁতে লেগে যায় অটলের।[১৩১]

গল্পের শেষে মানিক পাঠকের জন্য চমক উপহার দিয়েছেন। স্ত্রীর জন্য দুর্ভাবনায় ও মমতায় আর্দ্র অটল অস্থিরভাবে বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করার এক পর্যায়ে গাঁদা ঝোপের মধ্যে ঘুপচি মেরে বসে থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে আবিষ্কার করে। ক্রন্দনরতা স্ত্রীর কাছ থেকে অটল জানতে পারে, সে বাড়ির ভিতরে ঢোকেই নি — প্রথম থেকেই গাঁদা ঝোপের মধ্যে বসে ছিল। ভয়ে মালতী চেপে চেপে ফুপিয়ে কাঁদে। অটল তাকে নিরুদ্বিগ্ন শান্ত গলায় চুপ থাকার পরামর্শ দেয়। মালতীর সহসা বুঝে উঠতে পারে না অটলের এই খাপছাড়া আচরণের কারণ। বাবুর কাছে না গেলে যে খুন করবে বলেছিল, সে কেন এমন শান্ত সুরে কথা বলে, মালতী তা বুঝে উঠতে পারে না। Super Ego অটলকে নতুন মানুষে পরিণত করেছে বলে তাকে বুঝতে মালতীর দেরি হয়। ফিরে যাওয়ার পথে স্বামীর আন্তরিক ব্যবহারে ও তার বোধোদয় ঘটতে দেখে মালতী স্বস্তি বোধ করে। গল্প শেষ করেছেন মানিক অটলকে শুদ্ধ সত্তায় উন্নীত করে। লেখকের বর্ণনা :

> গেট দিয়ে বেরিয়ে দুজনে তারা ফিরে চলে তাদের ভাঙা চালার আশ্রয়ের দিকে। চলতে চলতে মালতীকে ভালোভাবে শোনাবার জন্য একবার তার গায়ে হাত দিয়ে অটল বলে, কি জানিস, এসব মোদের কাজ নয়কো।[১৩২]

---

১৩০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

১৩১. ঐ, পৃ. ৩৪৭

১৩২. ঐ, পৃ. ৩৪৮

Super Ego র জাগরণে অটল চরিত্র সদর্থক জীবনাকাঙ্ক্ষায় সুস্থির হয়ে ওঠে। অটলের এমন ইতিবাচক পরিণতির মূলে দুটি কারণ লক্ষ করেছেন সৈয়দ আজিজুল হক। তাঁর ভাষায় :

> পরপর দুবেলা পেটপুরে খাদ্যগ্রহণের ফলে তার দেহমনে সঞ্চারিত হয় এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া। আর তারই সঙ্গে যুক্ত হয় স্ত্রীর সতীত্ববোধ সম্পর্কে এক নিশ্চিত উপলব্ধি। এ-দুয়ের সাহচর্যে অটলের অন্তর্গত শুভবোধ আলো দেখতে পায়। 'কি জানিস, এসব মোদের কাজ নয়কো।' — এ গল্পে এবং অটলের এই সর্বশেষ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই যেন সকল পাপাচার ও অপরাধ থেকে তার মুক্তি ঘটে। অটল-চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এ-গল্পে মানিক অস্তিত্ববাদী জীবনজিজ্ঞাসারও স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষুধার দহন যে অটলকে বিমিশ্র সত্তায় (inauthentic being) পরিণত করেছিল, ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি ও স্ত্রীর মধ্যে নীতিবোধের জাগরণ তাকেই উন্নীত করলো শুদ্ধ সত্তায় (authentic being)।[১৩৩]

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লক্ষ করেছেন, 'প্রাণ' গল্পের চরিত্ররা মরে যায় কিন্তু আপস করে না। সাধারণ মানুষ হয়েও তারা মর্যাদাদীপ্ত।[১৩৪] এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিব বলেছেন :

> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থের 'প্রাণ' গল্পে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে অভাব ও মন্বন্তরক্লিষ্ট অটল কিভাবে তার স্ত্রীর সতীত্ব ও সম্ভ্রমকে বন্ধক রেখে অর্থ ও বিত্তের প্রতি মনোযোগী হয় – সে ইতিবৃত্তই বিবৃত হয়েছে।[১৩৫]

'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অমানুষিক' গল্পে অমানুষিকভাবে হলেও, মূল্যবোধ–আবেগ–অনুভূতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও, মানুষের শেষ পর্যন্ত নিজ অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস তথা বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। ফ্রয়েড বলেছেন, মানুষের অস্তিত্বরক্ষার

---

১৩৩. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

১৩৪. মতাদর্শ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

১৩৫. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

আকাঙ্ক্ষাই তার সকল কাজের প্রধান নিয়ামক শক্তি। প্রবল জীবনমুখী এই শক্তির নাম তিনি দিয়েছেন এরস্ (Eros)। এরস্ মানুষকে জীবনের দিকে চালিত করে।[১৩৬] 'অমানুষিক' গল্পের কৃষক ছিদাম, তার স্ত্রী কুন্জা, ভিখারিণী গাবো সবাই এরস্তাড়িত চরিত্র। জোতদার ললিতবাবু চরিত্রটির মধ্যে লিবিডো তাড়নাও এ গল্পে ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছিদাম চরিত্রটির জীবনবৃত্তান্ত এরূপ :

> সে ছিল ও রকম অনেকের একজন। আধপেটা সিকিপেটার বেশি না খেয়ে, কখনো বা দু-চারদিন স্রেফ উপোস দিয়ে দেশের চলতি দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে টিকে থাকত, যুদ্ধের সুযোগে রক্তমাংসলোভী পোষা রাক্ষসগুলি চড়চড় করে দুর্ভিক্ষ চরমে তুলে দেওয়ায় যারা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ছিদামের ইতিহাসটাও আর দশজনের মতো সাধারণ, যদিও ভয়াবহ। প্রথমে গেল তৈজসপত্র, তারপর গেল গাইটা। কুন্জার রূপোর পঁইছেটা দিল সে নিজেই, কানের লুকানো মাকড়ি খুঁজে বার করে কেড়ে নিতে হল জমিটুকু যাওয়ার পর। ভিটেটুকু বাঁধা পড়ল সকলের শেষে — মাকড়ি আগে যাবে না ভিটে আগে যাবে এই নিয়ে মনান্তর হয়েছিল কুন্জার সঙ্গে ছিদামের। সবই যে যাবে, তখন এরকম স্থির নিশ্চয়ভাবে জেনে গিয়েছে ছিদাম, ছেলেটাও তার তখন মরে গেছে। তবু ঘরদুয়ারটা সে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অদৃষ্টে বিশ্বাস আর তার ছিল না, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস আর তার ছিল না, ধুঁকতে ধুঁকতে তবু এক দুর্লভ স্বপ্নের রং একটু সে মনে পুষে রেখেছিল যে মাথা গুঁজবার ঘরটা থাকলে হয়ত বেঘোরে প্রাণটা তার যাবে না, আবার একদিন সব আসবে, জমিজমা গাইবাছুর তৈজসপত্র কুন্জার গয়না, কুন্জার গর্ভে সন্তান। ললিতবাবুর কাছে বাড়িটা বাঁধা দেবার পর তাই সে হতাশায় ঝিমিয়ে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে দিয়েছিল।[১৩৭]

---

১৩৬. সুনীল কুমার সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১৩৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, *পরিস্থিতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬

একদিন ভোরবেলা বুড়ি মা, জোয়ান বউ, আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে অন্য কোথাও কিছু করা যায় কিনা – এরকম একটি অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ছিদাম গৃহত্যাগ করেছিল। বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে সে যে পারিবারিক অর্থসংকট দূর করার জন্যই শহরে যাচ্ছে — এরকম প্রতিশ্রুতি স্ত্রীকে দিয়ে যায় নি। 'পালিয়ে যাওয়ার মতো' ছিলো তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। নিজের কাছে তার যুক্তি ছিলো এই : এখানে থাকলে সে মরবে, বউ মরবে, মেয়েটা মরবে, মাও মরবে। তার চেয়ে দেখা যাক বাঁচবার কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা পৃথিবীর কোথাও।

শহরে গিয়ে কোনো কাজ জোটাতে পারে না ছিদাম। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামের অংশ হিসেবে সে করে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, ছিনতাই, বর্জিত দ্রব্য ঘেঁটে খাদ্যসংগ্রহ, লঙ্গরখানা থেকে লাইন দিয়ে খিচুড়ি সংগ্রহ ইত্যাদি অমানুষিক কর্মকাণ্ড। তার অস্তিত্বরক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক জানান :

ক. তারপর কতকাল কত পথ হেঁটেছে ছিদাম, কত দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে, বাজারে বাজারে ফালতু ফেলে দেওয়া পচা তরকারি মাছ ডিম কাড়াকাড়ি করে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচাকাঁচা খেয়ে খেয়ে, এর বাগানের ফলটা ওর বাগানের মূলটা চুরি করে করে, এ কেন্দ্রের খিচুড়ি নিয়ে আর এক কেন্দ্রে পাবার আশায় ছুটতে গিয়ে দম নিতে পথের ধারে ছায়ায় বা রোদে, রোয়াকে বা ধুলো-কাদায় বসে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুঁকে আর ধুঁকে। এমনিভাবে গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, শীত গেছে।[১৩৮]

খ. কাদের ক শো বছরের পুরানো দালানের এক পরিত্যক্ত অংশে কোলাকুলি দুটো দেওয়াল আর এপাশে ভাঙা ইটের স্তূপের মধ্যে তিনকোনো ছাদহীন সাপ-শেয়ালের বাসটিতে সে আশ্রয় নিয়েছিল, গাছতলায় থাকলে পুলিশে জুলুম করে বলে, শীতে জমে যেতে হয় বলে। এখানে আকাশের হিম পড়ুক তার গায়ে, দুকোনা ভাঙা

---

১৩৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

দেওয়াল দুটোতে উত্তুরে হাওয়া আটকাত, পুলিশ সামনের পথ দিয়ে গটমটিয়ে হেঁটে গেলেও লাঠির খোঁচা তাকে দিয়ে যাবার সুযোগ পেত না!

ওইখানেই গাবো এসে জুটেছিল একদিন না ডাকতেই। কুকুর বেড়াল তাড়ানোর মতো করে ছিদাম বলেছিল, যা যা, ভাগ।[১৩৯]

স্টিমার স্টেশন আর রেল স্টেশনের রাস্তা যে মোড়ে মিলেছে, সেখানে অনেকগুলি খাবারের হোটেল। সেইখানে ভিক্ষা করছিল ছিদাম। বেঁটে রোগা নিকেলের চশমা পরা টাকওয়ালা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক সাড়ে তিন টাকার খাবার কিনে সেই খাবার পদ্মপাতার ঠোঙায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে ভিখারি ছিদাম এক নিমেষে হয়ে গেল ডাকাত, আকাশের ছোঁ মারা চিল। ভদ্রলোকের খাবার ছিনতাই করে সে যখন মেয়ে-বস্তির গলির মধ্যে পালিয়ে গেল, সেখান থেকেই সরকারি মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে গাবো তার পিছু নেয়। 'হারামজাদি কুত্তি' বলে গাল দিয়ে গাবোকে ভাগিয়ে দিতে চাইলেও সে যায় না। বরং সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিদামের পায়ে একটা হাত দিয়ে আরেকটা হাত উঁচু করে ধরা খাবারের ঠোঙাটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। সেই থেকে গাবো ছিদামের সঙ্গেই থাকে। ইতোমধ্যে গাবো 'তেল ফুরানো পিদিমের নিভু নিভু শিখার মতো' সর্বাঙ্গে ঘা ভরা একটি সদ্যোজাত শিশু সংগ্রহ করে ভিক্ষায় সুবিধা হবে ভেবে। চুরি করা পোশাক পরে গাবোকে স্ত্রী সাজিয়ে শিশুটাকে সন্তান সাজিয়ে ছিদাম ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে। তাদের ব্যবসায় জমে না। একদিন বাচ্চাটা মারা যায়। গাবো একদিন নীল প্যান্ট পরা আধবুড়ো এক লোকের সঙ্গে ভেগে যায়।

মা, স্ত্রী ও কন্যার কথা ছিদাম প্রায়ই ভাবে কিন্তু তাদের জন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত তাকে যে সংগ্রাম করতে হয়, তাতে তার অধিক করণীয় কিছু আছে বলে সে ভাবতে পারে না। এদিকে দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাড়ি

---

১৩৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

ফিরবার ইচ্ছা তার জেগেছিল অনেক দিন আগেই। কিন্তু লজ্জা আর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। গৃহে প্রত্যাবর্তনে উন্মুখ ছিদামের মনোবিশেষণ করেছেন লেখক এভাবে :

> বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা তার জেগেছিল অনেকদিন আগেই। কিন্তু লজ্জা আর ভয় তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। অসময়ে মা-বউ-মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত মরণের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার লজ্জা, ওরা কেউ বেঁচে আছে কিনা এই ভয়। ঘরে যখন ধান থাকে, তৈজসপত্র থাকে, গাইবাছুর থাকে, বউয়ের পঁইছেটইছে মাকড়িটাকড়ি রুপো-সোনার গয়না, চারিদিকে আশাভরসা ছড়ানো থাকে বিপদে-আপদে সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার — তখন পুরুষ মানুষ খেয়ালের বশে হোক, বৈরাগ্যে হোক, গোসায় হোক, মা-বউ-মেয়ে ফেলে গিয়ে অনায়াসে দু-একটা বছর বাইরে কাটিয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বাড়ি ফিরতে পারে — বাড়ি ফিরেই কৃতার্থ করা যায় বাড়ির লোকগুলিকে। কিন্তু গাঁয়ের যত কাছে এগোচ্ছে থুপথুপ পা ফেলে তত যেন লজ্জা ভাবনার তোলপাড়টা বাড়ছে ছিদামের মনের মধ্যে। সে অবশ্য পালিয়ে গিয়েছিল তখন, যখন আর কোনো সন্দেহই ছিল না যে সবই মরবে, সে সুদ্ধ। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যও সে পালায়নি, সবাইকে বাঁচাবার উপায় খুঁজবার জন্যই পাগলের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। কিন্তু এতদিন কাজে লাগলেও ফুলদিয়ায় পা দেবার পর আজ এসব যুক্তি যেন ভাবনার বানে কুটার মতো ভেসে যাচ্ছে।[১৪০]

দেড় বছর পর ছিদাম বাড়ি ফিরলে ছালা ও ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো স্বামীকে কুন্জা চিনতে পারে না। ছিদামকে তার প্রথমে ভিক্ষুক বলেই মনে হয়; পরে চিনতে পেরে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। কুন্জার এই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠার কারণ তার অস্তিত্বসংকটের মধ্যে নিহিত। স্বামী যখন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তখন বেঁচে থাকার তাগিদে অনন্যোপায় হয়ে কুন্জা জোতদার ললিতবাবুর নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে পরিণামে তার রক্ষিতায় পরিণত হয়। এ ছাড়া কুন্জার বিকল্প ছিলো মৃত্যু বা পলায়ন। কুন্জা সহজ পথ আশ্রয় করে। পানি নিয়ে আসার ছলে কুন্জা স্বামীর সম্মুখ

১৪০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯

থেকে সাময়িকভাবে পালিয়ে বাঁচে। বাড়িঘরের নতুন সাজ ও সমৃদ্ধি ছিদামকে ভাবিয়ে তোলে। লেখকের বর্ণনা :

> বাইরের দাওয়ায় বসে থাকা পর্যন্ত রহস্য তার আয়ত্তে ছিল, বাড়ির ভেতর ঘুরে আসবার পর সে হার মেনে হাল ছেড়ে দেয়। গাবোর মতোই কোনো একটা পুরুষকে বাগিয়ে কুজা বেঁচে থেকেছে, রঙিন শাড়ি পরেছে, পুড়ন্ত হয়েছে, জানা কথা। কিন্তু তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্তে শহুরে শয্যা, জিনিসপত্র, প্রসাধনসামগ্রী দেখে, ললিতবাবুর বাড়ির বুড়ি ঝি সুবালার মাকে উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন করে গড়া চালার নিচে কোনো একজন রাঁধুনি রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম।[১৪১]

স্বামী-স্ত্রীর অস্বস্তিকর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ছিদাম জানতে পারে তার মা ও কন্যাটি মারা গেছে। কুজার সাথে ললিতবাবুর বর্তমান সম্পর্কের কথাও তার বুঝতে বাকি থাকে না। মাথা নিচু করে কুজাই তাকে সব বলে। দেড় বছর পরে স্বামীর আকস্মিক আগমন এবং ললিতবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক তাকে দ্বন্দ্বময় করে তোলে। কুজার এই দ্বন্দ্বটি একান্তভাবেই তার অস্তিত্বসংকটের সঙ্গে যুক্ত। স্বামীকে সে পেতে চায় আবার ললিতবাবুর প্রবল উপস্থিতিকেও সে অস্বীকার করতে পারে না। ছিদামের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে লেখক কুজার মনোবিচলনকে পরিস্ফুট করেছেন এভাবে :

> কেমন যেন হয়ে গেছে কুজা। একসঙ্গে জীবন্ত আর মরা। এতক্ষণের লক্ষণগুলি মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ছিদাম। নিজে থেকে যেচে সে তাকে এতটুকু আদর যত্নও করেনি। তামাক চাইলে সিগারেট দিয়েছে, মুখ হাত ধুতে চাইলে কাপড় গামছা জল দিয়েছে, খেতে চাইলে মুড়িগুড় খেতে দিয়েছে। দিয়েছে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে, আগ্রহে একেবারে যেন অধীর হয়ে পড়ে, কিন্তু চাইলে তবে দিয়েছে, যা চেয়েছে, শুধু

---

১৪১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০

> সেইটুকু। কিছু যেন খেয়াল নেই কুজার, মনে নেই। একদিন সে স্বামী ছিল সেটা নয় বাদ গেল, একটা মানুষ ঘরে এলে, একটা মানুষকে ঘরে ডেকে বসালে, তার সুখসুবিধার দিকে যে একটু তাকাতে হয় তাও কুজা ভুলে গেছে। খেয়ে উঠেছে, তাকে এখন আর একটা সিগারেট দিলে হয়। না চাইলে কি দেবে! চাইলে হয়ত লাফিয়ে উঠবে দশটা দেবার জন্য।[১৪২]

পুরো পরিবেশটি ছিদামের জন্যও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। লেখক বর্ণনা করেন :

> কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ছিদাম। কুজাকে এভাবে আবিষ্কার করার অস্বস্তি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু। বাইরে বাদলার আঁধার, ঘরে পিদিমের মিটিমিট আলো, তারা দুজন থাকলেও তাদের ঘিরেই যেন নির্জনতা আর স্তব্ধতা থমথম করছে। তার ভাঙাচোরা নোংরা ঘরখানা সাজানো গোছানো পরিষ্কার, তার কঙ্কালসার বউটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী যুবতী — নতমুখে ঝিম হয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। ছিদামের মধ্যে যুগযুগান্তের পুঁজি করা স্তূপাকার রহস্যানুভূতি আর ভয় পাকিয়ে পাকিয়ে মাথা তুলতে থাকে ধীরে ধীরে।[১৪৩]

স্বামী-স্ত্রীর নৈঃসঙ্গ রূপায়ণে, অকস্মাৎ ললিতবাবুর আগমনজনিত নির্মম বাস্তবতা চিত্রণে, পেছন দরজা দিয়ে ছিদামের চলে যাওয়ার সময় প্রকৃতি বর্ণনায় প্রতীকী পরিচর্যায় — সব মিলিয়ে গল্পবয়নে মানিকের সাফল্য গগনস্পর্শী :

> কী বলবে কী করবে তারা ভেবে পায় না, তেমনিভাবেই বসে থাকে দুজনে। আর একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে টানা যেতে পারে, একথাটা সবে মনে পড়েছে ছিদামের, বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

---

১৪২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১

১৪৩. ঐ, পৃ. ৩৭১-৩৭২

কেডা? কুজা শুধায়।

আমি। জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিসফিস করে কুজাকে শুধায়, ললিতবাবু নাকি?

কুজা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

কী করন যায় এখন?

কী জানি।

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়, আবার ললিত ডাকে। কুজা নড়েও না, সাড়াও দেয় না, উদাসীনের মতো বসে থাকে।

খুলে দে। ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ভিতরের রোয়াক থেকে ভিখারির ছাড়া পোশাকের বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বাঁশবনের ধার ঘেঁষে রাস্তায় নেমে পড়ে। টিপিটিপি বৃষ্টিটা তখন ধরেছে। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি, বিদ্যুতের ঘনঘন চমক ও আওয়াজ।[১৪৪]

বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রিয় সঙ্গীর সঙ্গে অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের অনেক কর্মকাণ্ডই অমানুষিক বলে বিবেচিত হতে পারে, তবু সে জন্য জীবন থেমে থাকে না। জীবন এগিয়ে চলে নিজস্ব গতিতে, Eros এর অনুপ্রেরণায়। জীবনের এই অন্তর্দেশীয় চিত্র ফুটে উঠেছে মানিকের 'অমানুষিক' গল্পে। এ গল্পের কাহিনী 'মর্মান্তিক, করুণ ও চিত্তগ্রাবী[১৪৫]

এ গল্প সম্পর্কে রহমান হাবিবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

---

১৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমানুষিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২

১৪৫. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

> বিত্তশালী ললিতবাবুকে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করার সামর্থ্য ও সাহস না থাকার কারণে ললিতবাবু এসে ছিদামের দরজায় করাঘাত করলে খিড়কি দরজা দিয়ে ছিদাম পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈষম্য মানবতা এবং মূল্যবোধকে কিভাবে কলুষিত ও পর্যুদস্ত করে – সে সম্পর্কসূত্রের ইতিবৃত্তই গল্পটিতে উঠে এসেছে।[১৪৬]

এ গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করেছেন আনন্দ ঘোষ হাজরা। তাঁর ভাষায় :

> পরিস্থিতি গ্রন্থের 'অমানুষিক' গল্পটি আবার সেই ফ্রয়েডীয় ভঙ্গির। গল্পটি, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ দুটি ব্যাপারই কীভাবে প্রান্তিকবর্গকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে তার বিবরণ এবং মানুষের জীবনবাদিতা (ফ্রয়েডীয় 'ইরস'?) কীভাবে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখছে (ফ্রয়েডীয় 'থ্যানাটস'?) তারও বিবরণ।[১৪৭]

---

১৪৬. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১৪৭. আনন্দ ঘোষ হাজরা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে আস্থাশীল। মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পর ফ্রয়েড থেকে তিনি অনেকখানি মুখ ফিরিয়ে নেন ; কেবল তা-ই নয়, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা শুরু করেন। ফ্রয়েড-সমালোচনায় তিনি ছিলেন ইংরেজ মার্কসবাদী বিপ্লবী, সাহিত্য-সমালোচক ও তাত্ত্বিক কডওয়েলের অনুসারী। কডওয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি ফ্রয়েড-সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। তবে লক্ষ করার বিষয় এই যে, মানিক রাতারাতি মার্কসবাদী হন নি, এবং মার্কসবাদী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাতারাতি ফ্রয়েড থেকে সরে আসেন নি – দুটি ক্ষেত্রেই তিনি কয়েক বছর করে সময় নিয়েছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজে-কলমে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন ১৯৪৪ সালে; তবে মার্কসবাদে তাঁর আগ্রহ তারও আগের থেকে। সে সময় চাওয়ার সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পাওয়া যেতো না, এর জন্য একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হতো। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও চর্চা করতে হয়েছে।

১৯৪৪ সালকে মাঝখানে রেখে এর আগে ও পরে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য সাধারণত দুটো পর্বে ভাগ করা হয়। এই বিভাজন সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ আছে। কারণ ১৯৪৪ সালে মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেলেও মার্কসবাদে তাঁর দীক্ষা এরও বেশ আগের থেকে এবং তখন থেকেই তাঁর মননে ও লেখায় মার্কসবাদী দর্শনের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ এর পূর্ববর্তীকাল একটি পর্ব এবং ১৯৪০ থেকে মানিক-কথাসাহিত্যের আরেকটি নির্দেশিত হতে পারে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলী' (প্রথম খণ্ড) উপন্যাস ; সেখানে মার্কসবাদ বেশ স্পষ্ট; মার্কসবাদী এই প্রভাব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে একই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে, যেটি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে।

১৯৪০ সালকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের একটি বিভাজক রেখা বিবেচনা করাই যুক্তিসংগত। ১৯৪০ সালের আগে তিনি যে সব উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন, সে সব রচনায় ফ্রয়েডীয় প্রভাব প্রবল ও তীব্র। এ কালসীমার মধ্যে রচিত তাঁর যে সব উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষযোগ্য, সেগুলো হলো, 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬)। একই কালসীমার মধ্যে রচিত তাঁর গল্পগ্রন্থগুলিতেও ফ্রয়েডীয় প্রভাব আছে। গল্পগ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'অতসীমামী' (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) এবং 'সরীসৃপ' (১৯৩৯)।

১৯৪০ সালের পরে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ফ্রয়েডীয় প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। এ পর্বকে আমরা ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তায়মান পর্ব এবং সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রান্তিপর্ব বলে অভিহিত করতে পারি। ১৯৪০ সাল থেকেই মানিকের লেখায় মার্কসবাদী দর্শন প্রকাশ পেতে থাকে। মানিকের মনোজগতে চলতে থাকে জীবনদর্শনের নিভৃত পালাবদল। এ পর্বে দুটি উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। উপন্যাস দুটি হচ্ছে : 'অহিংসা' (১৯৪১) এবং 'চতুষ্কোণ' (১৯৪২)। এ অস্তায়মান পর্বে ছয়টি গল্পগ্রন্থের কোনো কোনো গল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করা গেছে। গ্রন্থগুলি হচ্ছে : 'বৌ' (১৯৪০), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬) এবং 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ বছরের লেখক জীবনে অন্তত প্রথম ১২ বছর ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন; যার প্রথম ৫ বছর (১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত) স্পষ্টভাবে ফ্রয়েড-প্রভাবিত, এবং পরবর্তী ৭ বছর (১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত) প্রচ্ছন্নভাবে ফ্রয়েড-প্রভাবিত। 'আজ কাল পরশুর গল্প' গ্রন্থের যে দুটি, এবং 'পরিস্থিতি' গ্রন্থের অপর যে দুটি গল্পে আমরা ফ্রয়েডীয় প্রভাব দেখেছি সেগুলো মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষিত হতে পারে। এ গল্পগুলোতে মানিক মানুষের বৃত্তির সংকট রূপায়ণ করেছেন বটে কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তির কিছু চিরন্তন বৈশিষ্ট্যও

তিনি দেখিয়েছেন। সে কারণেই গল্প চারটি আমরা ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। যদিও এ কথা আমাদের স্বীকার্য যে, মানিক তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে মানুষের প্রবৃত্তিকে মুখ্য হিসেবে আবিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে মানিক মানুষের বৃত্তিকে মুখ্য করে তুলেছেন। মানুষের প্রবৃত্তি থেকে তার বৃত্তির দিকে তাঁর এই অভিযাত্রা ক্রমশ বেগবান ও পরিপুষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঊনচল্লিশটি উপন্যাসের ভেতর পাঁচটি উপন্যাসে এবং দুশ তেইশটি ছোটগল্পের ভেতর চব্বিশটি ছোটগল্পে ফ্রয়েডীয় প্রভাব ভালোই লক্ষ করা যায়। এ সব উপন্যাস ও ছোটগল্প ধরাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি তাঁর কথাসাহিত্যে কীভাবে ফ্রয়েডের প্রভাব বিদ্যমান।

সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রয়েডীয় প্রভাবযুক্ত রচনার সংখ্যা তাঁর মোট রচনার তুলনায় নগণ্য বলে মনে হতে পারে। তবে একজন লেখককে তাঁর মোট রচনার সংখ্যা দিয়ে বিবেচনা না করে তাঁর উৎকৃষ্ট রচনার মানদণ্ড দিয়ে মূল্যায়ন করাই সঙ্গত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ফ্রয়েডীয় পর্বেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মগুলো। মানিক ঊনচলিশটি উপন্যাস লিখেছেন, তবে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র মতো মানসম্পন্ন উপন্যাস আর লিখেছেন বলে মনে হয় না। অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি, দুশ তেইশটি গল্প মানিক লিখলেও 'প্রাগৈতিহাসিক', 'শৈলজ শিলা', 'মহাকালের জটার জট' কিংবা 'সরীসৃপে'র মতো মানসম্পন্ন গল্প কিন্তু তিনি বেশি লেখেন নি। এই 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'শৈলজ শিলা', 'মহাকালের জটার জট' এবং 'সরীসৃপ' তাঁর ফ্রয়েডীয় পর্বের রচনা।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাইশ বছরের লেখক জীবনে অন্তত প্রথম বারো বছর ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং এ সময়ই তিনি আরোহণ করেন তাঁর শিল্পসাফল্যের শীর্ষে।

ক. প্রাথমিক উৎস :

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবারাত্রির কাব্য, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (সম্পা.), হায়াৎ মামুদ, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৫

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল নাচের ইতিকথা, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অহিংসা, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুষ্কোণ, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত

৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতসীমামী, *মানিক-রচনাবলি* (১ম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৫

৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, *মানিক-রচনাবলি* (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত

৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহি ও মোটা কাহিনী, *মানিক-রচনাবলি* (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরীসৃপ, *মানিক-রচনাবলি* (২য় খণ্ড), পূর্বোক্ত

১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌ, *মানিক-রচনাবলি* (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত

১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমুদ্রের স্বাদ, *মানিক-রচনাবলি* (৪র্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত

১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হলুদ পোড়া, *মানিক-রচনাবলি* (৪র্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আজ কাল পরশুর গল্প, *মানিক-রচনাবলি* (৫ম খণ্ড), পূর্বোক্ত

১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিস্থিতি, *মানিক-রচনাবলি* (৫ম খণ্ড), পূর্বোক্ত

খ. দ্বৈতীয়িক উৎস

অ. গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা) :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, কলকাতা, ১৯৫০

২. অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৬৮

৩. অনিল আচার্য (সম্পা.), *অনুষ্টুপ*, কলকাতা, ১৩৯২

৪. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৯৭

৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, কলকাতা, ১৯৮২

৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, কলকাতা, ১৯৯১

৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৮৭

৮. অরুণকুমার রায়চৌধুরী, *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, কলকাতা, ১৯৯১

৯. অরূপরতন বসু (অনু.), *সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ*, কলকাতা, ১৯৯৯

১০. অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৯৩

১১. আকিমুন রহমান, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, ঢাকা, ১৯৯৩

১২. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, ১৯৯৫

১৩. আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, ঢাকা, ১৯৯৫

১৪. আমিনুল ইসলাম, *দার্শনিক সমস্যা ও সমকাল*, ঢাকা, ২০০৪

১৫. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা, ২০০৫

১৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, কলকাতা, ১৯৭১

১৭. আহমদ রফিক, *ছোটগল্পের শিল্পরূপ : পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প*, ঢাকা, ২০০৩

১৮. আহমদ শরীফ, *সঙ্কট : জীবনে ও মননে*, ঢাকা, ১৯৯৩

১৯. কায়েস আহমেদ (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঢাকা, ১৯৯৪

২০. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, *বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ*, কলকাতা, ১৯৮৯

২১. ক্রিস্টাফার কডওয়েল, *ইলিউশ্যন অ্যান্ড রিঅ্যালিটি* (অনু. রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), কলকাতা, ১৯৮২

২২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৯৬

২৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৬

২৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, কলকাতা, ১৯৮৭

২৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, কলকাতা, ১৯৯৪

২৬. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল*, কলকাতা, ১৯৮৭

২৭. দিলীপ মালাকার, *বিবিধ সমালোচনা*, ঢাকা, ১৯৮৩

২৮. দিলীপন ভট্টাচার্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস*, কলকাতা, ১৯৯০

২৯. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ২০০২

৩০. দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা*, কলকাতা, ১৯৮২

৩১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ফ্রয়েড প্রসঙ্গে*, কলকাতা, ১৯৯৪

৩২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৯১

৩৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা গল্পবিচিত্রা*, কলকাতা, ১৯৫৮

৩৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, কলকাতা, ১৩৬৯

৩৫. নারায়ণ চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন*, কলকাতা, ১৯৮৩

৩৬. নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), *মানিক সাহিত্য-সমীক্ষা*, কলকাতা, ১৯৮১

৩৭. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৯৬৮

৩৮. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ-জিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৮৬

৩৯. নীহাররঞ্জন সরকার , *মনোবিজ্ঞান ও জীবন*, ঢাকা, ১৯৮৮

৪০. নৃপেন্দ্রকুমার বসু, *ফ্রয়েডের ভালবাসা*, কলকাতা, ২০০৩

৪১. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), *শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা*, ঢাকা, ১৯৯৯

৪২. বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (অনু. প্রদীপ রায়), ঢাকা, ২০০৩

৪৩. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, ১৯৮৫

৪৪. বিশ্বনাথ দে (সম্পা.), *মানিক বিচিত্রা*, কলকাতা, ১৯৭১

৪৫. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা কথাসাহিত্যের একাল*, কলকাতা, ১৯৯৮

৪৬. বীরেন্দ্র দত্ত, *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, কলকাতা, ১৯৮৯

৪৭. বুলবুল বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পী ও শিল্প*, রাঁচি, ১৯৯০

৪৮. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ : সাহিত্যে ও রাজনীতিতে*, ঢাকা, ১৯৮৭

৪৯. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা, ২০০০

৫০. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ঢাকা, ২০০৮

৫১. ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঢাকা, ২০০১

৫২. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*, কলকাতা, ১৯৮৯

৫৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক গ্রন্থাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭৪

৫৪. মালিনী ভট্টাচার্য, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৯৬

৫৫. মীর ফখরুজ্জামান, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা, ১৯৯৬

৫৬. রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা, ২০০২

৫৭. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, ঢাকা, ১৯৯৭

৫৮. রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, ঢাকা, ২০০০

৫৯. রবিনপাল, *কল্লোলিত ছোটগল্প*, কলকাতা, ১৯৮৮

৬০. রথীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পের কথা*, কলকাতা, ১৯৮৮

৬১. রণেন্দ্রনাথ দেব, *বাংলা উপন্যাস : আধুনিক পর্যায়*, কলকাতা, ১৯৬৪

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, ঢাকা, ১৯৯৫

৬৩. রহমান হাবিব, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, ঢাকা, ২০০৭

৬৪. লিলি দত্ত, *জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৯৮৯

৬৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাসমগ্র-১*, ঢাকা, ২০০২

৬৬. শিখা ঘোষ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*, কলকাতা, ১৯৯০

৬৭. শিশিরকুমার দাশ, *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩-১৯২৩), কলকাতা, ১৯৬৩

৬৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, ১৯৮৮

৬৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৮

৭০. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), *জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৯৩

৭১. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, ঢাকা, ১৯৭৩

৭২. সরোজ দত্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৯৯৩

৭৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তর প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৮৬

৭৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রসঙ্গ : অনুষঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৯০

৭৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, ১৯৮৮

৭৬. সরোজমোহন মিত্র, *ছোটগল্পের বিচিত্র কথা*, কলকাতা, ১৩৮৬

৭৭. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮২

৭৮. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*, ঢাকা, ১৯৯৮

৭৯. সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পা.), *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা*, কলকাতা

৮০. সুজিতকুমার নাগ (সম্পা.), *মানিক স্মৃতি*, কলকাতা, ১৯৭১

৮১. সুনীলকুমার সরকার, *ফ্রয়েড*, কলকাতা, ২০০২

৮২. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৯৭

৮৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৮৫

৮৪. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, ঢাকা, ১৯৯৮

৮৫. হায়াৎ মামুদ (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, ঢাকা, ১৯৯৫

৮৬. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত*, কলকাতা, ১৯৮৩

আ. প্রবন্ধপঞ্জি (বাংলা) :

১. অনিলবরণ রায়, আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ, *বিচিত্রা*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৬

২. অশ্রুকুমার সিকদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঢাকা, ২০০১

৩. আনন্দ ঘোষ হাজরা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিপ্রেক্ষিত ও উপাদান, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, ঢাকা, ২০০৮

৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাঁচটি তলোয়ারে হৃদয় খান্‌খান্‌, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), *শিল্প-সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা*, ঢাকা, ১৯৯৯

৫. আবু সয়ীদ আইয়ুব, সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য, *পরিচয়*, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৫৪

৬. আবু সয়ীদ আইয়ুব, সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৭. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পদ্মানদীর মাঝি, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৮. আবুল ফজল, পুতুল নাচের ইতিকথা, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঢাকা, ২০০১

৯. ইমতিয়ার শামীম, মানিকের মন, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১০. কার্তিক লাহিড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১১. কামিনী রায়, সাহিত্য ও সুনীতি, *প্রবাসী*, ৩২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৯

১২. গিয়াস শামীম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১৩. চঞ্চলকুমার বোস, মানিক-সাহিত্যে মাতাল চরিত্র, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১৪. তারিক মনজুর, 'অহিংসা'র ভাষা, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১৫. তৌহিদ আহমদ, যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৯

১৬. বশীর আল্‌হেলাল, উত্তরকালের গল্প, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১৭. বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, মানিকের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

১৮. বিনয় ঘোষ, আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য, *পরিচয়*, ১৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৫৩

১৯. বেগম আকতার কামাল, দিবারাত্রির কাব্য : মানিক-মানসের আলোছায়া, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

২০. বেগম আকতার কামাল, শিল্পসাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৬

২১. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সমাজ গঠন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা*, ঢাকা, ২০০০

২২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মতাদর্শ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত

২৩. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্ত্যজ সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত

২৪. মনসুর মুসা, দিবারাত্রির কাব্য, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

২৫. মালিনী ভট্টাচার্য, অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

২৬. মালিনী ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাসাহিত্যে বিবাদী চেতনা, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

২৭. মাহবুবুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

২৮. মৃণালকান্তি ভদ্র, জগদীশ গুপ্ত : অস্তিত্ববাদের আলোকে, সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), *জগদীশগুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৯৩

২৯. মোহাম্মদ আজম, কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩১. সত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রাক-কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *অনুষ্টুপ*, ২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৫

৩২. সত্যসুন্দর দাশ, সাহিত্যে অশ্লীলতা, *বঙ্গশ্রী*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৯

৩৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা, *পরিচয়*, ৫১ বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা, ১৯৮১

৩৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পকর্ম, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩৫. সরোজমোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্যকৃতি, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩৬. সরোজমোহন মিত্র, পদ্মানদীর জেলেজীবন ও ময়না দ্বীপ, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩৭. সিরাজ সালেকীন, দায়/বিদায়ের মধ্যবিত্ত, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, পুতুলনাচ ও পদ্মানদী, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৩৯. সুতপা ভট্টাচার্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্ক : প্রথম পর্যায়, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৪০. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও চল্লিশের দশক : বাংলার মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৪১. সুবোধ ঘোষ, সে দিনের আলোছায়া, *দেশ*, ৪৭ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৩৮৬

৪২. সুশান্ত মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সৃষ্টির দূরত্ব, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক, (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৪৩. সৈয়দ আজিজুল হক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৪৪. সৌমিত্র শেখর, উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৪৫. স্বরোচিষ সরকার, মানিকের কথাসাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর চরিত্র, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), পূর্বোক্ত

৪৬. হায়দার আকবর খান রনো, উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), পূর্বোক্ত

ই. গ্রন্থপঞ্জি (ইংরেজি) :

1. Angela Richard (Ed.), Sigmund Freud, Contribution to the Psychology of Love I, *On Sexuality*, England, 1991

2. Angela Richard (Ed.), Sigmund Freud, Contribution to the Psychology of Love II, *On Sexuality*, England, 1991

3. Elizabeth Wright, *Psychoanalytic Criticism Theory in Practice,* London, 1985
4. James Strachey (Tr.), Sigmund Freud *Three Essays on The Theory of Sexuality*, London, 1962
5. James Strachey (Tr.), Sigmund Freud, *An Outline of Psychoanalysis*, New York, 1963
6. James C. Coleman, *Abnormal Phychology and Modern Life*, Bombay, 1975
7. John Rickman (Ed.), *A General Selection from the Works of Sigmund Freud*, India, 1941
8. Peter Gay (Ed.), Sigmund Freud, *On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love*, London, 1995
9. Sarajmohan Mitra, *Manik Bandyopadhyay*, New Delhi, 1974
10. Wilfred L. Guerin, Earle Labor, Lee Morgan, Jeanne C. Reesman, John R. Willingham, *A Handbook of Critical Approaches to Literature*, New York, 1999

ঈ. প্রবন্ধপঞ্জি (ইংরেজি) :

1. Sigmund Freud, 'A General Introduction to Psychoanalysis', 1920
2. Sigmund Freud, 'Beyond the Pleasure Principle', 1920
3. Sigmund Freud, 'Character and Anal Egotism', 1908
4. Sigmund Freud, 'Contribution to the Psychology of Love', 1910
5. Sigmund Freud, 'Formulation on Two Principles of Mental Functioning', 1911

6. Sigmund Freud, 'Group Psychology and the Analysis of the Ego', 1921
7. Sigmund Freud, 'Introductory Lectures on Psycho-Analysis', 1922
8. Sigmund Freud, 'Jokes and their Relation to the Unconscious', 1905
9. Sigmund Freud, 'Metapsychology', 1915
10. Sigmund Freud, 'On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Life', 1912
11. Sigmund Freud, 'Psychopathology of Everyday Life', 1903
12. Sigmund Freud, 'The Ego and the Id', 1923
13. Sigmund Freud, 'The Interpretation of Dreams', 1899
14. Sigmund Freud, 'The Libido Theory', 1909
15. Sigmund Freud, 'The Repression', 1915
16. Sigmund Freud, 'The Taboo of Virginity', 1917
17. Sigmund Freud, 'The Unconscious', 1915
18. Sigmund Freud, 'Three Contributions of Sexual Theory', 1905
19. Sigmund Freud, 'Totem and Taboo of Virginity', 1912